আমি তুমি সে

সলিমুল্লাহ খান

জাক লাকাঁ বিদ্যালয় ◆ দ্বিতীয় খন্ড

এয়ুরোপ মহাদেশের নেতৃস্থানীয় ফ্রয়েডপন্থী মহাত্মা জাক লাকাঁ (১৯০১–২০০১)। এই বহির প্রধান সম্পদ ১৯৬৬ সনে দেওয়া তাঁহার এক দফা ইংরেজি বক্তৃতার তর্জমা। মূল বক্তৃতাও এই বহিতে যোগ করা হইয়াছে।

'জাক লাকাঁ বিদ্যালয়' গ্রন্থধারার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সলিমুল্লাহ খানের ১৯ প্রবন্ধ ইহার অপর সম্পদ। এগুলি ১৯৯৮ হইতে ২০০৮ সনের মধ্যে প্রকাশিত। এই সকল প্রবন্ধে ফ্রয়েড হইতে দো বুভোয়ার, লালন শাহ হইতে সাদ কামালি আর অজ্ঞান, দমন, বাসনা, নারীভাব আর অলীক ও নিশান জগৎ প্রভৃতি নানা কথার বিবেচনা। তবে ভাষাই এই সকল বিষয় ও বস্তুর মূল ভাব। সলিমুল্লাহ খান ১৯৯৮ সনেই লিখিয়াছিলেন, 'স্বর্গে ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর আছেন ভাষায়।' স্মরণীয়, জাক লাকাঁ বহু আগেই বলিয়া রাখিয়াছেন

'ঈশ্বর পরলোকে যায়েন নাই, তিনি আছেন মাত্র অজ্ঞানলোকে।' অজ্ঞানলোক যে ভাষারই অপর নাম জানিতে পারিলে গুরু ও চাঁড়ালি দুই ভাষারই গুরুতর লাভ।

প্রচ্ছদ : পীযুষ দস্তিদার

জাক লাকাঁ বিদ্যালয় ॥ দ্বিতীয় খণ্ড

আমি তুমি সে

সলিমুল্লাহ খান

সম্পাদক
আবুল খায়ের মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান

সহকারী সম্পাদক
সুমন আরেফিন
তানিয়া সুলতানা
শাহ্‌জাহান কবির

সংবেদ

এশীয় শিল্প ও সংস্কৃতি সভা

আমি তুমি সে

সলিমুল্লাহ খান

সংবেদ প্রকাশনা ১৬

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৮

প্রকাশক
পারভেজ হোসেন
সংবেদ ৮৫/১ ফকিরেরপুল ঢাকা-১০০০

প্রকাশনা সহযোগী
মোজাম্মেল হক

প্রচ্ছদ
পীযূষ দস্তিদার

অক্ষরবিন্যাস
শরীফুল ইসলাম

মুদ্রণ
সংবেদ প্রিন্টিং পাবলিকেশন ৮৫/১ ফকিরেরপুল ঢাকা ১০০০

মূল্য : তিনশত টাকা

ISBN: 984-70195-0004-3

একমাত্র পরিবেশক
মাওলা ব্রাদার্স ৩৯ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন ৭১৭৫২২৭ ৭১১৯৪৬৩

ভারতে পরিবেশক
বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট কলকাতা-৭০০ ০০৭

AMI TUMI SHEY by Salimullah Khan, Jacques Lacan Bidyalaya, vol. 2, edited by Abul Khaer Mohammad Atikuzzaman, published, February 2008, by Parvez Hossain, Sangbed, 85/1, Fakirerpool, Dhaka 1000. Cover Design by Pijush Dastidar. Price : Tk. 300.00

যাহা নাই তাহা দেওয়ার নামই ভালবাসা
—জাক লাকাঁ (১৯৬০)

স্বর্গে ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর আছেন ভাষায়

—সলিমুল্লাহ খান (১৯৯৮)

উৎসর্গ

নাসরিন করিম
১৯৬২–২০০৬

এয়ুরোপ মহাদেশের নেতৃস্থানীয় ফ্রয়েডপন্থী
মহাত্মা জাক লাকাঁ (১৯০১–২০০১)।
এই বহির প্রধান সম্পদ
১৯৬৬ সনে দেওয়া তাঁহার এক দফা ইংরেজি বক্তৃতার তর্জমা।
মূল বক্তৃতাও এই বহিতে যোগ করা হইয়াছে।

'জাক লাকাঁ বিদ্যালয়' গ্রন্থধারার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক
সলিমুল্লাহ খানের ১৯ প্রবন্ধ ইহার অপর সম্পদ।
এগুলি ১৯৯৮ হইতে ২০০৮ সনের মধ্যে প্রকাশিত।
এই সকল প্রবন্ধে ফ্রয়েড হইতে দো বুভোয়ার,
লালন শাহ হইতে সাদ কামালি
আর অজ্ঞান, দমন, বাসনা, নারীভাব
আর অলীক ও নিশান জগৎ প্রভৃতি নানা কথার বিবেচনা।

তবে ভাষাই এই সকল বিষয় ও বস্তুর মূল ভাব।
সলিমুল্লাহ খান ১৯৯৮ সনেই লিখিয়াছিলেন,
'স্বর্গে ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর আছেন ভাষায়।'
স্মরণীয়, জাক লাকাঁ বহু আগেই বলিয়া রাখিয়াছেন
'ঈশ্বর পরলোকে যায়েন নাই, তিনি আছেন মাত্র অজ্ঞানলোকে।'
অজ্ঞানলোক যে ভাষারই অপর নাম
জানিতে পারিলে গুরু ও চাঁড়ালি দুই ভাষারই গুরুতর লাভ।

সূচিপত্র

গয়রহ

যোগ

প্রবেশিকা

আবুল খায়ের মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান

লোকমুখে শুনিয়াছি: জগতের যাবতীয় অতিরিক্ত ভার নাকি গর্দভকেই বহিতে হয়। শোনা কথায় কর্ণ প্রদান নাস্তি—লোকের এই কথায় ইমান আনিয়াছি, কর্ণ দান করি নাই। আপনাকে মনুষ্য জ্ঞান করিয়া সকল ভার প্রত্যহ স্কন্ধে তুলিয়া লইতেছি, আজো তাহাই করিলাম। এক্ষণে আমাদিগের প্রকাশিত *জাক লাকাঁ বিদ্যালয়* গ্রন্থমালার দ্বিতীয় খণ্ড সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম।

এই গ্রন্থমালার আগের খণ্ড সম্পাদন করিয়াছিলেন সলিমুল্লাহ খান। প্রশ্ন হইতেছে, এই খণ্ডের সম্পাদকও যদি তিনি হয়েন তো দোষের কী! আছে, দোষ অবশ্যই আছে। আজিকার এই খণ্ডের সকল রচনা যে তাঁহারই! সম্পাদকের দায়িত্বের অপব্যবহার করিয়া নিজ রচনা দিয়া গ্রন্থ ভরিয়া তোলার অপবাদ তিনি সজ্ঞানে কী করিয়া লইবেন? কিন্তু গ্রন্থও যে বাহির করিতে হইবে!

এক বৎসর কাল ধরিয়া অবশ্য আমি এই গ্রন্থের লেখাগুলি ধরিয়া রাখিয়াছিলাম। ঘষা-মাজা করি নাই, বসিয়া বসিয়া মশা মারিয়াছি। অবশেষে অল্প কয়দিনে তাড়াহুড়া করিয়া যাহা করিলাম তাহা না করার অধিক।

এই গ্রন্থের রচনাসম্ভারে 'অচেতন', 'অবচেতন', 'বাসনা', 'পর', 'অপর', 'অজ্ঞান'—এই কথাগুলি ফিরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। আমার কাছে এইগুলি কেবল কতক শব্দই থাকিয়া গেল, 'অর্থ' দিতে পারিলাম না। কোনটার বিন্দু (চন্দ্র) বুঝিয়াছি, কোনটার হয়তো বিসর্গ। কিন্তু কাহারও বিন্দু-বিসর্গ ঠিকঠাক বুঝিবার পারি নাই।

এক কথায়, এই গ্রন্থের বিষয়ভাব সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান নাই। হয়তো ইহাতে 'অ-জ্ঞান'ই প্রকাশ পাইল। মনে রাখিতে হইবে অজ্ঞানও 'জ্ঞান' বৈ কি। যেমন গোপনও এক প্রকার প্রকাশ বটে। এই গ্রন্থভুক্ত একাধিক রচনায় লাকাঁর গুজব

পড়িতেছি: মনের ভাব গোপন করিবার জন্যই আমরা যোগাযোগ করিয়া থাকি। এখন দেখা যাউক কী প্রকাশ কোথায় গোপন হইল।

ঢাকা লাকাঁ বিদ্যালয় কী জিনিস তাহা প্রথম ভাগের সম্পাদক কখনো বিশদ করেন নাই। আমি সন্দেহ করি ইহা একটি গ্রন্থধারার নাম মাত্র। তবে সলিমুল্লাহ খানের সাপ্তাহিক বক্তৃতাসভাও (যাহাকে ইংরেজিতে বলে সেমিনার) কখনো কখনো একই নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পুরাতন গ্রিকদেশে, শুনিয়াছি, মাস্টারমশাই হাঁটিয়া হাঁটিয়া বক্তৃতা করিতেন। তাই তাঁহাদের বিদ্যালয়কে লোকে পেরিপেটেটি (peripatetic) বা 'হাঁটুরে' বলিত। ঢাকায় আমাদের ঢাকা লাকাঁ বিদ্যালয়ের মাস্টারমশাই তেমন হাঁটাচলা করেন না। ছাতার নিচে যাঁহারা বসেন দেখি কেবল তাঁহারাই আসা যাওয়া যাহা করিবার করিয়া থাকেন।

এই আসা যাওয়া করিতে করিতে যাঁহারা এখনো টিকিয়া আছেন তাঁহাদের মধ্যে জহিরুল ইসলাম রুচি, জিয়াউর রহমান, এই অধম অর্থাৎ আবুল খায়ের মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান, বিধান রিবেরু, আনন্দী কল্যাণ দত্ত, শুভাশীষ দাশ, কাজী মুস্তাফা আনোয়ার প্রিন্স, সুমন আরেফিন, ফারজানা মনি, আরজু খান লেনিন। আপাতত ইঁহারাই ঢাকা লাকাঁ বিদ্যালয়। ইঁহারা গ্রন্থ উপপাদনের সহিত জড়িত। সংজ্ঞাটি উদার বটে! আমি ইঁহাদিগকে কী ধন্যবাদ দিব?

আমার আর একখানা সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞা আছে। সেই সংজ্ঞা অনুসারে বর্তমান গ্রন্থ সম্পাদনের সহিত যাঁহারা জড়িত তাঁহারাই মাত্র 'ঢাকা লাকাঁ বিদ্যালয়'। তাঁহাদের মধ্যে সুমন আরেফিন, তানিয়া সুলতানা, শাহজাহান কবির এবং আমি। গ্রন্থের অক্ষর বিন্যাসের কৃতিত্ব শরীফুল ইসলাম ও তারেকুল ইসলাম ভ্রাতৃদ্বয়ের।

এই বহির প্রথম খণ্ড প্রকাশ করিয়াছিলেন 'এশীয় শিল্প ও সংস্কৃতি সভা'। এই সভার অকৃপণ ঋণ না হইলে এই খণ্ডও ভিতরেই থাকিত। কদাচ বাহিরে আসিত না। সভার সকল সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান যথা আহমদ ছফা স্মৃতি পাঠাগার ও মহাফেজখানা, আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা, ঢাকা চলচ্চিত্র সভা, ঢাকা আলোকচিত্র সভা এবং ঢাকা মিউজিক কনজারভেটরি আমাদের সহায় না হইলে এই বহি হয়তো অস্তিমানই হইত না। ইহাদের সহিত আমাদিগের সম্পর্ক নিতান্ত ধন্যবাদের নহে।

সলিমুল্লাহ খান আজিকালি সাধু ভাষায় লিখিতে লাগিয়াছেন। এই ইতিহাসের রচয়িতাও 'ঢাকা লাকাঁ বিদ্যালয়'। এই গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ডে 'প্রার্থনা' দিয়াই তাঁহার সাধুভাষায় হাতেখড়ি। তাহার পর নেশা। তবে তাঁহার সাধু-প্রীতির কারণ বাহির করিতে আমাদিগকে তাঁহার 'অজ্ঞান' ঘাঁটিতে হইবে না, সজ্ঞানে উঁকি মারিলেই কাজ চলিবে। মহাশয় অদ্যাবধি বিড়াল বা কুকুর বাদ দিয়া কেন জানি 'আধুনিকতা'র প্রতি 'বিদ্বেষ' পুষিয়া আসিতেছেন। আর পর বা উত্তর আধুনিকতা বলিয়া কোন দ্রব্য হাজির তিনি মানিতে চাহেন না। সন্দেহে এই গ্রন্থের 'আধুনিক ও উত্তরাধুনিক' প্রবন্ধ দেখিয়া

লইবেন। ফলস্বরূপ প্রাচীনত্বই তাঁহার পাথেয়। তিনি অবশ্য 'প্রার্থনা'য় সাধুরীতির পক্ষে নিজ সাফাইও গাহিয়াছেন।

তিনি আমাদের হস্তে আধা-সাধু রচনা গছাইয়া দেন। তাহার পর আমাদিগকে গলদঘর্ম হইতে হয় পূর্ণ-সাধু বানাইতে গিয়া। এই কারণেই এত কথা বলিবার প্রয়োজন পড়িল। সিকি-আধুলিতেও যদি নিষ্কৃতি পাইতাম!

তাঁহার ভাষারীতি, শব্দের ব্যবহার, এমনকি বানানও দিনান্তরে বদলাইয়া যায়। তাঁহার একখানা রচনা সম্পাদনা করা যতখানি সহজ, দশ বৎসরাধিক কালে লিখিত বিশটি রচনার মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া সম্পাদন করিবার কথা চিন্তা মাত্র করা তাহার চাইতে শতগুণ কঠিন। এই খণ্ডে আমরা তাহা শুদ্ধ চিন্তা নহে, বাস্তবায়নও করিয়াছি। পূর্ণাঙ্গ না হইলেও অধিক অংশের। সম্পাদনার শেষ মুহূর্তে আসিয়া তিনি বড়সড় একখানা বাগড়া দিলেন: 'ইংরেজ' বদলাইয়া 'ইংরেজ' করিতে হইবে, 'কাল' বদলাইয়া 'কালো'... আরো কত কি! ইংরেজকে ইংরেজ বানানো সহজ হইলেও কালকে কালো বানানো অত সহজ হইবে না বিধায় তাঁহার নির্দেশ চৌদ্দ আনাও মানিতে পারি নাই। পরবর্তী কোন গ্রন্থে তাঁহার এই চাহিদা—বজায় থাকিলে—পূরণ করিব, ওয়াদা করিলাম।

'মানুষ', 'পড়শি', 'ইতিহাস', 'ভাষা', 'পর', 'অপর', 'অচেতন'—এই ধরনের অনেক ধারণাকে কখনো কখনো সলিমুল্লাহ খান সম্মান করিয়া 'আপনি' সম্বোধন করিয়াছেন, আবার কখনো সাধারণ প্রেমে 'তুমি' বলিয়াই বোলাইয়াছেন। আমরা তাঁহার কামনায় হস্তক্ষেপ করি নাই।

সার্বিকভাবে আমরা কোন প্রকার 'প্রমিত' বানানরীতি মানিয়া চলিতে চাহি নাই। সকল ক্ষেত্রেই মিতব্যয়িতার পরিচয় দিয়াছি। উদাহরণ বলিলে, হ্রস্ব-দীর্ঘ উভয় সঠিক হইলে হ্রস্বকেই সঙ্গে লইয়াছি। আর যাহা এক পাতা উল্টাইলেই স্পষ্ট হইবে। মূল বহি খুঁজিয়া না পাওয়ায় কিছু কিছু উদ্ধৃতি ভুল থাকিয়া যাইবার সম্ভাবনা মরিল না। ইহা ছাড়াও—আমরা হলপ (মানে এফিডেভিট) করিয়া বলিব—বহু ভুল থাকিয়া গিয়াছে।

গ্রন্থবদ্ধ সকল রচনাই এক বা একাধিক বার পূর্ব প্রকাশিত। তথাপি প্রথম প্রকাশের সাথে মিলাইয়া না দেখাই মঙ্গল—ইহারা বহুলাংশে নতুন রূপ পাইয়াছে। কোথাও কোথাও সম্পাদকগণ লেখকের অনুমতি ছাড়াই লেখা সংক্ষিপ্ত করিবার অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এখানে কিছু কিছু অযৌক্তিক বিলুপ্তি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'রাষ্ট্র ও বাসনা' প্রবন্ধটির পাঠ মিলাইয়া পড়িলেই ইহা স্পষ্ট হইবে। প্রবন্ধগুলির উৎস হিসাবে ব্যবহৃত বহি, সংবাদপত্র বা সাময়িকীর সম্পাদকগণের নিকট আমাদিগের কর্জ বাড়িয়া গেল।

....

ঢাকা ॥ ফাল্গুন ১৪১৪

প্রার্থনা

সলিমুল্লাহ খান

দুই বৎসর ছয় মাস আগে জাক লাকাঁ বিদ্যালয়, প্রথম খণ্ড বাহিরে আসিয়াছিল। নাম দাঁড়াইয়াছিল *ফ্রয়েড পড়ার ভূমিকা*। তাঁহার অনুকরণ করিয়া বলিতে পারিতাম এই খণ্ডের নাম 'লাকাঁ পড়ার ভূমিকা'। ঐ খণ্ডের দেহ যতখানি মিহি ছিল এক্ষণে দ্বিতীয় খণ্ড তত আর মিহি নহি। ঈশ্বরের অপার কৃপায় এপারে আমাদের একজন প্রকাশক জুটিয়াছেন। 'আমি তুমি সে' নাম ধারণ করিয়া দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হইল।

এই খণ্ডের প্রধান আকর্ষণ বোধ করি মহাত্মা জাক লাকাঁর গঠনতন্ত্র (অথবা তথাকথিত বল্টিমোর) বক্তৃতার তর্জমা। পাঠিকার সুবিধা হইবে ভাবিয়া আমরা সঙ্গে মূল ইংরেজিটিও রাখিয়া দিয়াছি। ইহাতে বইটির বড়াইবাড়িল, বায়ও বাড়িল। রাজি হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশক মহাশয়ের শোকর আদায় করিতেছি।

এই খণ্ডে আমার লেখা ছোট বড় ১৯ রচনা একত্র করা হইয়াছে। ভাবের দিক দিয়া এই রচনাবলি আমার শিক্ষানবিসীর শহিদ বা সাক্ষী মাত্র। পাছে কেহ অত্র মতামতের ভার খোদ জাক লাকাঁ মহাশয়ের ঘাড়ে চাপাইয়া দেন সেই ত্রাসে এই বাক্য সনির্বন্ধ করিলাম।

জাক লাকাঁর সহিত পরিচয় ঘটিবার পর আমার আত্মপ্রকাশ কিছু পরিমাণে সহজ হইয়াছে বলিয়া মনে করি। তবে প্রার্থনাচ্ছলে এক্ষণে আত্মজীবনী রচনা করিব না। শুদ্ধ বলিব ১৯৯৮ সালে লিখিত 'গোলাম সাবদার সিদ্দিকির কবিতায় রাজনীতি: আবদুল মান্নান সৈয়দের সঙ্গে বিচার' আমার প্রথম রচনা যাহাতে লাকাঁ পড়িবার ফল ফলিয়াছে। বর্তমান খণ্ডের সর্বশেষ রচনা 'সিমন দো বুভোয়ার: নারী মুখ পুরুষ মুখোশ' ২০০৮ সনে রচিত।

গ্রিক তত্ত্বজ্ঞানের ধারা এয়ুরোপের যেই সকল মনীষী এখনো বাজায় রাখিয়াছেন বলিয়া জানি ফরাসি জাক লাকাঁই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। অন্তত এই আমার

ধারণা। ফরাসিদেশে এত জ্ঞানী ও গুণীর সমাবেশ! কার সাধ্য তাঁহাদের তথ্যর করিয়া শেষ করে? শুনিতেছি, জাক লাকাঁই তাঁহাদের মধ্যে উজ্জ্বলতম।

খোদ ফরাসিদেশে আর বাদবাকি এয়ুরোপ ও আমেরিকায় তাঁহার কথা বুঝিবার লোক খুব—বেশি তাহাও কিন্তু নহে। এয়ুরোপে ও আমেরিকায় বর্ণবাদের নতুন নতুন অভ্যুত্থান ঘটিতেছে ইহা জাক লাকাঁ একদা—আজি হইতে প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে—পেশার বাহিরে ছিটকাইয়া যাইবার ঝুঁকি লইয়া বলিয়াছিলেন। (লাকাঁ ১৯৯০: ৩২–৩৩)

বর্তমান সংগ্রহে পাঠিকা হয়তো লক্ষ্য না করিয়া পারিবেন না আমার লেখার রীতি দিন দিন বদলাইয়া যাইতেছে। এই সংগ্রহের লেখা কোন কোনটি তথাকথিত 'চলিত' (অর্থাৎ অসাধু) ভাষায় আর কোন কোনটা 'সাধু' (অর্থাৎ অচলিত) ভাষায় রচিত। পাঠিকা জিজ্ঞাসা করিতেই পারেন, কী কারণে?

বাংলাদেশের বুর্জোয়াশ্রেণী বাংলা ভাষাকে এক্ষণে দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা দান করিতে গ্রীবা উঁচু করিয়া আছেন। কি চলিতে কি সাধুতে, কিছুতেই তাঁহাদের কিছু যায় না, আসেও না। তাঁহাদের কোন কোন প্রতিনিধি আবার 'প্রমিত' ভাষা বলিয়া নতুন একটি অপভাষাও প্রস্তাব করিতেছেন। এই 'প্রমিত' বা 'অচলিত' ভাষা দুইটাই আসলে ছদ্মবেশধারী 'সংস্কৃত' ভাষা। সম্ভবত ইঁহাদের পূর্বপুরুষগণ সম্পর্কেই বড়কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছিলেন: 'ভাষার বিচারের মধ্যে এসে পড়ে আভিজাত্যের অভিমান, সেটা খাঁজাত্যের দরদকে ছাড়িয়ে যেতে চায়।' তাঁহার কথায়:

> দেশজ বলে কারো কারো মনে বাংলার পরে যে অবমাননা আছে সেটাকে সংস্কৃত ব্যাকরণের নামাবলী দিয়ে ঢেকে দেবার চেষ্টা অনেকদিন আমাদের মনে আছে। বালক বয়সে যে ব্যাকরণ পড়েছিলুম তাতে সংস্কৃত-ব্যাকরণের পরিভাষা দিয়ে বাংলা ভাষাকে শোধন করবার প্রবল ইচ্ছা দেখা গেছে; অর্থাৎ এই কথা রটিয়ে দেবার চেষ্টা, যে, ভাষাটা পতিত যদিবা হয় তবু পতিত ব্রাহ্মণ, অতএব পতিতের লক্ষণগুলো যতটা পারা যায় চোখের আড়ালে রাখা কর্তব্য। অন্তত পুঁথিপত্রের চালচলনে বাংলাদেশে 'মস্ত ভিড়'কে কোথাও যেন কবুল করা না হয়।॥ স্বাগত বলে যেন এগিয়ে নিয়ে আসা হয় 'মহতী জনতা'কে। (ঠাকুর ১৩৯১: ৩২২ক)

বর্তমানে 'চলিত' ভাষা নামে যাহা চলিতেছে তাহা আসলে সাধুভাষারই একটা অপরূপ মাত্র। শুদ্ধ ক্রিয়াপদ আর সর্বনাম পদ খাটো করিয়া লিখিলেই 'চলিত' ভাষা হয় না। ভিতরে ভাষার ঠাট বদলাইয়া 'সংস্কৃত' করিলেন আর বাহিরে দুইটি ক্রিয়া কি পাঁচটি সর্বনাম 'প্রাকৃত' বানাইলেন—ইহাতে ভাষা 'চলিত' হইল না, 'অসাধু' হইল মাত্র।

আমি 'অসাধু' ভাষা বর্জন করিয়া লিখিবারই পক্ষপাতী। পুরাতন সাধু ভাষা ফিরাইয়া আনিতেছি বলিয়া যদি কেহ অসন্তুষ্ট হয়েন আমি তাহার সম্মুখে করজোড়ে

দাঁড়াইব। অনেক দিন আগে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঢাকাবাসীর সংবর্ধনার উত্তরে দাঁড়াইয়া এই রকমই বলিয়াছিলেন, 'আরো, আমি শুদ্ধ বাঙ্গালি নহি, বাঙ্গাল। আমার বাটি যশোহর।' (দত্ত ২০০৪: ৭৪২)।

আমিও যোগ করিতে পারিতাম, 'আরো, আমি বাঙ্গালও শুদ্ধ নহি, মোছলমান। আমার বাটি চাটিগাঁ'। কিন্তু সেই যোগ অঙ্ক এখানে করিব না। শুদ্ধ বলিব: কবি মহাত্মা জসীমউদ্দীন বাংলা ভাষা যে প্রকারের লিখিয়াছিলেন তাহার কাছাকাছি কিছু একটা আমার নমুনা বা আদর্শ। বাংলাদেশের ভাষায় কেন সেই স্বাচ্ছন্দ্য থাকিবে না যাহা থাকিলে মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাঙ্গালের ইংরেজি ভাষার আশ্রয় লইবার দরকার হয়? ইহাই জিজ্ঞাসা।

এতক্ষণে আমার কৈফিয়ৎ শেষ হইল। আমি সালিশ করিতে বসি নাই। নালিশ লইয়া আসিয়াছি মাত্র। রামমোহন রায় ও বঙ্কিমচন্দ্রের দুই-একশত বৎসর পরও বাংলা ভাষার চিন্তা করার ক্ষমতা নাই—এই অপবাদ যে মানিতে চায় মানুক, আমি অন্তত মানিয়া লইতে তৈয়ার নহি।

এই দেশের ভাষায় যাহা কিছু অপকৃষ্ট, যাহা কিছু পরিত্যাজ্য, যাহা কিছু বর্জ্য তাহাকেই বর্তমানে একদল মানুষ 'প্রমিত' ভাষা বলিয়া চালাইতেছেন। আর তারপরও আমরা হাত-পা নড়াইব না? তাহা কী করিয়া হয়? ইঁহারা রাষ্ট্র ও জাতীয় সমাজ দুই জিনিসকেই এই অপকর্মে লিপ্ত করিতেছেন। আমাদের লড়াই করা ছাড়া পথ কোথায়?

নাসরিন করিমের সঙ্গে আমার কখনো সাক্ষাৎ বা দূরপ্রলাপ পর্যন্ত হয় নাই। আমাকে যুক্তরাষ্ট্র হইতে ২০০৬ সালের মাঝামাঝি জাক লাকাঁর বল্টিমোর বক্তৃতা এক কপি যদি না পাঠাইতেন তো এই তর্জমা নিষ্পন্ন হইত না। দুঃখের মধ্যে, লেখাটি পাঠাইবার দুই মাসের মধ্যে তিনি অকস্মাৎ এন্তেকাল করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল বাংলাদেশে ফিরিয়া আসেন। সেই কথা তিনি আমাকে বৈদ্যুতিক পত্রযোগে লিখিয়াছিলেন। আমি তুমি সে তাঁহার উদ্দেশে উৎসর্গিত হইল।

আর তাঁহার দেখা পাইব না। এই পরিতাপ রহিয়া গেল।

আরো অনেকের দেখাও পাইব না। সকলের কথা লিখিব কি করিয়া! ইংরেজি ২০০৬ সনের ১২ জানুয়ারি তারিখে আমার মাতৃদেবী ইহলোক ছাড়িয়াছেন। ১৯৯৮ সনে প্রকাশিত আমার একটি বহি তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলাম। তাহাতে কিছু শান্তি মিলিতেছে।

আরো একজনের হাতে এই বহি তুলিয়া দিতে চাহিয়াছিলাম। তিনি রাজি হইলেন না। এক বছর সময় চাহিলেন। তাহাতে দুঃখ নাই। বহিখানা ছাপাইতে কেন এত দেরি হইয়াছে জানিলে হয়তো তিনিও বুঝিবেন।

আরো জানিবেন 'তোমারে যা দিতে চাই সে তাঁহারই দান'।

আমি তুমি সে

দোহাই

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাংলা শব্দতত্ত্ব*, ৩য় স্বতন্ত্র সংস্করণ (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৯১)।
২. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, *মধুসূদন রচনাবলী*, ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, ৫ম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০০৪)।
৩. Jacques Lacan, *Television/A Challange to Psychoanalytic Establishment*, Denis Hollier et al., trans., Joan Copjec, ed. (New York: W. W. Norton, 1990).

....

ঢাকা। ফাল্গুন ১৪১৪

লাকাঁ

১

ভাষা, গঠন ও সহজ মানুষ
লাকাঁ পড়ার ভূমিকা

১৯৬৬ সনের অক্টোবর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত মেরিল্যান্ড রাজ্যের অন্তঃপাতী বল্টিমোর শহরে ফরাসি-মার্কিন বুদ্ধিজীবীদের এক বিশেষ সভা বসিয়াছিল। আমাদের এই আলোচনার বিষয়ের সহিত ঐ সভার আলোচ্য বিষয়ের বিশেষ মিল আছে। ফরাসিদেশের বুদ্ধিজীবী মহলে ততদিনে তত্ত্বজ্ঞানের প্রস্থানস্বরূপ গঠনতন্ত্র (structuralism) নামক নতুন প্রস্তাব লইয়া আলোচনা জমিয়া উঠিয়াছে। আর মার্কিন দেশেও ইহার প্রভাব ছড়াইয়া গিয়াছে। তাই ১৯৬৬ সালের এই বল্টিমোর সভার বিষয় ঠিক হইয়াছিল 'গঠনতন্ত্র'।

ঐ সভায় যাঁহারা হাজির হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন রলাঁ বার্থ, জাক লাকাঁ, জাক দেরিদা, লুসিয়ঁ গোল্ডমান, জঁ-পল ভেরনা এবং ৎস্বেতান তোদোরব প্রমুখ নামজাদা বিদ্বান ও বুদ্ধিজীবী। অন্য এক নামজাদা বুদ্ধিজীবী জঁ ইপ্পোলিত ফরাসি তরফে এই সভা আঞ্জাম করিয়াছিলেন।

বলা হয়তো নিষ্প্রয়োজন নহে, এই জঁ ইপ্পোলিত জর্মান হেগেলের ফরাসি অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়া বিশেষ নাম কুড়াইয়াছিলেন। তিনি চাহিলে জাক লাকাঁর বিশেষ বন্ধু ও জাক দেরিদার প্রধান শিক্ষক হিসাবেও পরিচিত হইতে পারিতেন। দুর্ভাগ্যবশত মহাত্মা ইপ্পোলিত ১৯৬৮ সনে—নিতান্ত অপরিণত বয়সে—এন্তেকাল করিয়া সকলকে শোক-সাগরে ভাসাইলেন।

কারণ যাহাই হউক অনেক দেরি করিয়া ১৯৬৬ সনের ঐ সম্মিলনের কার্যবিবরণী প্রথম ছাপা হয় ১৯৭০ সন নাগাদ। ইহার দুই বৎসর পর তাহার পুনর্মুদ্রণও হয়। পুনর্মুদ্রণের অজুহাতে বইয়ের নামেরও কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয়। ১৯৭০ সনের সংস্কার অনুসারে বইয়ের আসল নাম রাখা হইয়াছিল *বিচারশাস্ত্রের ভাষা ও মনুষ্যের জ্ঞানবিজ্ঞান: গঠনতন্ত্র বিসম্বাদ*। ১৯৭২ সনের সংস্কার অনুসারে উহার নাম উল্টাইয়া

রাখা হইল *গঠনতন্ত্র বিসম্বাদ: বিচারশাস্ত্রের ভাষা ও মনুষ্যের জ্ঞানবিজ্ঞান*। ইহার মানে বড় নাম ছোট হইল, ছোট হইল বড়।

পাঠিকারা ইহাতেই বুঝিবেন জ্ঞানের জগতে গঠন (structure) নামে নতুন কোন ঘটনা ঘটিয়াছে। ইহাতে প্রমাণ এয়ুরোপের মনে মনে 'গঠনতন্ত্র' বড় আকারের ফটিক হইয়া উঠিয়াছে। ১৯৬৬ সনে ঠিক ইহাই অনুমান করিয়াছিলেন মহাত্মা জাক লাকাঁ। তাঁহার বল্টিমোর বক্তৃতায় সেই কথার প্রমাণ আছে। লাকাঁ বলিয়াছেন:

> [গঠন] ধারণাটি কী তাহা লইয়া লোকে কিছু কিছু ভুল করিবেই; তালগোল পাকাইবে, অনুমানের পর অনুমান নির্ভর ব্যবহার করিতে থাকিবে আর আমার মনে হয় বেশিদিন না যাইতেই শব্দটি লইয়া একপ্রকার হুজুগের চল হইবে।

এই বক্তৃতার তাৎপর্য পুরাপুরি বুঝিতে না পারিয়া স্বল্পশিক্ষিত সাংবাদিকরা মনে করিয়াছিলেন জাক লাকাঁ বড় কঠিন লোক। তাঁহার কথা বুঝিবার সাধ্য সাধারণের নাই। তাঁহারা আরো বলিয়াছিলেন, লাকাঁ সাহেব যেহেতু ইংরেজি ভাষাটি সঠিক আয়ত্ত করিয়া সারেন নাই, তাই তাঁহার বক্তৃতা দশজনের পক্ষে ভালমত হজম করাও সম্ভব হয় নাই। আমরা সেই বক্তৃতার অনুবাদ এখানে পেশ করিতেছি। আমাদের তর্জমার ত্রুটির পরও—পাঠিকাগণ দেখিবেন—এই বক্তৃতার বিরুদ্ধে যাহা রটিয়াছে তাহা যে পুরাপুরি সঠিক নহে তাহা হয়তো বোঝা যায়। নহিলে বাংলায় অনুবাদ করিবার কথাই উঠিত না।

কেহ কেহ বলিয়াছিলেন বল্টিমোর সম্মিলনে মিলনকথা যাহা উঠিয়াছিল তাহা ভাষা ও মানুষের সম্বন্ধটা কী সেই জিজ্ঞাসা লইয়া। একদল জিজ্ঞাসিয়াছিলেন—মানুষ ভাষা তৈয়ার করিয়াছে নাকি ভাষাই মানুষ তৈয়ার করিয়াছে? কেহ কেহ দাবি করিয়াছিলেন ফরাসিদেশ হইতে প্রচারিত গঠনতন্ত্র নামক প্রচারণা প্রমাণ করিয়াছে যে 'মানুষ' বলিয়া সামান্য কিছু নাই।

তাহা হইলে সহজ মানুষ (subject) বলিয়া বিশেষ কিছু থাকিবে কী করিয়া? বিজ্ঞানের ইতিহাস ব্যবসায়ী মিশেল ফুকো সাহেবের নামে এই প্রচারণা কিছুদিন গাড় চলিয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিতে হইতেছে, উপরোক্ত ১৯৬৬ সম্মিলনে মিশেল ফুকো হাজির হয়েন নাই। তবে তর্কের খাতিরে স্বীকার করিতে দোষ নাই: ঐ বছর ছাপা তদীয় *ভাষা ও বস্তু* (*Les mots et les choses*) বইয়ে তিনিও ঐ রকমের ইশারাই করিয়াছিলেন।

অথচ তিন বৎসরের মাথায় ছাপা *জ্ঞানগরিমার আদিকথা* নামক পুস্তকে ফুকো ঘোষণা করিলেন: 'গঠনতন্ত্র' তথা 'মনুষ্য বলিয়া কিছু নাই'—কথাটি তাঁহার নহে। এহেন দাবি অলীক ও অসার। তিনি ১৯৬৬ সনের বইতে বলিয়াছিলেন: 'মানুষ' অর্বাচীন এবং তাহার অন্তর্ধান অত্যাসন্ন। অথচ ১৯৬৯ সনের কেতাবে সেই তিনিই ঘোষণা করিলেন: আমি কিন্তু কোথাও 'গঠন' কথাটি ব্যবহার করি নাই। (ফুকো

১৯৭২: ২০০-০১) সুতরাং গঠনতন্ত্র বিসম্বাদ (the structuralist controversy) কথাটি অলীক বুলি মাত্র। তবে শেষমেশ এই ফুকো কবুল করিলেন: তিনি নিজেও মনুষ্য সাধকের সাধনার মূল্য খানিক কমাইয়া দেখিয়াছিলেন আর কিছু বাড়াইয়া দেখিয়াছিলেন এই গঠনে সেই গঠনে পাওয়া যুগপৎ মিলের মূল্য।

কী ঘটিয়াছিল এই সময়? বিশেষ করিয়া বলিতে নৃবিজ্ঞানসাধক হজরত ক্লদ লেভি-স্ত্রস যখন দেখাইয়াছিলেন ফ্রয়েডের আবিষ্কৃত অজ্ঞানের গঠন আর মনুষ্যজাতির মধ্যকার পরিবার ও আত্মীয়তা-সম্পর্কের গঠন একই গঠনের রকমফের মাত্র, প্রকৃত প্রস্তাবে গঠনতন্ত্র প্রস্তাব পেশ করা হইয়াছিল তখনই। ইহাতে জাক লাকাঁ আরো আহুতি দিলেন—বলিলেন—অজ্ঞানের গঠন পরিষ্কার ভাষার মতন। গঠনতন্ত্র সত্য সত্যই গড়িয়া উঠিল।

ইহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখাইলেন যাঁহারা তাঁহারা আগের শতকের দর্শনতত্ত্বজ্ঞানী নিৎশের দোহাই পাড়িলেন। ফুকো একা নহেন, কিছু পরিমাণে জাক দেরিদা আর বহুল পরিমাণে জিল দল্যুজ তাঁহার সঙ্গী হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে কিছু প্রভেদ থাকিলেও মূল প্রশ্নে সকলেই একমত হইলেন। তাঁহারা ধরিয়া লইলেন গঠনতন্ত্র মানে সহজ মানুষের অন্তর্ধান। তাই ফুকো ও দল্যুজ নিৎশের আশ্রয় লইলেন আর দেরিদা উটপাখির মতন ভাষার বালিতে আমুণ্ড পদনখর ডুবিলেন।

গঠনতন্ত্র কথাটি শুরু হইতেই এই ভুল বোঝাবুঝির উপর দাঁড়াইয়া আছে। অনেকেই মনে করিয়াছিলেন গঠন থাকিলে সহজ মানুষ থাকিতে পারে না। অথচ জাক লাকাঁ একেবারে বিসমিল্লাহ হইতেই বলিয়া আসিতেছিলেন এই ধারণাটি আদপেই সঠিক নহে। পক্ষান্তরে তিনি দাবি করিলেন, গঠন ও সহজ মানুষের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী। গঠনের পরই শুদ্ধ সহজ মানুষের আবির্ভাব ঘটে, পূর্বে বা বিহনে নহে।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিয়াছিল: সহজ মানুষ কী বস্তু? জাক লাকাঁ বলিলেন: সহজ মানুষ কথাটার অর্থই হইতেছে 'যাহা সহজ নহে'। কোন জিনিস ভাষার মধ্যে ধরিয়া রাখা সহজ নহে বলিয়া আমরা কি বলিতে পারি জিনিসটুকু নাই? সেই সময় শার্ল মোরাজে নামক জনৈক ইতিহাস বিশারদ আওয়াজ তুলিয়াছিলেন, ঋণাত্মক একের বর্গমূল (the root of minus one) কথাটির অর্থ কী? গণিতশাস্ত্রে এই চিহ্নটিকে অযৌক্তিক (irrational) সংখ্যা বলা হইয়া থাকে। অথচ ইহা তো খোদ গণিতেই কাজ করে। জাক লাকাঁ ইহার বরাত দিয়া বলিলেন: প্রাণীস্বরূপ মানুষ বা 'জীব' ও 'সহজ' মানুষের মধ্যকার পার্থক্যও অনুরূপ বটে। 'সহজ মানুষ' কথাটা যদি অযৌক্তিক মনে হয় তবে তাহা ভাষারই দোষ। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা কাজ করে না বা ইহা নাই বলা যাইবে না।

জাক দেরিদা এক জায়গায় জাক লাকাঁর কাছে জানিতে চাহিলেন, ইহাকে সহজ মানুষ বা 'অজ্ঞান' বলিবার কারণ কী? ইহার উত্তরে লাকাঁ সভাস্থলে উপস্থিত বিদ্বানমণ্ডলির কাছে একটি গল্প বলিয়াছিলেন।

একদিন হোটেলে একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। জাক লাকাঁর ঘরের একটি টেবিল এক জায়গা হইতে আরেক জায়গায় সরাইবার দরকার হইল। তিনি যাহাকে বলে বেলম্যান বা পিয়ন তাঁহাকে টেবিলটি সরাইতে বলিলেন। পিয়ন সাহেব তাহাতে ক্ষেপিয়া গেলেন। বলিলেন, 'মহাশয়, ইহা আমার কর্তব্য নহে। আপনি দরকার মনে করিলে কথাটা বলিবেন গৃহ-পরিচারক বা হাউস-কিপারকে, গৃহ-পরিচারকগণ আসিয়া কাজটা করিয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা মহাত্মা লাকাঁর কোন কথাই শুনিলেন না। তাঁহারা শুদ্ধ স্ব স্ব উপরিওয়ালার আদেশ অনুসারে কাজ সারিয়া চলিয়া গেলেন। ইহা হইতেই—লাকাঁ বলিলেন—তিনি ঠাহর করিলেন কাজ যাহা হইয়াছে তাহা (সহজ মানুষস্বরূপ) তাঁহার ইচ্ছায় হইয়াছে মনে করিলে ভুল হইবেন। কাজ হইয়াছে হোটেলের নিয়ম অনুসারে, খরিদ্দারস্বরূপ জাক লাকাঁর ইচ্ছায় নহে। মাঝখানকার খরিদ্দারবেশী জাক লাকাঁ নামক অস্থিরতাটুকুরই অপর নাম 'সহজ মানুষ'।

টেবিলটা বড় বেটপ জায়গায় ছিল। এখন বেশ চপ জায়গায় চলিয়া আসিয়াছে। মাঝখানে সৃষ্ট শূন্যতাই এক্ষণে প্রমাণ করিতেছে ঐখানে কি একটা যেন ছিল। অধৈর্যপরায়ণতার বাহক এই স্থানটির নামই 'সহজ মানুষ'। (রাবাতে ২০০২: ৪০)

জাক লাকাঁর এই বক্তৃতার নাম দেখিয়াই অনেকে ইহা পড়িতে চাহিবেন না মনে হয়। সে কি নাম রে বাবা! 'গঠন কাহিনী অথবা অন্তর্জগতে যাহা না মিশিলে কোন সহজই জন্মায় না সেই পরকীয়ার কথা' ('Of Structure as an Inmixing of an Otherness Prerequisite to Any Subject Whatever')। মহাত্মা লাকাঁ সেই দিনের বক্তৃতায় জানাইয়াছিলেন সমস্যাটি লইয়া তাঁহার কাজের বয়স ততদিনে ১৫ বৎসর হইবে। কাজেই তাঁহার সমস্ত কথা এক দিনে বলা সম্ভব হইবে না।

সেই দিনের বক্তৃতার আরো একটি কথা মনে রাখিবার মতন সুৎসই হইয়াছিল। বক্তৃতার শেষভাগে এক জায়গায় তিনি বলিলেন: 'অজ্ঞান কী বস্তু সংক্ষেপে তাহার সবচেয়ে সুন্দর ছবি এই সুবহে সাদেকের বাল্টিমোর শহর।' কিছু একটা আছে বোঝা যাইতেছে কিন্তু সঠিক কী যে আছে বুঝিতেছি না। তাহা বুঝিতে হইলে খানিক কল্পনার শরণ লইতে হইবে।

মনে রাখিতে হইবে সেই ১৯৫৩ সন হইতেই লাকাঁ বলিয়া আসিতেছিলেন: 'অজ্ঞানের গঠন ভাষার মতন।' ১৯৬৬ সনে—এই বক্তৃতাতেই—তিনি জাহির করিলেন ঐ কথাটি কিছু পরিমাণ বাহুল্যদুষ্ট ছিল। এক্ষণে তাঁহার সহজ মত দাঁড়াইল: 'অজ্ঞানের গঠন আছে বলিলেই চলিত, কারণ গঠন মানেই তো ভাষা।'

লাকাঁর কথা যৎসামান্য উদ্ধার করিতেছি:

> সত্য বলিতে 'ভাষা আকারে' কথাটি বাহুল্য বটে, কারণ 'গঠিত' বলিতে যাহা বুঝায় 'ভাষা আকারে' বলিতেও হুবহু তাহাই বুঝায়। গঠিত বলিতে বুঝায় আমাদের জবান, আমাদের অভিধান ইতি আদি। গঠিত অর্থ যাহা, ভাষা অর্থও অবিকল তাহাই।

মনে রাখিবার মতন মচমচে কথা এই বক্তৃতায় আরো এক প্রস্থ পাওয়া যাইতেছে। চিহ্ন (sign) ও পদের (signifier) মধ্যে ভেদ আছে—এই প্রস্তাব প্রচারের লক্ষ্যে লাকাঁ জানাইলেন: চিহ্ন মানে যাহা দিয়া সজ্ঞান এক প্রাণীর খবর অন্য প্রাণীকে দেওয়া চলে। কিন্তু 'যাহা সহজ মানুষের হইয়া সহজ মানুষের সঙ্গে যায় না, যায় অন্য এক পদের সঙ্গে তাহাকেই পদ কহে।'

আরো এক জবর খবর—এই স্থলে তিনি বলিয়াছিলেন—আছে। ভাষার বা পদের জগতে যাহা আছে তাহাকে বাসনা (desire) বলা হয়। বাসনার এক মানে যাহা বাস করে না—যাহা অস্থির, যাহা অধৈর্য। কিন্তু বাসনার তলে তলে আরো এক জিনিস বাস করে। তাহার নাম মজা (*jouissance*)। বাসা আর মজা মারা ঠিক এক জিনিস নহে। ভাষা মানে বাসনার বিধি—আইন ও ঈশ্বর যে অর্থেই ইচ্ছা—ধরিয়া লইতে পারেন। ভাষাই বিধি। ভাষাই নিষেধ। নিষেধ বা সীমা আছে বলিয়াই প্রাণী (এখানে মানুষ) সেই নিষেধের বেড়া ভাঙ্গিয়া—বা আইল ডিঙ্গাইয়া—ঘাস খাইতে চায়। নিষেধ বা আইল না থাকিলে তো আইল-ডিঙ্গানোর দরকারই হইত না—মজাও হইত না। কাজেই বল্টিমোর শহরের বিজ্ঞাপনচিত্রে লেখা 'এনজয় কোকা-কোলা' বা 'কোকা-কোলার মজা মার' দেখিয়া লাকাঁ বলিলেন: সকলেই সকলকে বলিতেছে 'মজা মার'।

এই মজা মারিতে মারিতে বেশি মারিলে এক সময় ব্যথা করিতে শুরু করে। অথচ এই ব্যথার সীমায় পৌঁছাইতে না পারিলে মজা যে সে মারিতেছে তাহার প্রমাণই হয় না। লোকে বলে মজাই জীবন, মজা না মারিলে এই জীবন লইয়া সে কী করিত? মজা জীবনের চাহিতেও বড়। জীবন তুচ্ছ—যে কেহই ত্যাগ করিতে পারেন। সকলেই যাহা সহজে করিতে পারেন না—ভারতীয় শাস্ত্রে—তাহারই অপর নাম 'ভক্তি'।

পাঠিকা, খেয়াল করিয়াছেন 'ভক্তি' কথাটার তাৎপর্য? 'ভক্তি' কথাটার আগে 'বি' উপসর্গ লাগাইলে কী হয়? 'বিভক্তি'। বিভক্তি আসিয়াছেন 'বিভাগ' করিবার ক্রিয়া হইতে। তাহা নহে তো কী? তাহা হইলে 'ভক্তি' আসিয়াছেন 'ভাগ হইতে'। প্রাণী-মানুষ বা 'জীব' ভাগ হইলেই 'সহজ মানুষ' তৈয়ার হয়েন। এই ভাগকর্মটি করেন যেই হাজাম বা নাপিত তাহারই অপর নাম ভাষা। ভাষাই ভাগ করেন। কাজেই ভাগ হইতে যাহার উৎপত্তি তিনিই বিভক্ত বা নিছক 'ভক্ত', আর তাহার পরায়ণতার নামই ভক্তি। খোদ ভক্তি ও মজার মধ্যে তাহা হইলে একটা না একটা যোগ আছে।

মজা মারিতে মারিতে আরো বেশি মারিলে ভাগ বা ভক্তি আর থাকিবেন না। তখন মজার রাশ টানিয়া ধরিতে হইবেক। ভাষা ও মজার—পরকীয়া ও আপনকার—এই যুগলবন্দিকেই আমরা এতদিনে 'গঠন' বলিয়া চিনিতে পারিলাম। আর জাক লাকাঁর কর্তৃ নগদ নগদ স্বীকার করিলাম। লাকাঁ-কথিত সমাচার এই স্থলেই মূর্তি পাইল: আপনকার হৃদয় বা অন্তরের সহিত বাহির বা পরকে মিশাইলেই

তক্ষ সেই 'সহজ মানুষ' দেখা দিবেন—অন্য হেতু, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে দিবেন না। কারণ তাহা যে দিবার নহে।

দোহাই

১. Michel Foucault, *The Archeology of Knowledge* [*L'archéologie de savoir*, Paris: Gallimard, 1969], A. M. Sheridan Smith, trans. (New York Pantheon, 1972); ইংরেজি এই সংস্করণে ১৯৭০ সনে কলেজ দো ফ্রঁসে ফুকোর প্রদত্ত বক্তৃতা *L'ordre du discourse* (Paris: Gallimard, 1971)-এর অনুবাদ 'The Discourse on Language' অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

২. --------, *The Order of Things* [*Les mots et les choses: une archéologie des sciences humaines*, Paris: Gallimard, 1966], A. M. Sheridan Smith, trans. (New York Random House, 1970).

৩. Jacques Lacan, 'Of Structure as an Inmixing of an Otherness Prerequisite to Any Subject Whatever', in Richard Macksey and Eugerio Donato, eds., 1970, *infra*, pp.186–200.

৪. Richard Macksey and Eugenio Donato, eds., *The Structuralist Controversy: The Languages of Criticism and the Sciences of Man* (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1972).

৫. --------, eds., *The Languages of Criticism and the Sciences of Man: The Structuralist Controversy* (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1970).

৬. Jean-Michel Rabaté, *The Future of Theory* (Oxford: Blackwell, 2002).

....

উৎস
http://arts.bdnews24.com

২

গঠন কাহিনী অথবা অন্তর্জগতে যাহা না মিশিলে কোন সহজই জন্মায় না সেই পরকীয়ার কথা

জাক লাকাঁ

আমার ইংরেজি উচ্চারণ একদম বাজে। উচ্চারণদোষে আমার বক্তৃতা ইংরেজিভাষী শ্রোতার কানে নিশ্চয়ই বড় মধুর শোনাইবে না। আর বক্তৃতাটা যদি আমি ইংরেজি জবানেই করি তো যাহাকে বলা যাইতে পারে আমার বার্তা তাহা যথাস্থানে না পৌঁছাইবার ঝুঁকিও থাকিয়াই যাইতেছে—আজ বিকালবেলা এই কয়টি কথা আমাকে বুঝাইবার আশায় এক ভদ্রলোক বেশ কিছু সময় ব্যয় করিয়াছেন। সত্য বলিতে বিষয়টি আমার বিবেকের ঘাড়েও ভারি বোঝা হইয়া রহিয়াছে। যদি অন্যথা করি তো তাহা হইবে আমি যেই বস্তুকে আমার বার্তা মনে করিয়া থাকি তাহার শতে একশত ভাগ বিপরীত কর্ম। বার্তা বলিতে আমি যাহা বুঝি তাহা আপনাদের সমক্ষে খুলিয়াই বলিতেছি: বার্তা মানে আমার নিকট আর কিছু নহে, মাত্র ভাষার বার্তা। আজকাল যেখানেই যাই দেখি সকলে বার্তা বার্তা করিতেছে—জীবদেহের অন্তরের হরমোনে বার্তা, বিমানপোতকে পথ দেখাইবার কিংবা উপগ্রহাদি হইতে সঙ্কেত ধরিবার আলোকরশ্মিও বার্তা। এই ক্রমে আরো আরো আছে। ভাষার বার্তা কিন্তু সেই জিনিস নন। ইহা ষোল আনাই ভিন্ন বস্তু। বার্তা—মানে আমরা যেই বস্তুকে বার্তা নামে ডাকিতেছি তাহা—বিনা ব্যতিক্রমেই পরমের পাঠানো বার্তা। পরম বলিতে আমি বুঝাইতেছি 'পরমের ঠিকানা বা অধিষ্ঠান'। আমরা সচরাচর যাহাকে 'পর' কিংবা 'অপর' (other) বলিয়া থাকি, যাহা লিখিতে ছোট ছাদের 'o' অক্ষর ব্যবহার করা হয়, এই পরম অবশ্যই সেই পরম নহে, আর সেই কারণেই এক্ষণে 'পরম' (Other) বলিয়া যাহাকে ডাকিতেছি তাহা লিখিবার সময় প্রথম হরফ নাগাদ বড় ছাদের 'O' ব্যবহার করিয়াছি। এতোদ্দেশে, এই বল্টিমোর শহরে, পরম মনে হইতেছে ইংরেজি জবানেই বাতচিত করিয়া থাকেন। আর ইহাই তো স্বভাবসম্মত। তাই আমি যদি এই বক্তৃতাটি ফরাসিযোগেই করিতাম তো তাহা হইত অন্যায় কাজ। অবশ্য উপরে যেই

ভদ্রলোকের দোহাই দিলাম তাঁহার কথাটিও ফেলিয়া দিবার মতন নহে। তিনি বলিয়াছিলেন ইংরেজি বোলটা আমার মুখে ঠিক সহজে আইসে না। অধিক কী, তাহা খানিক ভূতের মুখে রামনাম রামনাম শোনায়। আরো কথা আছে। আমি জানি অত্র সভায় এমনও অনেকে আছেন যাঁহারা শুদ্ধ ফরাসি ভাষাতেই বাতচিত করিতে পারেন, ইংরেজি এক নবুজও বুঝিতে পারেন না। আমি যদি ইংরেজিযোগে বলিতাম ইঁহাদিগের পক্ষে নিরাপদ হইত। তবে আমার হয়তো বাঞ্ছাই নাই যে ইঁহারা অতটা নিরাপদ থাকিবেন। অতএব ইঁহাদিগের মুখ চাহিয়া আমি এক-আধটু ফরাসিও কহিব।

পহিলা দফায় আমি 'গঠন' বলিতে কী বুঝায় সেই সম্বন্ধে কিছু আগাম কথা বলিতেছি। ইহাই তো আমাদের অদ্যকার সভার বিষয়বস্তু। ধারণাটি কী তাহা লইয়া লোকে কিছু কিছু ভুল করিবেই, তালগোলও পাকাইবে, অনুমানের পর অনুমাননির্ভর ব্যবহার করিতে থাকিবে আর আমার মনে হয় বেশিদিন যাইতে না যাইতেই শব্দটি লইয়া এক প্রকার হুজুগেরও চল হইবে। আমার বেলা এই কথাটি কিন্তু খাটিবে না কেননা আমি শব্দটি এস্তেমাল করিয়া আসিতেছি অনেক দিন হইতেই—পড়াইবার ব্যবসায় আরম্ভ করিবার পর হইতেই। এই বিষয়ে আমার যাহা বলিবার তাহা জানেন অল্প লোক মাত্র। আরো বেশি লোকে জানিতেন যদি আমি আমার বক্তৃতা সীমিত রাখিতাম মাত্র একদল বিশেষজ্ঞ শ্রোতা—মানে মনোবিশ্লেষণ বৃত্তিধারীদের—সমক্ষে। বিষয়টি বড়ই কঠিন। বেয়াড়া রকমের কঠিন মনে হইতেছে। কারণ মনোবিশ্লেষণ বৃত্তিধারীরা সত্য সত্যই আমি কিসের কথা বলিতেছিলাম তাহা কিছু কিছু জানেন আর মনোবিশ্লেষণ বৃত্তিটি যিনিই গ্রহণ করিয়াছেন তিনিই জানেন এই জিনিসটির সহিত আঁটিয়া ওঠা বিশেষ কঠিন কাজ বটে। সহজ মানুষ (subject) বলিতে সত্যই যাহা বোঝায় তাহা লইয়া যাঁহাদের কারবার সেই মনোবিশ্লেষণ বৃত্তিধারীদের কাছে সহজ মানুষ জিনিসটা তেমন সহজ জিনিস নহে। আমি চাই না আমি যাহা বলিতেছি তাহা লইয়া কোন ভুল বোঝাবুঝি হউক, কোন মেকোনাসঁস (*méconnaissance*) হউক। মেকোনাসঁস কথাটি ফরাসি। ইংরেজি ভাষায় ইহার সমান অর্থবহ আর কোন শব্দ নাই বলিয়াই আমি ফরাসি শব্দটিই ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলাম। মেকোনাসঁসের অর্থই এমন যে ইহার শরণ লইতে না লইতেই 'সহজ মানুষ' আসিয়া যায়। অধিক, আমাকে ইহাও জানানো হইয়াছে যে একমণ্ডলি ইংরেজিভাষী শ্রোতাসমক্ষে 'সহজ মানুষ' লইয়া কথা বলাটাও তেমন সহজ কাজ হইবে না। মেকোনাসঁস বলিতে বোঝায় 'ভুল বোঝা', কিন্তু ইহাতে আমার (বা আপনার) সহজ ভাবকে ভুল বোঝা বা না বোঝা বোঝায় না। সমস্যাটা—প্রকৃত প্রস্তাবে—গঠন (structure) বলিতে আদপেই কী বোঝায় তাহার সঙ্গে জড়িত।

আমি মনোবিশ্লেষণ শাস্ত্র পড়াইতে শুরু করিবার পর এক সময় আমার কয়েকজন শ্রোতা আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছিলেন। ইহার কারণ ততদিনে অনেক দিন হইয়াছে আমি একটি সরল সত্যের পরিচয় লাভ করিয়াছি। সেই সত্য অনুসারে আমরা যদি ফ্রয়েডের

যে কোন বই—বিশেষ অজ্ঞান সম্বন্ধে লেখা যে কোন বই—খুলিয়া দেখি তো শতে একশত ভাগ নিশ্চিত থাকিতে পারি যে একটা না একটা পাতা পাওয়া যাইবে যেখানে কোন না কোন শব্দ দেখিব—বই হইলেই স্বাভাবিকভাবে তাহা অজস্র শব্দে, ছাপানো শব্দে, ঠাসা হইবে—যাহা নিছক শব্দ নহে। এমন শব্দ দেখিব যাহা শব্দরূপী বস্তু বৈ নহে। এই নিশ্চয়তা অবশ্য নিশ্চয়তাই, শুদ্ধ সম্ভাবনা নহে। আমরা এই সমস্ত শব্দেরই মধ্যবর্তিতায় অজ্ঞান কী করিয়া সামলাইতে হয় তাহার পথ ধরিবার চেষ্টা করি। শব্দের অর্থ কী তাহা লইয়া এই স্থলে কথা হইতেছে না, কথা হইতেছে শব্দের হাড়-মাংস, শব্দের স্বভাব-শরীর লইয়া। ফ্রয়েডের চিন্তাভাবনার বড়য়া ভাগের কারবারই এই লইয়া, স্বপ্নের মধ্যে শব্দচমক (punning), কিংবা মুখ-ফস্কা কথা (*lapsus*), কিংবা ফরাসি ভাষায় যাহাকে বলে কালঁবুর (*calembour*) বা চমৎকথা, কিংবা ওমোনিমি (*homonymie*) বা নামসমতা তাহা লইয়া; কিংবা অধিক বলিতে কোন কোন শব্দ ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা যেই এক এক আলাহিদা অর্থ ধারণ করে তাহা লইয়া। শুদ্ধ শব্দই অজ্ঞানের মালমসলা—এই প্রস্তাব শতে একশত ভাগ প্রমাণসিদ্ধ হয় নাই। তবুও ইহা ভালমতন টুকিয়া রাখিবার জিনিস। কারণ প্রমাণসিদ্ধ না হইলেও ইহার হইবার সম্ভাবনা বিলক্ষণ আছে (তদুপরি, যাহাই হউক, আমি কদাচ বলি নাই অজ্ঞান বলিতে শব্দের মহফিল মাত্র বোঝায়। আমি শুদ্ধ বলিয়াছি অজ্ঞান বস্তুটা যে 'গঠিত' সেই সত্যে সন্দেহ নাই)। ইহার তুলনীয় কোন শব্দ ইংরেজি ভাষায় আছে বলিয়া আমার জানা নাই। কিন্তু থাকার দরকার আছে। কারণ আমরা কথা বলিতেছি 'গঠন' সম্বন্ধে আর অজ্ঞানের গঠন ভাষা আকারে। ইহাতে কী বুঝাইতেছে?

সত্য বলিতে 'ভাষা আকারে' কথাটি বাহুল্য বটে, কারণ 'গঠিত' বলিতে যাহা বোঝায় 'ভাষা আকারে' বলিতেও হুবহু তাহাই বোঝায়। গঠিত বলিতে বোঝায় আমাদের জবান, আমাদের অভিধান ইতি আদি। গঠিত অর্থ যাহা, ভাষা অর্থও অবিকল তাহাই। অধিক, ইহাই সব নহে। ভাষা মানে কোন ভাষা? আমি নই, আমার ছাত্ররা অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া এই সমস্যার ভিন্ন আরেকটি অর্থ খাড়া করাইবার কোশেশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা চাহিয়াছিলেন সারাংসার ভাষার মূল সূত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে। তাঁহারা জানিতে চাহিয়াছিলেন কোন জিনিসকে ভাষা পদবাচ্য হইতে হইলে কমসে কম কোন কোন শর্ত পুরাইতে হইবে? হইতে পারে শুদ্ধ চারিটি পদাঙ্ক (*signifiants*), চারিটি অর্থধারিণী অঙ্কুর (elements) হইলে পর্যাপ্ত হয়। পরীক্ষাটি বেশ মজাদার। তবে ইহার গোড়ায় গলদ আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি ইহা দেওয়াল পটে লিখিয়া দেখাইব আশা রাখি। পারি শহরে আমার বক্তৃতাসভায় কয়েকজন তত্ত্বজ্ঞানীও আসিতেন। যাঁহারা আসিতেন তাঁহারা সংখ্যায় অনেক নহেন, তবে বেশ কয়েকজনই আসিতেন। ইহাদের কেহ কেহ পরে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন যে সমস্যাটা ভাষার 'ভিতরে আরেক ভাষার' কিংবা ভাষার 'বাহিরে অন্য ভাষার' নহে। যথা পুরাকথা কিংবা রূপকথার সমস্যাও নহে, সমস্যা খোদ ভাষারই।

সমস্যার ঠিকানা প্রস্থান করাইতে ইঁহারা যেই কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা সত্য সত্যই অসামান্য। যেমন পুরাকথা লইয়া আলোচনার দরকার হইতেছে না কেননা পুরাকথাও যে ভাষার আকারে গঠিত তাহা একদম পরিষ্কার। আর আমি যখন 'ভাষার আকারে' কথাটা খাটাইলাম তখন আমি গণিতের ভাষা, কি সঙ্কেতের ভাষা, চলচ্চিত্রভাষা ইত্যাদি অর্থে বিশেষ বিশেষ ভাষা বোঝাইতে খাটাই নাই। ভাষা ভাষাই আর ভাষা মাত্রই এক জাতের: যথা ইংরেজি বা ফরাসি প্রভৃতি মূর্তিমান ভাষা। সব ভাষায় মনুষ্য কথা কহে। এই পর্যন্ত পৌঁছিয়া একটি কথা বলিতে হইবে: 'ভাষাপারের ভাষা' (metalanguage) বলিয়া কোন ভাষা নাই। কারণ ভাষাপারের ভাষা নামে অভিহিত সমস্ত ভাষার কথাই বলিতে হয় ভাষারই মধ্যবর্তিতায়। পটের গায়ে খালি খালি অক্ষর লিখিয়া কেহ গণিত শিখাইতে পারে না। দশজনে বুঝিতে পারিবে এমন কোন না কোন সামান্য ভাষায় কথা কহিবার দরকার পড়ে, সদা সর্বদাই পড়ে।

অজ্ঞান ভাষার আকারে গঠিত। ইহা নিছক এই কারণে নহে যে অজ্ঞানের মালমসলা তৈয়ার হইয়াছে—আমরা ফরাসি জবানে যাহাকে বলি—লগাজিয়ে (*langage*) তাহা অর্থাৎ ভাষার মশলা দিয়া। অজ্ঞান আমাদের সমক্ষে যেই সমস্যা তুলিতেছে তাহাই ভাষার স্বভাব সম্বন্ধে সবার চাইতে বেশি অভিমানিনী সমস্যার প্রান্ত ছুঁইয়া যায়: এই সমস্যারই নাম 'সহজ মানুষ'। কোন বাক্যের বক্তা কিংবা ব্যক্তিপরিচয়দাতা প্রতিনাম (personal pronoun) আর 'সহজ মানুষ' এক জিনিস, এমনি এমনি এই কথা বলা চলিবে না। ফরাসি জবানে বক্তব্য (*énoncé*) বলিতে হুবহু বাক্যই বোঝায়, তবে এমন বক্তব্যও ঢের রহিয়াছে যেখানে বক্তব্যটি ঠিক কে বকিতেছে তাহার কোন হদিস নাই। যদি বলি 'ইট রেইন্‌স' (It rains) বা বৃষ্টি হইতেছে তো যেই সহজ মানুষ কথাটি বকিলেন তিনি এই বাক্যে শরিক হইলেন না। যাহাই হউক, এই স্থলে কোথাও না কোথাও একটা গোল বাঁধিয়াছে। 'সহজ মানুষ' আর ভাষাব্যবসায়ীরা যাহাকে বলেন আড়কাঠি (shifter)—এই দুইকে সব সময় এক ভাবা ঠিক হইবে না।

অজ্ঞানের স্বভাব হইতে যেই সমস্যা দেখা দেয় তাহা—সংক্ষেপ করিয়া বলিলে—এই দাঁড়াইতেছে: কিছু না কিছু কখনো না কখনো *ভাবিতেছে*। ফ্রয়েড আমাদিগের উদ্দেশে কহিয়াছিলেন, অজ্ঞান সম্বন্ধে সকল কথার বড় কথা এই: অজ্ঞান ভাবনা বটে। অধিক জ্ঞানের এলাকায় যাহার প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে সেই ভাবনাই। এই নিষেধ একেক জায়গায় একেক রকম চেহারায় করা হইয়া থাকে, অর্থের কথা উঠাইলে বলিতে হইবে ইহার অর্থও নানান কিসিমের হইতে পারে। প্রধান অর্থটি সত্য সত্যই 'বাধা' বটে। এই বাধা হয় ডিঙ্গাইয়া যাইতে হইবে নচেৎ খুঁড়িয়া পার হইতে হইবে। না হইলে হইবে না। কথাটির ভার আছে, কেননা আমি যদি এই বাধার কথা জোর দিয়া না বলি তো আমাদের জীবন একান্তই মসৃণ মনে হইত। আমরা ফরাসি ভাষায় 'আপনার ব্যবস্থা হইয়াছে' (*ça vous arrange*) জাতীয়

কথা বলিয়া থাকি, কেননা নিচের তলায় বা মাটির নিচে কিছু না কিছু যদি ভাবিয়াই থাকে তো জীবনটা সহজ হইয়া যায়। ভাবনা জিনিসটা সদা সর্বদাই হাজির রহিয়াছে আর প্রাণধারী জীব স্বভাবের চাপে যাহা ভাবিতেছে তাহার সম্বন্ধে একটু হুঁশ আসিল, জীবন চলিয়া যাইবে একরকম। ঘটনা যদি তাহাই হইত তো ভাবনার ভারটা পড়িত প্রাণের উপরই, আর তাহাই হইত স্বাভাবিক, যেমন সাড়াই (instinct) হইত ভাবনা। ভাবনা যদি স্বভাবের ফসল হইত তো অজ্ঞান লইয়া কোনই গোল বাঁধিত না। দুঃখের মধ্যে, অজ্ঞানের সহিত 'সাড়া' কিংবা 'আদিজ্ঞান' কিংবা মাটির নিচে বাধা ভাবনার কোনই সম্বন্ধ নাই। ইহা শব্দযোগে ভাবনা অথবা আমাদের জাগরি-ছুট বা চেতন-রাস্তাহারা ভাবনা সম্বন্ধীয় ভাবনা বটে। জাগরি কথাটির ভার আছে। আমাদের চেতন অবস্থা লইয়া কোন দানব যদি খেলা করিত তবে তাহার সহিত এই অজ্ঞানের তুলনা চলিত। এই অপর মানুষটি সঠিক কে তাহা খুঁজিয়া লওয়াই এক্ষণে মূল সমস্যা। আর এই মানুষ অপর কেহ নহেন, ভাষা হইতে ভাবনা শুরু করিলে আমরা যেই সহজ মনুষ্যে আসিয়া পৌঁছাইতাম এই মানুষ হুবহু সেই মানুষ।

আপনাদের সমক্ষে বক্তৃতা দিবার উদ্দেশ্য লইয়া এই যৎসামান্য কথা যখন সাজাইতেছিলাম তখন বেশ ভাল মতন ভোর হইয়াছে। জানালার ফাঁক গলাইয়া বল্টিমোর দেখিতেছি। প্রহরটি বড়ই মজার। তখনো ঠিক রোদ উঠিয়া সারে নাই। কিন্তু সময় যে বহিয়া যাইতেছে তাহা একটা নিয়নবাতির বিজ্ঞাপন এক ঠাঁই জ্বলিয়া আর ঠাঁই নিবিয়া আমাকে মিনিটে মিনিটে খবর দিতেছিল। রোজ যেই রকম হয় তখনো রাস্তায় রাস্তায় সেই রকমই গাড়িঘোড়ার ভিড় ভারি হইয়াছে। দূরে গাছগাছালি কিছু কিছু চোখে পড়িতেছে। মনে মনে বলিয়া উঠিলাম এই কয়টি গাছের কথা ছাড়িয়া দিলে বলিতে হইবে আমি যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছি সব কিছুই আমার ভাবনা—যাহা ভাবিতেছি তাহার ফসল। এই স্থলে লোকজন ঠিক কী কাজে ব্যস্ত তাহা শতে একশত ভাগ পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে না। তাহা যাহাই হউক, সহজ মানুষের পরিচয় দিবে বলিয়া লোকে যেই দাজাইন (*Dasein*) বা তথাবস্তু বলিয়া একটা কথা তুলিয়া থাকে তাহাই হাজির হইয়াছিল এই ক্ষণিকের অতিথি বা পলায়নপর সাক্ষীর মধ্যে। অজ্ঞান কী বস্তু সংক্ষেপে তাহার সবচেয়ে সুন্দর ছবি এই সুবহে সাদেকের বল্টিমোর শহর।

'সহজ মানুষ' কোনখানে থাকেন? যেই 'অ-বশ' বস্তু হারাইয়া গিয়াছে তাহার রূপেই সহজ মানুষকে পাওয়া যায়, এই সত্য আমল করিতেই হইবে। আরো খুটাইয়া বলিলে বলিতে হইবে 'সহজ মানুষ' দাঁড়াইয়া থাকেন এই হারানো অবশ বস্তুর ঘাড়ে ভর দিয়া। অনেক ক্ষেত্রে দেখিবেন ইহা এমন বিদঘুটে বস্তু যাহার কথা আমরা কস্মিনকালেও ভাবি নাই। কোন কোন জায়গায় দেখা যায় ইহা 'করা হইয়াছে এমন কোন ক্রিয়া' মাত্র—দুনিয়ার তাবৎ মনোবিশ্লেষণ বৃত্তিধারী এবং অনেক অনেক বিশ্লেষিত মানুষও ইহা ভাল করিয়াই জানেন। এই কারণেই অনেক মনোবিশ্লেষণ

বৃত্তিজীবী মনে করেন আমাদের পক্ষে সাধারণ মনোবিজ্ঞানে ফিরিয়া যাওয়াই শ্রেয় হইবে। নিউ ইয়র্ক মনোবিশ্লেষণ সমিতির সভাপতি আমাদিগকে বলিয়াছেন ইহাই কর্তব্য। কিন্তু আমি তো বস্তু বদলাইয়া ফেলিতে পারি না। আমি মনোবিশ্লেষণ বৃত্তি করি। তবে কেহ যদি কোন মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক সমীপে হাজির হইতে চাহেন তাহা তাঁহার নিজ পছন্দের বিষয়। মনোবিজ্ঞানের কথাই যখন উঠিল তখন বলিতেছি, গঠনের সমস্যা কথাটা একলা আমিই ব্যবহার করিতেছি না। অনেক অনেক দিন গুজরান হইয়াছে চিন্তা ও গবেষণা, মায় আবিষ্কার-উদ্ভাবনা যাঁহাদের বৃত্তি আর যাঁহারা মন কী জিনিস এই প্রশ্ন লইয়া ব্যাপৃত তাঁহারাও বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বলিয়া আসিতেছেন যে গঠন জিনিসটার সবার চাহিতে ভারি এবং স্বভাবজাত গুণ হইতেছে 'একভাব' (unity)। ইহার কোন প্রমাণের ডাক পড়ে না। জীবের অখিলে (real) এই গুণ এমনিতে হাজির ধরিয়া লেখিলে স্বতন্ত্র প্রমাণ দিবার দরকারই পড়ে না। জীব যখন ষোল কলায় পূর্ণ তখন সে 'একভাবুক' এবং একভাবুক আকারেই তাহার কর্মকাণ্ড চলে। এই 'একভাব' ধারণাটি যখন মনের বেলায় খাটাইবার কথা ওঠে তখনই সমস্যা-গোলযোগে ভরিয়া যায়। কারণ মন আপন স্বরূপে 'নিখিল' নহে। কিন্তু আপনারা তো জানেনই যে বলা হইয়াছিল: মন এক না হইলেও তাহার 'মতলবগত একভাব' আছে। এই ধ্যানধারণার ভিত্তিতেই তো যাহাকে বলা হয় কাণ্ড কারখানার আন্দোলন (phenomenological movement) তাহা সম্ভব হইয়াছিল।

একই কথা পদার্থবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানে চলিত তথাকথিত অবয়বপন্থা (*Gestalt*) মতবাদ সম্বন্ধেও খাটিত। আর খাটিত সহজ-স্বরূপ (*bonne forme*) নামক ধারণার ক্ষেত্রেও। এই ধারণার দৌলতেই, উদাহরণস্বরূপ, এক ফোটা পানির সঙ্গে আরো জটিল ভাবনাচিন্তার সংযোগ ঘটাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। অধিক, বড় বড় মনোবিজ্ঞানীর দল আর এমনকি মনোবিশ্লেষণ বৃত্তিধারীরা পর্যন্ত 'নিখিল ব্যক্তিত্ব' প্রভৃতি ধারণায় ভরপুর। যাহাই হউক, 'একতাসাধক একভাব' সব সময়ই সামনে চলিয়া আসে। আমি কখনোই জিনিসটা কী বুঝিতে পারি নাই। কারণ আমি যদি মনোবিশ্লেষণ বৃত্তিধারী হইয়া থাকি তো আমি মনুষ্যসন্তানও বটি। আর মনুষ্যসন্তান হিসাবে আমি অভিজ্ঞতা হইতে শিখিয়াছি যে আমার আপন মানব জীবনের প্রধান গুণ একটাই। আর তাহা হইল এই জীবন এমন এক জিনিস যাহাকে আমরা ফরাসি ভাষায় বলি 'বহিয়া যায়' (*à la dérive*)। আমি তো নিশ্চিত এখানে আপনারা যাঁহারা আছেন তাঁহাদের অভিজ্ঞতাও ইহাই। আর কেহ যদি ইহার সহিত একমত না হইয়া থাকেন আশা করি তিনি হাত উঠাইবেন। জীবন নদীর মতন বহিয়া যায়, কখনো বা এই তীর স্পর্শ করিল, কখনো বা করিল ওই তীর। কখনো এইখানটায় একটুখানি দাঁড়াইল কখনো ঐখানটায়, কিন্তু কেন করিল বা দাঁড়াইল তাহার মাথামুণ্ডুও বুঝিল না—কী ঘটিল তাহার মাথামুণ্ডু কিছু কেহই বুঝিল না। বিশ্লেষণের মূল সূত্র ইহাই।

মানব জীবনের 'একতাসাধক একভাব' আমার নিকট চিরকালই কলঙ্কজনক মিথ্যা কথা মাত্র মনে হইয়াছে।

এই সকল ব্যাপার কী জিনিস বুঝিয়া উঠিবার প্রয়োজন মিটাইতে হইলে আমরা আরো এক নীতির সাহায্য লইতে পারি। ঘটনা কী তাহা কদাচ অজ্ঞানের দিক হইতে আমরা যেই বিচার করিয়া দেখিতে চাহি না তাহারও কারণ আছে। কারণ অজ্ঞান যাহা বলে তাহা শব্দের মধ্যবর্তিতায় ফুটাইয়াই বলিয়া থাকে। আর ইহাদের মূলনীতি কী তাহার সন্ধান হয়তো আমরা লইতে পারি।

আমার প্রস্তাব, আসুন তো 'একভাব' ধারণাটি আমরা অন্যতর আলোক ফেলিয়া দেখি। 'একতাসাধক একভাব' নহে, দেখি এক, দুই, তিন প্রভৃতি গণনাসম্ভব 'একভাব' হিসাবে। পনের বছর ধরিয়া পড়াইবার পর আমি আমার ছাত্রছাত্রীদের বেশির বেশি পাঁচ পর্যন্ত গুণিয়া দেখিতে শিখাইয়াছি। এই পর্যন্ত গণনা বেশ কষ্টের কাজ (চার পর্যন্ত গণনা আরেকটু সোজা)। আর তাঁহারাও ঐ পর্যন্তই শিখিয়াছেন। তবে আজ রাত্রে আমাকে আপনাদের অনুমতি লইয়া দুইয়ের মধ্যেই আটক থাকিতে হইবে। এক্ষণে আমরা পূর্ণসংখ্যার কথা কহিতেছি আর পূর্ণসংখ্যার কথা কথাটা বড় সহজ বিষয় নহে। আমার বিশ্বাস এই সভায় সমবেতদের অনেকেরই ইহা জানা জিনিস। দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতে, শুদ্ধ দরকার কয়েকপ্রস্ত সেট (set) এবং একপ্রস্ত 'একের বিম্ব এক' (one to one correspondence) গণিবার নীতি। যেমন ধরা যাউক, এই ঘরে যতটা পিঁড়ি আছে ঠিক ততজন মানুষ বসিয়া আছেন—কথাটা সত্য। কিন্তু 'পূর্ণসংখ্যা' কিংবা যাহাকে বলি 'স্বাভাবিক সংখ্যা' তাহা হইতে হইলে পূর্বসংখ্যা-যোগে গঠিত কোন সংগ্রহের ডাক পড়িবেই। বলা নিষ্প্রয়োজন ইহা একাংশে হইলেও স্বাভাবিক (natural), তবে শুদ্ধ এই অর্থেই যে ইহা কী কারণে আছে তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। গণনা জিনিসটা 'অভিজ্ঞতানির্ভর সত্য' নহে আর শুদ্ধ অভিজ্ঞতাজাত তথ্য হইতে গণনাকর্মের সৃষ্টি হইয়াছে ইহা প্রমাণ করাও অসম্ভব। হিয়ুম সেই চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু ফ্রেগে (Frege) নিখুঁত পদ্ধতিতে প্রমাণ করিয়াছেন এই চেষ্টা অপরিপক্কতারই প্রমাণস্বরূপ। পূর্ণসংখ্যা মাত্রই একেকটা স্বনির্ভর একক। সমস্যার আসল ভিত্তি এই সত্যেই পাওয়া যাইবে। আমরা যদি এই সংখ্যাকেই একক ধরিয়া লই তো বেশ মজাই হয়। ধরা যাউক পুরুষ আর নারী—পিরিতির সহিত যোগ হইল 'একভাব'! কিন্তু কিছুক্ষণ যাইতেই সব শেষ। এই দুইজনের পর আর কেহ রহিল না। হয়তো একটি শিশু আসিল, কিন্তু ততক্ষণে আমরা অন্য স্তরে পৌঁছিয়া গিয়াছি। আর তিনের জন্ম দেওয়া সে তো এক স্বতন্ত্র অধ্যায়। আমরা যখন সংখ্যা বিষয়ে গণিতবিদের প্রস্তাবাদি পড়িয়া দেখিবার চেষ্টা করি তখন দেখিতে পাই সকল প্রস্তাবের গোড়ায় এক সূত্রঃ (নতুন সংখ্যা পাইতে হইলে) যে কোন পূর্ণসংখ্যার সহিত ১ সংখ্যাটি যোগ করিতে হইবে, '$n+1$' বা (n+১)। সংখ্যার জন্ম কী উপায়ে হয় তাহার চাবি এই 'যোগ এক' কথার মধ্যেই

আছে। আর আমি প্রস্তাব করিতেছি, এই 'যোগ করিয়া একভাব' করিবার পদ্ধতি— যাহার গুণে দুই তৈরি হয় তাহা— বাদ দিয়া আমরা দুই সংখ্যাটির সংখ্যাস্বরূপ অখিল (real) জন্ম কিভাবে হয় দেখিব।

এই দুইকে যাহার এখনো জন্মই হয় নাই এমন পহিলা পূর্ণসংখ্যা হইতে হইবে খোদ দুইয়ের আবির্ভাবের আগেভাগেই। ইহা সম্ভব হইতেছে কারণ আমরা দেখিয়াছি পহিলা 'এক' সংখ্যার আবির্ভাব মানিয়া লইবার ওয়াস্তে এক্ষণে 'দুই' আসিয়া বসিয়াছে। 'এক' সংখ্যার জায়গায় 'দুই' বসাইলেন আর ফলস্বরূপ দেখিলেন 'দুই' সংখ্যার জায়গায় 'তিন' আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই স্থলে আমরা যাহা দেখিলাম তাহার নাম আমি রাখিয়াছি দাগ (*mark*)। তাহা হইলে আমরা দেখিব কিছু জিনিস থাকিল যাহাতে যাহাতে দাগ দেওয়া হইয়াছে আর কিছু জিনিস থাকিল যাহাতে দাগ দেওয়া হয় নাই। পহিলা যে দাগ দেওয়া হইল তাহা হইতে আমরা ঘটনার জন্ম দেখিলাম। হুবহু এই পথেই ফ্রেগে সংখ্যার জন্মকাহিনী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেই শ্রেণীতে কোন অঙ্কুর (elements) নাই তাহাকেই পহিলা শ্রেণী কহে। এই ভাবে শূন্যের জায়গায় 'এক' আসিল আর তাহার পর একের জায়গাটি কী করিয়া দোসরা জায়গা বনিয়া গেল তাহা সহজেই বোঝা যাইতেছে। এই ক্রমে 'দুই', 'তিন' ও অন্যান্য সংখ্যার জায়গা বদল হইল। আমাদের হিসাব অনুসারে এই দুইয়ের সমস্যাই সহজ মানুষ সমস্যার রূপ বটে। আর দুইয়ের জন্ম হইয়াছে একের সহিত এক যোগে, একের অভাব পূর্ণ করিয়া নহে, বরং একের জন্ম দিবার খাতিরে একের পুনরাবৃত্তি ঘটাইয়া। ইহা সত্য হইলে আমরা মনোবিশ্লেষণের অভিজ্ঞতা হইতে যেই সত্য জানিতে পারিয়াছি তাহারই সমক্ষে হাজির হইলাম। 'অজ্ঞান মানুষ' এমনই চিজ যাহা নিজের আবর্তন ঘটাইবার দিকে ঝুঁকিয়াই থাকে, আর শুদ্ধ 'এক' আবর্তন হইলেই হইল, উহার জন্ম হইবে। যাহাই হউক এক দফা আবর্তন দেখিতে হইলে আমাদের দেখা দরকার পহিলা ঘটনার পুনরাবর্তন ঘটাইতে দোসরা ঘটনার যেই যেই গুণ না থাকিলেই নহে তাহা কী কী। আমরা যদি তাড়াহুড়া করিয়া জবাব দেই তো বলিব, দরকার দুই ঘটনার এক রকম হওয়া। যদি তাহাই হইত তবে দুইয়ের নিয়মটা হইত যমজেরই নিয়ম। যদি তাহাই সত্য হয় তো ত্রয়ীর কিংবা চতুরঙ্গের নিয়মই বা হইবে না কেন? আমাদের যুগে আমরা ছেলেমেয়েদের শিখাইতাম, ধরা যাউক, মাইকের সহিত অভিধান যোগ করা চলিবে না। তবে এই শিক্ষাটা একেবারেই আজগুবি শিক্ষা। কারণ মানুষ যদি মাইকের সহিত অভিধান কিংবা, লুইস ক্যারলের ভাষা মোতাবেক বলিলে, বাজার লগে বাঁধাকপি যোগ করিতে না পারিবে তো যোগ করিবার কিছুই তো থাকিবে না। যাহার দৌলতে এক বস্তুর সহিত অন্য বস্তুর প্রভেদটা হিসাবে না লইয়া যোগ সম্ভব হয় সেই অভিন্নতার বাস বস্তুতে নাই, আছে ঐ দাগে (বা মার্কায়)। এই দাগের কল্যাণেই প্রভেদটা যেন ঘষিয়া উঠাইয়া ফেলা হইয়াছে এমত অবস্থা হয়। পুনরাবর্তন হইবার সময় সহজ মানুষের, অজ্ঞান সহজ

মানুষের ঘটে যাহা ঘটে ইহা তাহারই চাবিকাঠি। কারণ আমরা জানি 'সহজ মানুষ' নিদারুণ অর্থময় কিছু একটার পুনরাবর্তন করে। উদাহরণ দিয়া বলিতে, এই যে বস্তুকে আমরা কখনো কখনো বিভীষিকা (trauma) কিংবা 'চরম পুলক' বলিয়া থাকি সেই অদৃশ্য বস্তুর মধ্যে 'সহজ মানুষ' হাজির থাকে। কী ঘটে সেই সঙ্কটে? যদি 'মাল'টা এই আকারে জগতে বিরাজ করে, এই একত্ববোধক লক্ষণটাই যদি হয় শেষ কথা, তবে অভিন্নতার লক্ষণ এই জায়গায় বিলক্ষণ আছে। এক্ষণে আমার মধ্যে যেই 'মাল' খুঁজিয়া বেড়ানো হইতেছে তাহা পাইতে হইলে পহিলা দাগটা ঘষিয়া উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। কেননা এই দাগটা তো ছিল আজকের ঘষামাজার ফলস্বরূপ। সকল ভেদ উঠাইয়া দেওনের নামই তো ছিল এইটা। আর এই লক্ষণ না হইত তো পহিলা 'মাল'ই হইয়া যাইত লাপাত্তা। আকারে যাহা অভিন্ন তাহার পুনরাবর্তনকেই যদি পুনরাবর্তনের সারকথা বলা হয় তো তেমন পুনরাবর্তন অসম্ভব, পুনরাবর্তনের রীতিহীনতার রহস্য এই স্থলেই। যাহাই হউক মানুষ এই পুনরাবর্তনেরই ফলস্বরূপ। কারণ ইহার ফলে সহজ মানুষের প্রথম ভিত্তিটাই হাওয়া হইয়া যাইতে, রদ হইতে বাধ্য হয়। ইহাই সেই কারণ যাহার বলে সহজ মানুষ মাত্রই—অবস্থানের গুণে—বিভক্ত ভাবস্বরূপ হাজির থাকে। আমি ক্লান্তিহীন বলিব এই লক্ষণ অভিনতারই লক্ষণ। তবে ইহার ফলে যাহা নিশ্চিত হইতেছে তাহা শুদ্ধ অভিন্নতারই ভিন্নতা। ইহা হইতেছে অভিন্নতা কি ভিন্নতার ফল আকারে নহে, হইতেছে বরং 'অভিন্নতারই ভিন্নতার' মধ্যবর্তিতায়। ইহা বুঝিতে পারা সহজ। যথা ফরাসি ভাষায় আমরা বলিয়া থাকি 'আমি আপনাদের নম্বর মারিলাম' (*Je vous numérote*)। আমি আপনাদের সবাইকে একটি একটি করিয়া নম্বর বাঁটিয়া দিলাম, আর ইহার ফলে একটি জিনিস নিশ্চিত হওয়া গেল আপনারা সকলেই আলাদা: তবে শুদ্ধ নম্বরের বিচারে। অন্য কোন দিকবিচারে নহে।

যাহা 'একই সঙ্গে' এক কিংবা 'দুখণ্ডে' বটে এমন কোন কিছুর মধ্যে এই লক্ষণটাই আছে তাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত আমরা সহজ বুদ্ধির কাছে কোন প্রস্তাব তুলিয়া ধরিতে পারি? নিচের রেখাচিত্রটির কথাই ভাবা যাউক, সুপরিচিত একটি ছবির আদলে আমি ইহার নাম রাখিয়াছি উল্টা আট: [বঙ্গভাষায় উল্টা চার—অনুবাদক]

দেখিতেই পাইতেছেন এই রেখাটিকে একই সঙ্গে এক রেখা বা দুই রেখা উভয়ই গণ্য করা যাইতে পারে। যে আদাস্থলে, যে গিরায় সহজ মানুষ গঠিত হয় ইহাকে সেই অকুস্থলেরই অপরিহার্য লিপি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। আমরা পহিলা পহিলা যতখানি ভাবিতে পারি ইহার হাত তাহা হইতে অনেক দূর বেশি যাইতে পারে, কারণ আমরা

এই ধরনের লিপি খোদাই করার মতন উপরিতলের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িতে পারি। আমরা হয়তো বুঝিতে পারিব নিখিল অর্থে ব্যবহার করা পুরানা প্রতীক—মণ্ডল (the sphere)—দিয়া এইখানে কাজ চলিবে না। কোন বৃষ (torus), ক্লাইনের বোতল (Klein bottle), আড়াআড়ি কাটা উপরিতল এই ভাবে কাটিয়া দেখানো যায়। এই বৈচিত্র্যের মূল্য আছে। কারণ ইহাতে মনে কিভাবে রোগ গঠিত হয় তাহার ব্যাখ্যা মিলিবে। এই গোড়াকার কাটাদাগের সাহায্যে যদি 'সহজ মানুষ' আকার পায়, তবে একই উপায়ে প্রমাণ করা যায় কোন বৃষ কাটিলে 'স্নায়ুরোগগ্রস্ত সহজ মানুষে'র (neurotic subject) আর 'আড়াআড়ি কাটা উপরিতল' (cross-cut surface) কাটিলে অন্য কোন মনোব্যাধির সহিত মিলিয়া যাইবে। আজ রাত্রে আপনাদের সমক্ষে আমি ইহার ব্যাখ্যা দিতেছি না, তবে এই দুরূহ বক্তৃতার সমাপ্তি টানিতে হইলে আমাকে নিচের সারসংক্ষেপটি পেশ করিতেই হইবে।

পূর্ণসংখ্যা ধারার গোড়ার দিকটাই শুদ্ধ আমি হিসাবে লইলাম, কারণ ইহা ভাষা ও অখিলের মাঝখানকার বিন্দু বটে। 'এক' এবং 'এক যোগ' ব্যাখ্যাচ্ছলে আমি যেই জাতের লক্ষণ কাজে লাগাইলাম ভাষাও সেই একই লক্ষণ যোগেই গঠিত হইয়াছে। পার্থক্যের মধ্যে ভাষার এই লক্ষণ আর একভাবাপন্ন লক্ষণ (unitary trait) ঠিক এক বস্তু নহে, কারণ আমাদের ভাষায় ভেদভিত্তিক অনেক লক্ষণের একত্র সমাবেশ আছে। কথাটা অন্যভাবে বলি তো বলা যায় ভাষা গড়া হইয়াছে এক দঙ্গল পদ—যেমন বা, তা, পা, ইতি আদি, ইতি আদি লইয়া। দঙ্গলটির সীমা আছে। সহজ মানুষের চলার পথ কাটিতে যাহা লাগে পদমাত্রই তাহা যোগাইতে পারে। আর পদে পদে সম্পর্কের বেলায় যাহা সামান্য সত্য, পূর্ণসংখ্যার চলার পথ তাহারই বিশেষ রূপ মাত্র, এই কথা সত্য হওয়ার সম্ভাবনাই সমুদয় বটে। আমি যাহাকে পরম বলিতেছি তাহা গঠিত হইয়াছে এই পদাবলি দিয়াই। ইহা তাহার সংজ্ঞা। ভাষার কারণে যেই ভেদটা সম্ভব হইয়াছে তাহা এই: পদ মাত্রই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিজের কাছ হইতে নিজে অভিন্ন নহে (পূর্ণসংখ্যার একভাবাপন্ন লক্ষণ ইহার বিপরীত)। ইহার বিশেষ কারণও এই যে অনেক পদের একত্র সমাবেশই ভাষা। আর এই সমাবেশে কোন পদ (signifier) নিজ পদার্থের (signified) 'পদ' হইতে পারে, আবার নাও হইতে পারে। এই সুপরিচিত সত্যটিই রাসেলের ধাঁধার মূল সূত্র। যেই সকল অক্ষর নিজ নিজ দঙ্গলের অংশ নহে তাহাদিগকে শরিক করিয়া নতুন কোন দঙ্গল গঠন করিলে আমরা যেই ধাঁধায় পড়িব তাহার পরিণতিতে, আমরা জানি, 'কথার সহিত কথার বিরোধ' (contradiction) তৈয়ার হয়। ইহার অর্থ, সহজ কথায়, শুদ্ধ বাক্যের নিখিলে এমন কিছু থাকিতে পারিবে না যাহাতে সকল কিছু রহিয়াছে। আর যেই ফাঁকের দৌলতে 'সহজ মানুষ' গঠিত হয় এই স্থলে আরো একবার তাহার দেখা মিলিতেছে। 'সহজ মানুষ' মানেই হইতেছে অখিলের মধ্যে খিল ঢুকাইয়া দেওয়া (introduction of a loss in reality)। অথচ ইহা হইতেই পারে না। কেননা

সংজ্ঞার গুণেই অখিল বলিতে বুঝায় 'যাহাতে খিল নাই' (যাহা যতদূর সম্ভব ততদূরই ভরাট বটে)। খিলের ধারণাটি সম্ভব হইয়াছে সেই লক্ষণের গুণে যাহা আমাদের সৃষ্ট অক্ষরের দৌলতে একপ্রস্ত অভাবের নির্ধারিত স্থান। এই যেমন a1, a2, a3 প্রভৃতি বৈ নহে। আর স্থান (space) মানে তো ফাঁকই। 'সহজ মানুষ' যখন অভাবের জায়গাটি দখল করেন, তখন শব্দের ভিতর খিল ঢুকিয়া যায়। আর ইহা সহজ মানুষের সংজ্ঞাও বটে।

$$X \notin X$$

তবে ইহা যদি লিখিবার আবশ্যক করে তো ইহার সংজ্ঞা বাঁধিতে হইবে ভাষার মণ্ডল-জোড়া বৃত্তের আওতায়। এই বৃত্তের নাম আমি রাখিয়াছি পরকীয়া (otherness)। এই জগতে যাহা কিছু ভাষাপদবাচ্য তাহার সবকিছুই এই পরকীয়ারই আলো। আর সেই কারণেই সহজ মানুষ সব সময়ই এই পদাবলি-বাধিনীর তলায় তলায় পলায়নপর চির অপসৃয়মান বস্তুস্বরূপ। কারণ পদের সংজ্ঞাই এমন: যাহা সহজ মানুষের হইয়া সহজ মানুষের সঙ্গে যায় না, যায় অন্য এক পদের সঙ্গে তাহাকেই পদ কহে। ফল এই দাঁড়ায় যে সহজ মানুষ উধাও হইয়া যায়। দুই প্রস্ত একভাবাপন্ন লক্ষণের ক্ষেত্রেও হুবহু একই ঘটনা ঘটে। আর এই সময় যাহাকে বলা হইতেছে অর্থ বা পদার্থ তাহার আবির্ভাব ঘটে দুই নম্বর পদটির আবডালে এবং ইহার পর এই ক্রম ধরিয়া আর আর পদ ও পদার্থের আবির্ভাব চলিতে থাকে।

হারাইয়া যাইতে যাইতেও 'সহজ মানুষ' কল্পনার ফানুস বলিয়া পরিচিত এই অত্যাশ্চর্য বস্তুর মুখামুখি কোন না কোন উপায়ে লিপ্ত থাকিয়া আরো একবার নিজেকে খোঁজার জন্য আকুল হয়। 'বিষয় বাসনা' (desire) ইহারই অপর নাম। যে বস্তু এই সাধনা জিয়াইয়া রাখে তাহার নাম আমি রাখিয়াছি হারানো সম্ভার (lost object)। ইহার নাম বিসমিল্লাতেই লইয়াছিলাম—নাম লইতেও কল্পনার হাত ভয়ে সিধাইয়া না যায়। আর ইহার জন্ম ও লালন-পালন এই স্থলেই ঘটে। আমার শব্দ তালিকায় ইহারই নাম হইয়াছে ছোট ছাদের *a* সম্ভার (object a)। ইহার কথা মনোবিশ্লেষণ বৃত্তিধারী মাত্রই ভাল করিয়া জানিবেন। কেননা মনোবিশ্লেষণ বিদ্যা আদ্যোপান্ত খাড়াও হইয়াছে এই নিদারুণ সম্ভারের কাঁধে ভর করিয়াই। আমাদের এই নিষেধাজ্ঞাধীন সহজ মানুষের সহিত এই *a* সম্ভারের সম্পর্ক-কাঠামো সব সময়ই ফানুসের তলায় থাকে আর এই ফানুস থাকে বাসনার তলায়। কারণ বাসনা আর কিছু নহে। শুদ্ধ যাহার নাম রাখিয়াছি সমস্ত অর্থের অনন্ত-নাম ইহা তাহারই অপর নাম।

এই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় মনোবিশ্লেষণ বৃত্তির অখিলে গঠন বলিয়া কোন জিনিস বিরাজ করিতেছে তাহা আপনাদিগকে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। তবে সাকার (imaginary) ও আকার (symbolic) প্রভৃতি দিক সম্পর্কে আমি কিছুই বলি নাই। মনের জীবন যেই জীবনের বা অভিজ্ঞতার জগৎ দিয়া পার হয় তাহার ভিতর

আকারের বন্ধন কিভাবে ঢুকিয়া পড়ে তাহা বুঝিয়া লওয়ার কোন বিকল্প নাই। এই কথা না বলিলেও চলিত। কিন্তু আজ রাত্রে আমার এই ব্যাখ্যা দেওনের উপায় নাই। তবে পুরানা বলিয়া জ্ঞাত এই 'সহজ মানুষ' সম্বন্ধে সবার তুলনায় কম জানা অথচ সবার তুলনায় বেশি নিশ্চিত একটি সত্য কথা ভাবিয়া দেখিবেন। জীবিত প্রাণীর জীবনপর্বের ইহাই অর্থপূর্ণ দিক। এই অন্তহীন জিনিসটা জীবন ও মরণের সীমানার মধ্যে কিছু একটার স্থান পাইতে সক্ষম। বিষাদ ও হর্ষের মধ্যখানকার পুরা বর্ণালিটা জুড়িয়া থাকিতেও ইহা সক্ষম। ইহাকে আমরা ফরাসি জবানে বলিয়া থাকি সহজানন্দ (*sujet de jouissance*)। আজ বিকালবেলা এই জায়গায় আসিবার পথে ছোট্ট নিয়ন বাতির বিজ্ঞাপনে দেখিলাম লেখা রহিয়াছে, 'Enjoy Coca-Cola' (অর্থাৎ কোকা-কোলার মজা মার)। ইহা দেখিয়া মনে পড়িল, যদ্দুর জানি, ফরাসি জুয়িসঁস (*jouissance* অর্থাৎ পুলক/আনন্দ) কিংবা ল্যাটিন ভাষার ফ্রুয়র (*frui*) শব্দে পদার্থের যেই বিশাল ভার বহন করা হয় তাহার যথার্থ প্রকাশক্ষম পদ ইংরেজি ভাষায় পাওয়া যাইতেছে না। জুয়ির (*jouir*) শব্দের অর্থ আমি অভিধান খুলিয়া দেখিয়াছি। দেখিয়াছি ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে 'to possess, to use' (অর্থাৎ দখলে লওয়ার, ভোগ-ব্যবহার করার) কিন্তু ইহার অর্থ আদৌ তাহা নহে। প্রাণধারী জীব যদি আদৌ ভাবিবার মতন কোন ভাব হইয়া থাকে, তো সব কিছু ছাড়াইয়া তাহার পরিচয় হইবে আনন্দের নন্দন (বা আনন্দের সহজ মানুষ)। তবে, দুঃখের মধ্যে, বেশিক্ষণ না যাইতেই দেখা যাইবে মনোবিশ্লেষণের যেই বিধির নাম হইয়াছে আনন্দসূত্র (যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে শুদ্ধ নিরানন্দসূত্র বৈ নহে) তাহা যাবৎ আনন্দের পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি এমত হয় যে মজা মারিতে মারিতে আমি একটু মাত্রা ছাড়াইয়া গেলাম, অমনি কথা শুরু হইয়া যায়, ফলে আমি আমার আনন্দ খানিক কমাইয়া আনি। জীবদেহ মনে হয় এমন ভাবেই বানানো হইয়াছে যেন তাহা অতি মাত্রার আনন্দ এড়াইয়া যায়। আমাদের দেহের গঠন যদি এহেন মজার জিনিস না হইত তো আমরা সকলেই হয়তো ঝিনুকের মতন নীরব হইয়া থাকিতাম, এই গঠনই আমাদের আনন্দপক্ষের আমল ভাঙ্গিতে বাধা কারে কিংবা আমাদিগকে শুদ্ধ এই আমলের উপর জোর করিবার আর ভাঙ্গিয়া ফেলিবার খোয়াব দেখাইয়া থাকে। পরমের সঙ্গে সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ পদের মাপকাঠি বরাবর সহজের গঠন হইতে ইহার বিস্তার ঘটে আর এই গঠনের গোড়া পোতা থাকে ভাষায়। শুদ্ধ ইহার কারণেই বাসনার পূর্ণ বৈচিত্র্য পাখা মেলিবার অবকাশ পায়। ফলে আমরা এই জাতীয় নিষিদ্ধ আনন্দের (*জুয়িসঁস*) কাছাকাছি যাইবার, যাচাই করিবার সুযোগ পাই। ইহাই আমাদের জীবনের একমাত্র অর্থ যাহার একলা মূল্য আছে।

আলোচনা

আঙ্গুস ফ্লেচার

ফ্রয়েড সত্য সত্য খুবই সরল মানুষ ছিলেন। তবে মানুষের নানান সমস্যার বিচিত্র সমাধান তিনি খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। মানুষের জটিলতা ও সমস্যার ব্যাখ্যা প্রদানের খাতিরে তিনি কখনো কখনো মিথ ব্যবহার করিয়াছেন: যথা, নার্সিসাস মিথ। উনি দেখিলেন কিছু কিছু মনুষ্য আছেন যাহারা আয়নায় আপন মুখ দেখেন আর নিজেরা নিজেদের সঙ্গে প্রেম করেন। ব্যাপারটা এমনই সহজ। তিনি শব্দের উপরিতলে উপরিতলে ভাসিবার চেষ্টা করেন নাই। আপনি যাহা করিতেছেন তাহা মাকড়সার মতন: আপনি ভারি মিহি যেই জালটা বানাইতেছেন তাহার সঙ্গে মানুষের কোন সত্য সম্পর্ক নাই। যেমন আপনি 'মজা'র [*joie; jouissance*] কথা বলিলেন। ফরাসি ভাষায় 'জুয়ির' (*jouir*) কথাটির এক অর্থ 'চরম পুলক'—ইহা বলিবেন না কেন? আমার মনে হয় ইহাই এইখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখানে যাহা কিছু শুনিলাম সবই এহেন কায়াহীন কথা...। সমস্যাটা এখানে মনোবিশ্লেষণের নহে।

মনোবিশ্লেষণের মূল্য এই স্থলে যে ইহা মনোবিশ্লেষণের গতি বিষয়ে প্রস্তাবনাস্বরূপ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইয়াছে পরে, বিশেষ বলিতে বিলহেলম রাইখের কাজ। এত সব অতিপদার্থবিদ্যার (metaphysics) কোনই দরকার নাই। আপনার চিত্রলেখটি (diagram) খুবই মজার হইয়াছে, তবে ইহার সহিত আমাদের কাজকর্মের, খাওয়া দাওয়া, রতি সহবাস ইতি আদির কোন সংযোগ আছে বলিয়া তো মনে হইতেছে না।

হ্যারি উল্ফ

আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাহি এই গোড়ালি পাটিগণিত (fundamental arithmetic) আর এই স্থানবিদ্যাও (topology) এক জাতীয় মিথ কি না, নাকি ইহা মানস-জীবন ব্যাখ্যার খাতিরে এক প্রকার তুলনার প্রস্তাব মাত্র?

জাক লাকাঁ

কিসের সহিত তুলনা? 'S' বলিতে এমন কিছু বোঝায় যাহা হুবহু এই S আকারে লেখা চলে। আমি বলিতেছি এই 'S'—যাহা দিয়া সহজ মানুষ বোঝানো হইতেছে তাহা—সাধিত ক্ষতি বোঝাইবার উপযোগী এক জাতীয় হাতিয়ার, তবে 'সহজ মানুষ' হিসাবে আমি (এবং আমি নিজেও) যাহা হারাইয়াছি ইহা তাহাও। অন্য কথায় বলিতে, একদিকে আছে এমন কিছু যাহার খচিত অর্থ আছে আর অন্যদিকে আছে আমার

ব্যবহৃত কথার ধারা যাহা দিয়া আমি আপনি যেখানে আছেন সেই স্থলে পৌঁছাইতে চাহিতেছি। এই দুইয়ের মধ্যে একখানা ফাঁক (না খিল) আছে। আপনাকে এখানে আরেকজন সহজ মানুষরূপে ধরি নাই, ধরিয়াছি আমার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিবেন এহেন মানুষ হিসাবে। উপমানটা কোথায়? এই ক্ষতিটা হয় হইয়াছে কিংবা হয় নাই। যদি হইয়া থাকে তবে তাহা বোঝাইতে হইবে একপ্রস্থ প্রতীক দিয়া। যাহাই হউক, প্রতীকায়ন না ঘটানো পর্যন্ত এই ক্ষতিটার অস্তিত্বই নাই। ইহা তো তুলনা নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা অখিল জগতের কোন না কোন ভাগে, এই ধরনের বৃত্তে আছে। এই বৃত্ত আসলেই আছে আর স্নায়ুরোগীর গঠন হুবহু এইটাই। ইহা উপমান নহে। এমনকি ইহা কায়াহীনও নহে, কারণ কায়াহীন মানে তো অখিল জগৎ হইতে কিছু না কিছু বিয়োগ করাও বুঝাইতেছে। আমার মনে হয় ইহাই খোদ অখিল।

নর্মান হলান্ড

আমি লাকাঁ সাহেবের পক্ষ লইয়া বলিতে চাই। আমার মনে হয় ও চাইছেন খুব ভাল একটা কিছু করিতে। আমি এই আলোচনা সভার আগেভাগেই তাঁহার প্রবন্ধ পড়িলাম। ইহার আগে আমি ওঁর কোন লেখা পড়ি নাই। মনে হইতেছে তিনি ফ্রয়েডের লেখা *বিজ্ঞানভিত্তিক মনোবিজ্ঞান প্রকল্প* (*Project for a Scientific Psychology*) বরাবর ফিরিয়া গিয়াছেন। মনোবিজ্ঞান বিষয়ে ইহাই ফ্রয়েডের পহিলা লেখা। ইহাও খুব কায়াহীন ছিল এবং আপনি এখানে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মতনই ছিল। অবশ্য আপনি বীজগণিতের সাহায্য লইতেছেন আর তিনি নিউটনের আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই রচনার প্রভাব *খাবনামা* (*The Interpretation of Dreams*), ফ্লিস সমীপে চিঠিপত্র (*Letters to Fliess*) সহ তাঁহার প্রথম বয়সের সমস্ত লেখার সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, যদিও সেই প্রভাব অনেক সময় নিতান্ত উহ্য রহিয়াছে।

এন্টনি ওয়াইল্ডেন

আমি কিছু কথা যোগ করিতে চাহিতেছি। আপনার বক্তৃতার গোড়ায় আপনি অস্বীকার বা অস্বীকৃতির [*méconnaissance*] ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আর আমরা ইহার এমন একপ্রস্থ চরম দৃষ্টান্ত হইতে শুরু করিয়াছি যে ইহা হইতে কী করিয়া বাহির হইব বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আপনি কিন্তু শুরু করিয়াছেন আপনার চিন্তার একেবারে মাথা হইতে (আপনার চিন্তার সবচেয়ে কঠিন জায়গা হইতে) আর ইহার গোড়াটা কী রকম ছিল তাহা খুঁজিয়া বাহির করা আমাদের পক্ষে সাংঘাতিক কঠিন। এই চিন্তা খুবই ধনশালী এবং খুবই গভীরে ইহার মূল। আমি আপনার লেখা কষ্ট করিয়া তর্জমা করিয়া থাকি, সেই অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি ফ্রয়েডের সহিত আপনি এক ফোঁটাও বেইমানি করেন নাই। আজ রাত্রে এই স্থলে আমরা অনেক আবোল তাবোল বকিব সন্দেহ নাই—তবে এহেন বকাবকির আগে আমাদের উচিত

আপনার লেখা ভাল করিয়া পড়িয়া দেখা। ইহার অন্যথা না করাই উত্তম। তাঁহারা আগে আপনার লেখা পড়িয়া দেখুন, তারপর ফ্রয়েড পড়ুন—সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ সমীপে এই মিনতি করি।

রিচার্ড শেচনার
শূন্যতা সম্বন্ধে আপনার চিন্তার সহিত হুসার্ল এবং সার্ত্রের লেখার সম্পর্ক কী?

লাঁকা
আপনি যেই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, সেই শূন্যতা সম্বন্ধে আমার মনে হয় না আমি বিশেষ কিছু বলিতে পারিব। হুসার্ল সম্পর্কেও পারিব না, সার্ত্র সম্পর্কেও না। সত্য সত্যই, আমার মনে হয় না আমি শূন্যতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিয়াছি। গড়াইয়া যাওয়া এবং ধরিতে কঠিন হওয়া, কখনো কোথাও না থাকা (আমি যখন ঐখানে খুঁজি তখন উহা এইখানে; আর আমি যখন এইখানে তখন উহা ঐখানে) মানে শূন্যতা নহে। আমার বক্তৃতাসভার (seminar) তালিকায় এই বৎসর আমি যেই বস্তুর নাম রাখিয়াছি 'উদ্ভট কল্পনার যুক্তি' (*La Logique du phantasme*) সেই বিষয়যোগের ঘোষণা দিব। মনে হইতেছে আমার চেষ্টার বেশির ভাগই নিয়োজিত হইবে নানান ধরনের খিল, নানান ধরনের খোয়া, নানান শূন্যতার সংজ্ঞা ঠিক করার পিছনে। এইগুলি একেকটা একেক জাতের, একটার সহিত অন্যটার কোনই মিল নাই। অনুপস্থিতির কথাই ধরুন না কেন। বানির অনুপস্থিতি, এই ধরনের অঙ্কুরের সহিত কিছু একটা যোগ করিতে হয় কিন্তু বানির অনুপস্থিতি অস্বীকার করিতে হইলে...। আমার ধারণা নিছক 'শূন্যতা' ধারণাটির অস্পষ্টতা এই প্রসঙ্গে কোন কাজে আসিবে না। আমার নিজেরই উধাও হইবার আগে আমাকে অনেক কিছু করিতে হইবে, তবে সব কিছুতেই আমার দেরি হইয়া যায়। অবশ্য করিবার মতন কাজটি আগাইয়া নেওয়াও কম কঠিন নহে। এক ধাপে এক একটা করিয়া আগাইবার দরকার আছে। এখন আমি এই নানান ধরনের অভাব (lack) লইয়া আলোচনা করিব।

[কট সাহেব ও ডা: লাঁকা দেওয়ালপটযোগে মোবিয়ুস ফিতার (Möbius strips) নানান বৈশিষ্ট্য লইয়া আলোচনা করিলেন।]

ইয়ান কট
একটা মজার জিনিস আছে এই স্থলে। হয়তো ইহা আপতিক। এই সকল ব্রত (motifs) অধিবাস্তববাদী (surrealist) ছবিতে দেখিতে পাই। ইহাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কি?

লাকাঁ
অন্যবস্তুবাদী ছবির সহিত মনে হয় কমসে কম আমার একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে।

পুলে
এই অবশের ধোঁয়াশা যাহার কারণে সহজের আবির্ভাব ঘটে আপনি কি ইহার সহিত সার্ত্রের চিন্তার অন্তর্গত নাস্তি [*le néant*] জিনিসটায় কোন প্রকার যোগ আছে মনে করেন? প্রুস্তের রচনার গোড়ার দিকে দেখা যায় ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগিয়া উঠিল, তাহার অবস্থার সহিত কি ইহার তুলনা দেওয়া যাইতে পারে? আমাদের মনে পড়ে স্বপ্ন দেখিতে লোকটি জাগিয়া উঠিল আর দেখিল কী যেন হারাইয়াছে। কী যেন নাই। বড় কথা সে নিজে নাই। ইহার সহিত কোন তুলনা কি চলে?

লাকাঁ
আমার ধারণা প্রুস্ত বহুবারই অজ্ঞানের কয়েক রকম অভিজ্ঞতার কাছাকাছি পৌঁছাইয়াছিলেন। প্রুস্তের লেখায় এমন অনেক পৃষ্ঠাব্যাপী বা কাছাকাছি বিস্তৃত অংশ পাওয়া যায় যাহা সহজেই আলাদা (*découper*) করা যাইবে। আমার মনে হয় আপনার ধারণাই সঠিক। প্রুস্ত প্রায় কাছাকাছি চলিয়া যান, তবে তিনি প্রস্তাব আকারে ইহার বিস্তার না ঘটাইয়া নিজের ব্যবসায়—মানে সাহিত্যে—ফিরিয়া আসেন। উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে কুমারী ভঁতুইয়ের। বয়ানকার যেই দৃষ্টিতে তাহাকে আপনকার বন্ধু ও বাবার ছবি হাতে দেখিয়াছেন তাহার কথা বলিতেছি। আমার মনে হয় না আর কোন সাহিত্যশিল্পী কখনো এহেন ছবি আঁকিয়াছেন। হইতে পারে ইহা হইয়াছে তাহার খোদ কর্ম-পরিকল্পনার, সময় পুনরুদ্ধারের এই আলিশান কর্মকাণ্ডের, স্বভাব অনুযায়ী। এই প্রকল্পই তাঁহাকে পথ দেখাইয়াছে, এমনকি জ্ঞান যদ্দূর পর্যন্ত যাইবার সাধ্য রাখে তাহার বাহিরেও দেখাইয়াছে।

সিগমুন্ড কখ্
আপনার বক্তৃতার একটা ধরন নিয়তই আমার দৃষ্টি এড়াইয়াছে। কারণ হয়তো আপনি ইংরেজিতেই বলিয়াছেন। ইহা ছাড়া আমি অন্য কোন কারণ দেখিতেছি না। আপনি পূর্ণসংখ্যা ২ লইয়া অনেক ভারি কথা কহিয়াছেন, বিশেষ পূর্ণসংখ্যা ২-এর জন্ম লইয়া। আমার যতখানি স্মরণ হয় আপনার বিশ্লেষণ হইতেছে এই যে আমরা এক নির্দেশক দাগ দিয়া শুরু করিলে দাগাঙ্কিত খাড়াইয়া যায়, ফলে আমরা ২-এর মুখোমুখি হই বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। দাগাঙ্কিত আর দাগানঙ্কিতের সহিত তুলনা দিবার জোড়া কোথায় পাইব? দাগাঙ্কিত মানে কি জ্ঞানতন্ত্র আর দাগানঙ্কিত মানে কি অজ্ঞানতন্ত্র? দাগাঙ্কিতই কি সজ্ঞান মানুষ আর দাগ-অনঙ্কিতই কি অজ্ঞান মানুষ?

লাকাঁ

ফ্রেগের লেখা হইতে আমি শুদ্ধ ধার করিয়াছি যে ০ সংখ্যাটি যেই শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যবাচক সংখ্যা সেই শ্রেণীই হইতেছে ১ সংখ্যার ভিত্তি। মনোবিশ্লেষণ সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গক্রমে আমি ২ সংখ্যাটি বাছিয়া লইয়াছি একটি কারণে, তাহা হইতেছে এই: এরোস (eros) বা রতির রূপরেখা আঁকিতে গিয়া ফ্রয়েড ২ সংখ্যার উপর বেশ গুরুভার আরোপ করিয়াছেন। জীবনের পরিসরে যেই শক্তি একতাসাধন করিয়া থাকে তাহার নামই রতিশক্তি, আর ইহাতে ভিত্তি করিয়া অনেকানেক মনোবিশ্লেষক যৌনাঙ্গের পাকা অবস্থা (genital maturity) বলিয়া একটা কথা বাহির করিয়াছেন। ইহার ভিত্তিতে তাঁহারা অনেক দাবি করিয়াছেন। যেমন, 'নিখুঁত বিবাহ' বলিয়া কোন জিনিস যেন সম্ভব। লক্ষ্য হিসাবে বিষয়টি রহস্যাবৃত আর সাংঘাতিক একগুঁয়েমির সহিত ইহার পক্ষে প্রচারণা চালানো হইয়া থাকে। যেই শ্রোতামণ্ডলির সহিত ফ্রেগে উত্থাপিত সমস্যাটির পরিচয় ঘটে নাই শুদ্ধ তাঁহাদের কথা মাথায় লইয়া আমি, পহিলা দফায়, এই ২ সংখ্যাটি বাছিয়া লইয়াছি। ১ সংখ্যার মোকাবেলায় ০ সংখ্যা, এই পহিলা পরিচয় পর্বে, যেই কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারিবে ২ সংখ্যার মোকাবেলায় ১ সংখ্যাটিও সেই কর্তব্য করিতে পারিবে।

আপনার দুই নম্বর সওয়াল প্রসঙ্গে বলিতেছি। ফ্রয়েডের লেখার সহিত যাঁহাদের নিখুঁত পরিচয় রহিয়াছে তাঁহারা জানেন এমন অনেক খুঁটিনাটি বিষয় আমি স্বভাবগত নিয়মেই উহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। দাবাইয়া রাখা (repression) প্রসঙ্গে এই কথাটি একদমই ভুলিয়া থাকা চলিবে না যে ফ্রয়েড বলিয়াছেন দাবাইয়া রাখার রহস্য যাহার উপর দাঁড়াইয়া থাকে তাহাকে জর্মান ভাষায় বলে উয়রফেরড্রাংগুঙ্গ (*Urverdrängung*) বা আদ্যদমন। আমি আজ আমার প্রস্তাবের পুরাটাই এইখানে সূত্রমাফিক পেশ করিতে পারি নাই, ইহা স্বভাবগত কারণেই ঘটিয়াছে। সূত্রবদ্ধ করা, ফ্রয়েড ঘরানার ভাষায় যাহাকে ঘনায়ন (*condensation*) বলে তাহা, বোঝাইতে হইলে রূপকের উপর গোড়াতেই নির্ভর করিতে হয়, ইহা জানা না থাকিলে কিন্তু একদমই চলিতেছে না। [ডা. লাকাঁ কাল বোর্ডে 'অক্ষরের নাছোড়বান্দামি' (L'Instance de la lettre) বিষয়ের সার দেখাইয়া তাঁহার মন্তব্য শেষ করিলেন।]

গোল্ডমান

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে আমি যেই উপায়ে কাজ কারবার চালাইতেছি তাহার কারণে একটা জিনিস আমার দৃষ্টিতে লাগে। ইহা আর কিছুই নহে—গুরুত্বপূর্ণ, ইতিহাসভিত্তিক, দশজনীন ঘটনাধারা আর গুরুত্বপূর্ণ রচনাকর্ম লইয়া বিচার-বিশ্লেষণ করিতে আমার বিশ্লেষণকর্মে আমি কখনো অজ্ঞান ধারণাটির প্রয়োজন অনুভব করি না।

তথাপি আমি এই ভেদটা দেখাইয়া বলিয়াছিলাম: অবশ্য আমার প্রয়োজন হয় জ্ঞানহীন ধারণার। অজ্ঞান অঙ্কুর ইতি আদি তো আছেই; কী কী উপায়যোগে ব্যক্তি

নিজের হিসাব পেশ করিতেছে আমি তো তাহা বুঝিতে পারি না—আর, আমি তো বলিয়াছি, ইহা মনোবিশ্লেষণের এলাকা, যাহার সহিত আমি মিশিতে চাহি না। কিন্তু দুই ধরনের ঘটনা আছে যাহা, সব ধরনের সাক্ষ্যপ্রমাণ অনুসারেই, সামাজিক বলিয়া মনে হয়। আর এই সকল ঘটনা বুঝিতে হইলে আমাকে অজ্ঞান নহে জ্ঞানহীনের সাহায্য লইতে হয়। আমার মনে হইতেছে আপনি বলিয়াছেন অজ্ঞান দশজনের ভাষা ইংরেজি ফরাসি প্রভৃতি যেই সকল ভাষায় আমরা কহিয়া থাকি সেই রকমের ভাষা।

লাকাঁ
আমি বলিয়াছি ভাষার, ইংরেজি বা ফরাসি ইতি আদির, মতন।

গোল্ডমান
কিন্তু ইহা কি এই ভাষা হইতে স্বতন্ত্র? তাহা হইলে তো আমি থামিব: আমার আর কোন প্রশ্ন রহিল না। সজ্ঞান আমরা যেই ভাষায় কথা কহিয়া থাকি এই জিনিস তাহার সহিত যুক্ত।

লাকাঁ
জি, হাঁ।

গোল্ডমান
ঠিক আছে। আমি যদি আপনার কথা ঠিকমতন বুঝিয়া থাকি, দোসরা যেই জিনিসটা আমার মনে দাগ কাটিয়াছে, সজ্ঞান মানে যেই স্তরে অজ্ঞান ধারণাটির সাহায্য ছাড়াই আমার চলিয়া যায় সেই স্তরে কয়েকটা প্রক্রিয়ার সহিত তুলনা দিবার মতন কিছু কিছু জিনিস পাওয়া যায়। পাসকাল, হেগেল, মার্কস ও সার্ত্র হইতে শুরু করিয়া বলিতে এমন কিছু জিনিস আমরা জানি যাহা অজ্ঞানের তোয়াক্কা করে না: প্রভেদের সঙ্গে এই ধ্রুবগুলি যোগ করিয়া মানুষ কী তাহার সংজ্ঞা দেওয়া চলে। পাসকাল বলিয়াছেন: 'মানুষ সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া গিয়া' কিছু করে না (dépasse l'homme)। অজ্ঞানের দোহাই না দিয়াও বলা চলে, এই ফাঁকটুকুর সাহায্য ছাড়া ইতিহাস কিংবা গতিবিদ্যার সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। সজ্ঞান মনের স্তরে আমি যেই দোসরা ঘটনার দেখা পাই: সজ্ঞান মন যতখানি কর্মকাণ্ডের সহিত সংযুক্ত ততখানি বলিতে—কী জিনিস তাহা মনে তাহার অঙ্গীভূত ধ্রুবের, মানে অসাড় দ্রব্যের, সাহায্য ছাড়া এবং এই ধ্রুবসকলের সহিত প্রভেদের সংযোগ না ঘটাইয়া বলা যাইবে না। পূর্বনির্ধারিত ঘটনা একাধিক হইলে তৎক্ষণাৎই কর্মকাণ্ড শুরু করা যায় না। ধ্রুববস্তুর অঙ্গসংস্থানের সহিত কর্মের ঘনিষ্ঠ সংযোগ। ইহার কারণেই প্রভেদের মধ্যে বিশেষ বিন্যাস সম্ভব

হয়। এই বিশেষ মানুষ জন্ম লইবার আগে হইতেই ভাষা জন্ম লইয়া বসিয়া আছে—এই ভাষা (ইংরেজি, ফরাসি ইতি আদি) কি শুদ্ধ এর অতিশয়পনা (phantasm) সমস্যার সহিতই যুক্ত? এই সম্বল (symbol), ভাষা, আর এই অসাড় দ্রব্য ছাড়া কোন সহজ মানুষ হইতে পারে না। আমার প্রশ্ন হইতেছে: এই সম্বলবাদ (symbolism) আর তাহার নানান ফেরফের কি মাত্র এই অতিশয়পনা, এই অজ্ঞান আর বাসনারই আত্মীয়, নাকি ইহার সহিত কাজ নামে পরিচিত কোন কিছুর বাহিরে দুনিয়ার রূপান্তর এবং সমাজ জীবনেরও আত্মীয়তা আছে? আর আপনি যদি এইগুলির সহিত আত্মীয়তার কথা মানিয়াও লন তো একটি সমস্যা মাথাচাড়া দিয়া ওঠে: যুক্তিটা কোথায়, বুঝিবার উপায়টা কই? মানুষ মানে কেবল সবটাকে এক করিবার আশা, আমি ইহা প্রত্যয় করি না। আমি সেইদিনও বলিয়াছি আমরা এখনো একটা বিশাল অবস্থার মুখামুখি হইতেছি। তবে বিশালটি বুঝিতে হইলে ইহার অংশ অংশ আলাদা করিতে হইবে, নহিলে চলিবে না।

লাকাঁ
আর আপনি কি মনে করেন এই স্রোতে আঁকড়াইয়া ধরিবার মতন 'নোঙর ঘাট' (mooring-points) যাহা পাওয়া যায় তাহার মধ্যে এই কাজটাও পড়িতেছে?

গোল্ডমান
আমি মনে করি সমস্ত হিসাব নিকাশ শেষেও বলিতে হইবে মনুষ্যজাতি কিছু ভারি কাজের মতন কাজ করিয়াছে।

লাকাঁ
ইতিহাসের বইপুস্তক যে খুব একটা নিয়ম মানিয়া চলার মাল আমার তাহা মনে হয় না। এই বিখ্যাত ইতিহাস, কোন ঘটনা অতীত হইয়া গেলে যাহাতে সকলেই সবকিছু খুবই ভাল করিয়া দেখিতে পায়, তাহা এমন কোন বাগদেবী নহে যাহার ঘরে আমার পূর্ণ আস্থা রাখিতে পারি। এমন এক জমানা ছিল যখন—এই যেমন বসুয়ে (Bossuet) যেই যুগে লিখিতেছেন সেই যুগে—ক্লিও (Clio) খুব বড় গুরুত্বের দাবিদার লোক ছিলেন। হয়তো আবার মার্কসের যুগেও তাহাই। তবে ইতিহাসের ঘরে আমি শুদ্ধ *বিস্ময়* পাইতে চাই। এই মত বিশ্বাসের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টায় আমি সফল হই নাই, যদিও আমি প্রচুর চেষ্টা করিয়াছি। আপনি যেই সকল স্থানাঙ্ক দিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন আমি সেইগুলির সাহায্যে নহে, অন্য স্থানাঙ্কের সাহায্যে ব্যাখ্যা করি। বিশেষ বলিতে, কাজের সমস্যাটিকে এই স্থলে আমি সম্মুখের সারিতে বসাইব না।

শার্ল মোরাজে

আজিকার আলোচনায় সংখ্যার জন্য কী করিয়া হয় তাহার ব্যবহার দেখিয়া আমি প্রীত হইয়াছি। গোল্ডমান সাহেবের উত্তর দিতে গিয়া বলিব, আমি যখন ইতিহাস পড়ি তখন আমি ভরসা রাখি এই একই সংখ্যার জন্মের উপর, মনে করি ইহারাই সবচেয়ে নিরেট অখিল জগৎ। ইহার মুখামুখি অবস্থায় দাঁড়াইয়া আমি একটা প্রশ্ন করিতে চাহিতেছি, উদ্দেশ্য আমরা যাহা যাহা সত্য বলিয়া অনুমান করিয়া লইতেছি তাহা আসলেই এক না ভিন্ন তাহা পরখ করিয়া দেখা। আমার মনে হয় বক্তৃতার শুরুতে আপনি কহিয়াছেন যে আপনার কাছে সজ্ঞান মনের গঠন ভাষার মতন, আবার শেষদিকে আপনি কহিলেন, অজ্ঞান মন ভাষার আকারে গঠিত। আপনার এই দ্বিতীয় প্রস্তাবখানি যদি সঠিক হইয়া থাকে, তবে আমার বক্তব্যও তাহাই।

লাকাঁ

অজ্ঞান মনই ভাষা-আকারে গঠিত—এই বক্তব্যের হেরফের আমি কখনোই করি নাই।

রিচার্ড ম্যাকসি

এই অধিবেশন বাবদ যেই পরিমাণ ভুল বোঝাবুঝি (*misconsciousness*) আমাদের ভাগ্যে বরাদ্দ ছিল, হইতে পারে তাহার সবটুকুই আমরা ইহার ভিতর খরচ করিয়া ফেলিয়াছি। তাহার পরও আপনি ফ্রেগে আর রাসেলের যেই দোহাই দিলেন তাহার প্রভাব আপনার ভাববাদে (ontology) বা নিদেনপক্ষে আপনার ভাবজগতে কেমন পড়িয়াছে তাহা লইয়া আমার এখনো একটু ঘোর থাকিয়া গেল। উদাহরণ দিতেছি, আপনি গণিত হইতে যেই উদাহরণ দিলেন তাহার একটা অর্থ হইতে পারে আপনি অখিল জগৎবাদ প্রস্তাবের চরম ভাষ্যে বিশ্বাস করেন। আমার প্রশ্ন এই স্থলেই। সম্পূর্ণ বর্ণনা অসম্ভব হইলে অখিল জগৎ ধ্বসিয়া পড়িবে এই যুক্তি আমাকে বিচলিত করে না। কারণ গোয়ডেল (Gödel) নিজেই বলিয়াছেন তিনি অখিল জগৎবাদে আস্থা রাখেন। তিনি মনে করেন এই উপপাদ্যের অর্থ আর কিছুই নহে, শুদ্ধ এই যে সঙ্কলবাদের প্রকাশক্ষমতার গোড়াতেই একটা সীমা আছে। আমি মনে করি যুক্তিওয়ালা প্রস্তাবটাই বরং গুরুতর প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়াছে। *প্রিন্সিপিয়া* গ্রন্থের লেখকগণ যদি কয়েকটি সেটের বিশেষ সেট বলিয়া স্বাভাবিক সংখ্যার প্রচার করিয়া থাকেন তবে আমরা পাল্টা বলিতে পারি—প্রসারতত্ত্বে যেই সকল ভাষাপারের ভাষাসংশ্লিষ্ট (metalanguage) গণ্ডগোল বাধে তাহার কথা ছাড়িয়াও বলা যায়—তাহাদের সিদ্ধান্তটা মনগড়া। কারণ সেটতত্ত্বে—মানে যেই সেটতত্ত্ব প্রকারতত্ত্বের ভিতে দাঁড়াইয়া নাই তাহাতে—উদাহরণস্বরূপ যে সেটের একমাত্র সংখ্যা খিল সেট (null set), ইতি আদি ক্রমে তাহাকেই 'এক' সংখ্যার সংজ্ঞা বলিয়া ধরা যাইতে

পারে। ইহার বলেই স্বাভাবিক সংখ্যার প্রচলিত ধর্ম অক্ষুণ্ন থাকে। সুতরাং আমরা সওয়াল করিতে পারি কোন সেটে এক সংখ্যা হয়? কয়েক মাস আগে পল বেনাসেরাফ এই ধারার যুক্তিকে আরো টানিয়া নিয়াছিলেন। তিনি দাবি করিয়াছিলেন স্বাভাবিক সংখ্যার অনপনেয় ধর্ম আর কিছুই নহে, শুদ্ধ এই যে এই সংখ্যায় পুনরাবৃত্তিভিত্তিক প্রগমন ঘটে। সুতরাং হয় এই নিয়মতন্ত্র না হয় ঐ নিয়মতন্ত্র যাহাতে এই প্রগমন সম্ভব তাহাতেই কাজ চলিবে। এই নিয়মতন্ত্রের ধর্ম মিলিতেছে বিশেষ সংখ্যার দাগে নহে, বরং আত্মীয়পরম্পরাভক্ত, নিকায়া গঠনে (অঙ্গীভূত অসাড় দ্রব্যে নহে)। অখিল-জগৎবাদী (realist) প্রস্তাবমাত্রই যাহা দাবি করে সেই প্রস্তাব অর্থাৎ সংখ্যা ও ভাব বা অবশ দ্রব্য মাত্রই সমান (আর এক জাতীয় ধারণাপন্থী বা নামকা ওয়াস্তে গঠনতন্ত্রের পক্ষে যুক্তি দেখায়) কথাটি এই হামলার মুখে পড়িতেছে।

লাকাঁ

এই মন্তব্য লইয়া কথা বাড়াইব না। শুদ্ধ বলিব এই: ধারণা এবং এমনকি সেটও বস্তু নহে। সংখ্যাতন্ত্রের (number system) গঠন নাই এহেন কথা আমি কদাচ বলি নাই।

....

তর্জমা
সলিমুল্লাহ খান
সেপ্টেম্বর ২০০৭–জানুয়ারি ২০০৮

উৎস
http://arts.bdnews24.com
জাতীয় সাহিত্য ॥ ঢাকা ২০০৮

ফ্রয়েড ও লাকাঁ

৩

তত্ত্বজ্ঞান ও মতিবিভাজন

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীমতী শোশানা ফেলমান এক সময় এয়ুরোপের কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতেন। গল্পটা তাঁর। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন অতি উঁচুদরের অধ্যাপকের মুখে তিনি প্রথম শোনেন জাক লাকাঁর নাম। একজনে আবেগভরা ভক্তিতে গদগদ। আরজন অবজ্ঞা-মেশানো তাচ্ছিল্যের সঙ্গে লাকাঁর নাম নিচ্ছেন। দোসরা জন নিষেধ করছেন লাকাঁ পড়তে। বিষয় শুদ্ধ দুই গুরুর মতপার্থক্য নয়। কোন এক লেখকের লেখা সম্পর্কে অজ্ঞান থাকাই শ্রেয় — গুরুর এহেন উপদেশ পাওয়ার ঘটনাও শ্রীমতী ফেলমানের চিত্তে প্রভাব ফেলে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, বইটি কিনবেন। বলা বাহুল্য নয় বিতর্কিত লেখকের বয়স তখন ৬৬ বছর। ঐ পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত বই একটিই। বইয়ের নামও সামান্য: *লেখা (Écrits)*।

ভদ্রমহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকবিক্রয় কেন্দ্রে গেলেন। বইটি হাতে নিয়ে ক্যাশিয়ার সমীপে পেশ করলেন। ক্যাশিয়ার ওরফে দোকান মালিক উপদেশ দিলেন, 'বইটা কিনবেন না।' ফেলমান একটু অবাক হওয়ায় ভদ্রলোক বললেন: 'বই বেচা আমার পেশা হলেও সদুপদেশ প্রদানও আমার আরেক ব্যবসায় বটে। এই বই কিনবেন না। কারণ দাম বেশি, তদুপরি বইটা পড়াও যায় না। সবচেয়ে বড় কথা এর বিন্দুবিসর্গ বোঝা বাপেরও সাধ্য নয়।' মহাশয়ের সদুক্তি-কর্ণামৃত অগ্রাহ্য করে শোশানা ফেলমান বইটি কিনেছিলেন। ফরাসি ঔপন্যাসিক স্তাঁদাল বিষয়ে অভিসন্দর্ভ রচনায় শ্রীমতী ফেলমান জাক লাকাঁর সেই দুর্বোধ্য বই থেকে প্রচুর সাহায্য পান। শুদ্ধ তাই নয়, তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটনা হয়ে ওঠে ঐ বইয়ের সঙ্গে পরিচয়। (ফেলমান ১৯৭১: ফেলমান ১৯৮৭)

জাক লাকাঁর *লেখা* প্রকাশ পায় ১৯৬৬ সালের ১৫ নভেম্বর। প্রকাশের দুই সপ্তাহ না কাটতেই পত্রপত্রিকায় কোন রিভিউ প্রচারের আগেই বইয়ের কাটতি পাঁচ হাজার

ছাড়িয়ে যায়। বইয়ের অখণ্ড সংস্করণ বিক্রি হয় ৫০,০০০ কপিরও বেশি। কাগজের মলাটে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয় অন্য সংস্করণ। পয়লা খণ্ডের বিক্রি এই জাতীয় কঠিন বই বিক্রির সকল পূর্ব ধারণা ছাড়িয়ে যায়। বিক্রয়সংখ্যা দাঁড়ায় ১,২০,০০০-এর বেশি। দ্বিতীয় খণ্ডের বিক্রিও ৫৫,০০০ অতিক্রম করে। (রুদিনেস্কো ১৯৯৭: ৩২৮) এই সব কথা লিখলাম একটি মাত্র কারণে। তারপরও কিনা লোকে বলে লাকাঁর লেখা কঠিন, বোঝা বাপেরও অসাধ্য!

বাংলায় লাকাঁর *লেখা* সম্ভবত এখনো তর্জমা হয় নাই। লেখা মানে শুদ্ধ এই নামের বইয়ের কথা বলছি। এছাড়াও তাঁর অন্যান্য লেখা আছে। লেখা মানে 'বলা'। ১৯৫৩ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত তিনি ফি বছর এক এক বিষয় ধরে বক্তৃতা করতেন। সেই সব বক্তৃতা এখনো সম্পাদনা করে প্রকাশ করছেন লেখকের ছাত্র এবং আত্মীয়-স্বজনরা। ১৯৬৬ সালের *লেখা* বইটিতে ৩৫টি প্রবন্ধ আছে। সেখান থেকে ৯টি বেছে একটি ইংরেজি সঙ্কলন প্রকাশ পায় ১৯৭৭ সালে।

গত বছর মাত্র সব প্রবন্ধ প্রথমবারের মতন ইংরেজিতে বেরুল। (লাকাঁ ২০০৬) এইবারের অনুবাদক ব্রুস ফিংক লাকাঁর সরাসরি ছাত্র জাক-আলাঁ মিলারের ছাত্র। ফরাসি মূল সংস্করণের শেষে লাকাঁর উদ্ভাবিত সকল নতুন ধারণার একটি সংক্ষিপ্তসার ও নির্দেশিকা জুড়ে দিয়েছিলেন মিলার। সেই জিনিস ইংরেজি সংস্করণেও রক্ষা পেয়েছে। আমি মিলিয়ে দেখেছি ইংরেজি সংস্করণটি মূল ফরাসির চেয়েও স্থানে স্থানে বেহতর। লাকাঁর অভ্যাস ছিল বড় বড় লেখকের উক্তি নির্দেশ ছাড়াই ব্যবহার করা। ইংরেজি অনুবাদক সেই সব সূত্র গবেষণা করে জাহির করেছেন। এই জন্যই বলছিলাম: অন্যান্য কারণের মধ্যে ইংরেজি তর্জমা আরো ভাল হয়েছে এই বাবদও। (লাকাঁ ১৯৬৬; লাকাঁ ২০০৬) উদাহরণ, প্রথম প্রবন্ধের মাথায় কবি গ্যেটের *ফাউস্ট* থেকে উদ্ধৃতির হদিস।

জাক লাকাঁর (১৯০১–১৯৮১) প্রথম বিদ্যা সাধারণ ডাক্তারির। তিনি পরে মতিরোগবিদ্যা (psychiatry) পড়েন। ১৯৩২ সালে তাঁর অভিসন্দর্ভ লেখা শেষ হয়। বিষয় ছিল সর্বভীতি (paranoia)।

১৯৩৬ সালে তিনি মতিবিভাজন (psycho-analysis) আন্দোলনে যুক্ত হন। তিনি একাধারে ডাক্তার বা বিভাজন বিশেষজ্ঞ আবার অন্যাধারে প্রশিক্ষক অধ্যাপক হিসাবে ব্যস্ত থাকতেন। ১৯৬৬ সালের অনেক আগেই মতিবিভাজন বিশারদ জাক লাকাঁর নাম এয়ুরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ফ্রয়েড প্রতিষ্ঠিত সংগঠন 'আন্তর্জাতিক মতিবিভাজন সমিতি' (International Psycho-Analytic Association) থেকে তিনি দু-দুবার তিরস্কৃত ও বহিষ্কৃত হন। যথাক্রমে ১৯৫৩ ও ১৯৬৩ সালে। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৪ সালে তিনি নিজের দোকান খোলেন একোল ফ্রয়েদিয়েন দো পারি (*École Freudienne de Paris*) নামে। সেই প্রতিষ্ঠান ১৯৮০ পর্যন্ত বহাল ছিল। তাঁর ছাত্ররা এরপর নানান দলে ভাগ হয়ে গেলে তিনি একদলের সঙ্গে যুক্ত হন এদের

প্রতিষ্ঠানের নাম একোল দো লা কজ ফ্রয়েদিয়েন (*École de la cause freudienne*)। জাক লাকাঁ এন্তেকাল করেন ১৯৮১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর।

মতিবিভাজন আন্দোলনে যোগ দেওয়ার বছর জাক লাকাঁ যেই প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন—একটি বিশেষ প্রবন্ধের কথা ছেড়ে দিলে—সেটা দিয়েই বর্তমান বইয়ের শুরু। লাকাঁর আওয়াজ ছিল: 'ফ্রয়েডে ফিরিয়া চল'। মানে লাকাঁ টের পেয়েছিলেন ফ্রয়েডের ওয়ারিশগণ তাঁর মূল আবিষ্কারের তাৎপর্য হয় ধরতে পারেন নাই, নয় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। এই কথা ১৯৫৩ সালের। কিন্তু ১৯৩৬ সালেই সেই লক্ষণ বিলক্ষণ ফুটে উঠেছিল।

১৯৩৬ সালে উপস্থাপিত (কিন্তু মাত্র ১৯৪৯ সালে সমাপ্ত) এক ছোট প্রবন্ধে লাকাঁ দেখিয়েছেন ফ্রয়েডের আবিষ্কৃত 'অজ্ঞান' ধারণার তাৎপর্য শুদ্ধ মতিবিভাজন শাস্ত্রে নয়, পশ্চিমা তত্ত্বজ্ঞানের (philosophy) গোড়াতেও বিপ্লবের সূচনা করেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসি তত্ত্বজ্ঞানী দেকার্ত মানব-সন্তানের চিন্তা বা ভাবনাকেই তার আত্মতা (আমিত্ব) বা ভাবের প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন। লাকাঁ এই প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন। লাকাঁর বিচারে মানবশিশু প্রথমে 'আমি' বলতে শেখে আয়নায় প্রতিফলিত আপন রূপ দেখে। এই আয়না জিনিসটা আক্ষরিক অর্থের আয়নাও হতে পারে, আবার আরেক মানুষও হতে পারে। শিশুর সাক্ষাৎ মা-ই প্রথম আয়না। তবে কথা থাকে: আয়নায় দেখা ছবি যেমন উল্টা, শিশুরাও তেমনি উল্টাই বোঝে। এই উল্টাবুঝ দিয়েই 'আমি'র শুরু। শেষ পর্যন্ত সমাজ জীবনেও মনুষ পরের চোখেই নিজেকে দেখে, আর অপরের মধ্যে নিজেকে খোঁজে। বাংলায় আমরা কি অবলীলায় না 'পরি' কথাটি ব্যবহার করি! পরি মানে জ্বিনভূত নয়। 'পরনারী' কথাই এই পদে ঘনীভূত হয়েছে মাত্র। লাকাঁ কেন কঠিন এইস্থলে তার ইঙ্গিতমাত্র নিবেদন করি।

তিনি বললেন: 'আমি ভাবি, তাই আমার ভাব বটে'—দেকার্তের এই প্রস্তাব ভুয়া। প্রকৃত প্রস্তাব হওয়া উচিত: 'আমি যা ভাবি আমি সেই ভাব নই', অথবা 'আমি যা ভাবি না, আমি তাই বটি।'

এয়ুরোপে দোসরা মহাযুদ্ধ খতম হবার পর 'অস্তিত্ববাদ' নামে যে তত্ত্বজ্ঞানের পসার হয়, লাকাঁর আবিষ্কার তার ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত হানে। অপরদিকে সমাজ জীবনে যাকে আমরা বলি ভাবাদর্শ—পরের মুখে শেখা যে বুলি আমরা নটের মতন বলি—সেই বুলির তলায়ও এই উল্টা আমি বা আয়নার 'আমি'রই জয়জয়কার। লুই আলথুসার প্রমুখ তত্ত্বজ্ঞানী এখান থেকেই চিন্তার আগুন জোগাড় করেছিলেন।

ফ্রয়েডের আবিষ্কার থেকে লাকাঁ সিদ্ধান্ত করেছেন 'অজ্ঞান' আসলে আয়নার ভিতরের ছবিতে নাই। আছে তার পিছনের আপে বা বাঁধাইয়ে। মানব সমাজে এর নামই ভাষা। আয়না থেকে মুখ ফিরিয়েই শিশু দেখে তার একটা নাম দেওয়া হয়েছে। এই নাম আসে কোথা থেকে? ভাষা থেকে। শিশু নামের সঙ্গে যাকে বলে 'একাত্ম' হয়। সেই নামেই পরিচয় হয় তার।

কিন্তু একটু সংযত হয়ে ভাবুন। দেখবেন এই একাত্মতা একাত্মতাই, আত্মতা নয়। এই নামের মধ্যে—পদের মধ্যে—শিশুটি নাই, কিন্তু এই নাম ছাড়াও শিশুর পরিচয় হবে না। পরিচয় না থাকা মানে না থাকাই। এই নামবরণকেই জাক লাকাঁ নাম দিয়েছেন পরসঙ্গ (alienation)। পরসঙ্গ মানে নতুন কিছু লাভ, কিন্তু আপন কিছু হারানোও বটে। সেই হারানো কিছুর নামই 'পরি'। লাকাঁর ফরাসি জবানের বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় অবশ অখ্যাতরাশি (*l'objet petit a*)। পরসঙ্গ ছাড়া মানবশিশু সভ্যতায় শরিক বা সামিল হবে না। পরসঙ্গ বা ভাষার মধ্যে বান্দা বা সহজ (subject) আকার লাভ করে। বান্দা যার কাছে সমর্পিত হয় তার নাম ভাষা বা প্রভু। প্রভু বা পরই শেষ পর্যন্ত পরম প্রভু বা পরের পর হয়। প্রভু যখন পরম হন তখন তার আর কোন পর থাকেন না। প্রভুর মানে 'যার অপর নাই'। সংক্ষেপে তিনিই 'পরম'।

পরসঙ্গ লাভের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় বিরহ বা বিচ্ছেদ (ইংরেজি জবানে separation)। সভ্যতায় সামিল শিশু সঙ্গে সঙ্গেই জানে সে পূর্ণ নয়। কিসের জানি অভাব তার। এই হারানো পরির সন্ধানে শুরু তার নিরুদ্দেশ যাত্রা। যা পায় সেটিই আঁকড়ে ধরে সে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই হতাশ হয়। মানুষের প্রেমে পড়া জিনিসটা আর কিছু নয়, সেই খেই হারানোর, পরির সন্ধানে অন্তহীন অভিযাত্রারই অপর নাম। আপন প্রাণের খা খা ভাব অন্যে পূরণ করবে ভেবে আঁকড়ে ধরি। দেখি সেইখানেও একই শূন্যতা, অভিন্ন খা খা।

জাক লাকাঁ সেই জন্যই গোঁয়ারের মতন ঘোষণা করেছেন, এই দুনিয়ায় নারী-পুরুষ সম্পর্ক বলে কোন সম্পর্কই নাই (There is no such thing as sexual relation.)। নারীর অপূর্ণতা পুরুষ এসে ভরিয়ে দেবেন—পৃথিবীর প্রাচীনতম এই মায়া আজো সম্মানে বেঁচে আছে। জাক লাকাঁ সেখানেই ঝাঁকুনি দিয়েছেন।

লাকাঁ কেন কঠিন সেই রহস্য এক্ষণে আরেকটু জমে উঠছে।

বৈষ্ণব পদাবলী'র রাধা কেন মথুরায় গিয়েও কৃষ্ণ খুঁজে পায় না? লাকাঁ পড়ার পর এই আমি অধমও ধীরে ধীরে টের পাচ্ছি মানুষ কেন কৃষ্ণের জীব। আর নিখিল কেন অবলা।

> দেখিয়া কদম্ব ফুল কানু পড়ে মনে।
> কেমনে ধরিব প্রাণ বিনি দরশনে ॥
> কে হরিল কোথা গেল কে সাধিল বাদ।
> কোথা ছাড়ি গেল পিয়া করিয়া প্রমাদ ॥
> যে যায় মধুরা পুরি তার লাগি পাই।
> মনের মরম কথা লিখিয়া পাঠাই ॥
> অল্প বয়সে মোর কালা পরিবাদ।
> বিধি কৈল পরাধিনি না পুরল সাধ ॥

ভণ কবিশেখর শুন বরনারি।
ধৈরজ ধর চিতে মিলিবে মুরারি॥
(মুখোপাধ্যায় ২০০০: ৩৩৭)

পদ (signifier) বাঞ্ছাকে পদার্থে (signified) পরিণত করতে চায়। কিন্তু সহজে বাঞ্ছা সহজে হার মানে না। রাধা কৃষ্ণের প্রেমে পড়েন। একেই বলে পরসঙ্গ বা পরকীয়া। কিন্তু কৃষ্ণ রাধাকে সংসারে গ্রহণ করেন না। একেই বলে বিরহ বা বিচ্ছেদ। রাধা বলছেন না কৃষ্ণ প্রতারণা করেছেন। তিনি বলছেন তিনি অলভ্য, তিনি অ-বশ। তিনি অখ্যাতরাশি। অবশ্য বিধি ওরফে প্রভুরও দোষ আছে।

এই আবিষ্কার জাক লাকাঁর। অন্যান্যের মধ্যে তাঁর তিন সাকরেদ—লুই আলথুসার, মিশেল ফুকো ও জাক দেরিদা—পর্যন্ত এই ভেদ ধরতে পারেন নাই। এই ভুল বোঝাবুঝির ইতিহাসই এই কালের ফরাসি তত্ত্বজ্ঞান।

সেই কথা দিনান্তরে।

দোহাই

১. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, *বৈষ্ণব পদাবলী*, ৩য় সংস্করণ (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০০০)।
২. Shoshana Felman, *Jacques Lacan and the Adventure of Insight: Psychoanalysis in Contemporary Culture* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1987).
৩. --------, *La 'Folie' dans l'oeuvre romanesque de Stendhal* (Paris: José Corti, 1971).
৪. Jacques Lacan, *Écrits: The First Complete Edition in English*, Bruce Fink, trans. (New York: W. W. Norton, 2006).
৫. --------, *Écrits* (Paris: Editions du Seuil, 1966).
৬. Elisabeth Roudinesco, *Jacques Lacan: Outline of a Life, History of a System of Thought* (New York: Columbia University Press, 1997).

....

উৎস
প্রথম আলো ॥ ঢাকা ২০০৬

৪

ফ্রয়েড মানে আনন্দ

মহাত্মা ফ্রয়েড যদি আজ অবধি বাঁচিয়া থাকিতেন তবে এতদিনে তাঁহার বয়স হইত ১৫১ বছর। আজ পর্যন্ত যত মানবসন্তান জন্মিয়াছেন, দুঃখ পাইয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত মরিয়াও অমর হইয়াছেন মহাত্মা ফ্রয়েডের নাম তাঁহাদের তালিকায় পয়লা কাতারে দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার জন্ম ও মরণস্থল হইতে খানিক দূরের এই বাংলা মুলুকেও আমরা তাঁহার নাম লইতেছি সেই কারণেই।

১

ফ্রয়েড জন্মিয়াছিলেন যেই ছোট্ট মফস্বল শহরে তাহার নাম ফ্রাইবার্গ। স্থানটি বর্তমানে চেক প্রজাতন্ত্র নামে পরিচিত রাষ্ট্রের ভিতরে পড়িয়াছে। সেই কালে উহা অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্গত মোরাভিয়া দেশের সীমান্তভুক্ত ছিল। তখন ইংরেজি সাল ১৮৫৬। মে মাসের ৬ তারিখ ফ্রয়েডের জন্মগ্রহণ হয়। ৮৩ বছর আয়ু শেষ করিয়া তিনি—খানিকটা হইলেও বলিতে হয় নিজের ইচ্ছায়—১৯৩৯ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর লন্ডন শহরে মৃত্যুগ্রহণ করেন।

১৯৩৮ সালে *হজরত মুসা ও একেশ্বরবাদী ধর্ম* (*Moses and Monotheism*) নামক তদীয় নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধের ভূমিকাস্বরূপ একটি কথা লিখিতে তিনি ভোলেন নাই। মহাত্মা ফ্রয়েড ঐ লেখায় জানাইয়া দিয়াছিলেন:

> মদীয় যুগান্ত ভাই (জর্জ) বার্নার্ড শ বলিয়াছেন কমসে কম তিনশত বছর পরমায়ু পাওয়া যদি সম্ভব হইত, তবেই মাত্র মনুষ্যসন্তানের পক্ষে কিছু একটা কীর্তি রাখিয়া যাওয়া

> সম্ভবপর হইত। আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। এই ভাবে জীবনের মেয়াদ টানিয়া লম্বা করিয়াও কোন ফায়দা পাওয়া যাইবে না। যাইতে পারে একটি মাত্র শর্তে। এই যে আমাদের বর্তমান প্রাণধারা তাহার ভিত্তিমূলের শিকড়-বাকড় পর্যন্ত অনেক জিনিস না পাল্টাইতে পারিলে কোন লাভ হইবে না।

এই রকম হতাশ কথা লেখার রহস্য কী? ফ্রয়েড কোনদিন গলা বড় করিয়া বলেন নাই তিনি দর্শন লিখিতেছেন। কিন্তু তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় দার্শনিক বলিয়া যাঁহারা পরিচিত তাঁহাদের লেখাও বদলাইয়া দিয়াছে। ফ্রয়েডের বার্তাটি তাহা হইলে কী?

মানবজাতি ক্রমে ক্রমে সভ্য হইতেছে, দুই হাজার বৎসর পূর্বে এই জাতি যতখানি অসভ্য ছিল এক্ষণে অতটা অসভ্য আর নাই। এক কথায় প্রগতি ঘটিতেছে তাহার। এই গুজবে ফ্রয়েড কান দেন নাই। তিনি সত্য কথা বলিয়াছেন গল্পের আকারে। তিনি ঠাহর করিয়াছিলেন: মানুষ সত্যকে সত্য আকারে বুঝিতে পারে না, পারে গল্পের আকারে। যেমন শেক্সপিয়রের *হ্যামলেট* নাটকের রাজা যে নিজের ভাইকে কতল করিয়া ভাইয়ের বউকে শাদি করিয়াছে সেই সত্যটা তাঁহাকে জানাইতে হইল নাটকের ভিতর আর একখানা ছায়ানাটক জমাইয়া। ছায়ানাটকেও একই ঘটনা ঘটে কিন্তু সকলেই জানে নাটক তো নাটক মাত্র। কদাচ সত্য নহে।

ফ্রয়েডও এমনই একপ্রস্ত গল্প লিখিয়া জানাইয়াছিলেন একদা মনুষ্যসন্তানেরা সকলে মিলিয়া তাহাদের আদি পিতাকে খুন করে। তারপর তাহারা আইন করিয়া লয় পিতার নারীরা সন্তানগণের অভোগ্যা বা অগম্যা। অথচ এই অভোগ্যাভোগ বা অগম্যাগমনের দাবিতেই তাহারা আদতে পিতৃহত্যার কলঙ্কতিলক কপালে উঠাইয়াছিল। তাহা হইলে এই গল্পের নীতিকথাটি কোথায়?

সারা জীবন মহাত্মা ফ্রয়েড ইহারই—উত্তর বলিব না—প্রশ্নটা সন্ধান করিয়াছেন। তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন: মানুষ ভাষার জীব। ভাষার অপর নাম যদি 'বিধি' হয় তবেই না 'বিধির বিধান' কথাটির একটা অর্থ হয়। ফ্রয়েড বলিয়াছেন: মানবশিশু কেন কথা বলিতে শেখে তাহার কোন কারণ তিনি জানেন না। সন্তানরা কেন পিতাকে হত্যা করিবে, কী কারণে করিবে—তাহাও তাঁহার জানা নাই। তিনি শুদ্ধ একটা গল্প ফাঁদিয়াছেন। নারীর দখল লইয়া বুঝি পিতা-পুত্রে এই যুদ্ধ। ভাষার ক্ষেত্রে বা অন্য কথায় ভাষার মাঠে এই নারীর নাম দাঁড়ায় 'অন্য' বা 'পরি'। নারীর প্রতি পুরুষের টানকে যদি 'কামনা' নাম দেওয়া অসঙ্গত না হয়, তবে ভাষার দিকে মানুষের যেই আসক্তি তাহাকে 'বাসনা' বলাও অন্যায় হয় না।

২

কী ঘটে ভাষায়? ভাষা কি মানুষের কোন প্রয়োজন পূরণ করে? ফ্রয়েড বলেন: না। ভাত-রুটি না হইলে মানুষ প্রাণে বাঁচিবে না। কিন্তু ভাষা না হইলেও মানুষ বাঁচিত। তবুও কেন মানুষ ভাষার অধীন হইল? ভাষা না থাকিলে সত্য কিংবা ন্যায় কিছুই থাকিত না, কথাটা সত্য। এই ভাষা, এই পদ-পদাবলি কেমন করিয়া মনুষ্যসন্তানের উপর আপনকার ভোগদখল কায়েম করিল? ইহাই ফ্রয়েডের এক নম্বর জিজ্ঞাসা। কিন্তু এই জিজ্ঞাসার কোন সরাসরি উত্তর মহাত্মাজি দিতে পারেন নাই।

তিনি শুদ্ধ বলিয়াছেন: এমন মনুষ্য জন্মগ্রহণ না করিলেই হয়তো ভাল হইত। না, না, কথাটা ঠিক হইল না। ফ্রয়েড যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম বলিতে হইলে কহিতে হয়: এভাবে যে মনুষ্যজন্ম তাহা বরণ না করিলেই হয়তো ভাল হইত। দুর্ভাগ্যবশত এই ধরনের কথা খুব বেশি মানুষ বলেন নাই। তবে ফ্রয়েডের দুই-আড়াই হাজার বৎসর পূর্বের গ্রিক কবি সোফোক্লেসও বলিয়াছিলেন, এভাবে না জন্মাইলেই হয়তো ঢের ভাল হইত।

ফ্রয়েড শুদ্ধ বলিয়াই সারেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন মনুষ্যসন্তানের পরম যন্ত্রণার উৎস এই ভাষা। সেই যন্ত্রণা কমাইবার উপায়ও একটা তিনি বাতলাইয়াছিলেন। তাহার নাম 'মতিবিভাজন'। ইহা হালফিল বাংলাদেশে 'মনোবিশ্লেষণ' হিসাবে পরিচিত। মতিবিভাজন হইতে প্রাপ্ত সবচেয়ে বড় সবক কী? সবক হইল ভাষার অধীন হওয়া। মানে 'আপন'কে হত্যা করা আর পরের অধীন হওয়া। অথবা বলা যাইতে পারে, আপনাকে 'পর' হিসাবে পাওয়া। ইহার অর্থ ভাষার অধীন হওয়ার 'পর' মানুষের 'আপন' বলিয়া কিছুই আর থাকে না। এই মূল্য তাহাকে দিতেই হয়।

ঘটনার শেষ যদি ইহাতেই হইত তবে কোন কথা ছিল না। ফ্রয়েড দেখাইয়াছেন: মানুষ নিজেকে ছাড়িয়া দিলেও, নিজ বা আপন তো মানুষকে ছাড়ে না। সে 'লক্ষণ' হিসাবে, 'আলামত' আকারে, উপসর্গস্বরূপ হাজির হয়। শিশু যখন কথা বলে তখন সে পরের মধ্যে, ভাষার মধ্যে বিলীন। কিন্তু একই সঙ্গে তাহার অবিলীন অংশও ভাষার মধ্যে হাজির হয় বারবার। বিলীনই করতে চায় অবিলীনকে। ইহার নামই বাসনা। বাসনার এক নম্বর লক্ষণ কদাচ 'সে ফুরাইবার নহে'।

ভাষায় পড়িয়া মনুষ্যশিশুর যেই দশা হয় তাহার নামও ফ্রয়েড দিয়াছেন। ইংরেজিতে সেই নামের তর্জমা দাঁড়ায় নিউরোসিস (neurosis)। বাংলায় কেহ কেহ ইহার নাম লিখিয়াছেন 'স্নায়ুরোগ'। আমরা বরং ইহার নাম প্রস্তাব করিব

'ভাষারোগ'। ইহাকে প্রায়শ আমরা উভয়সঙ্কটও বলিয়া থাকি। 'ফরাসিদেশের ফ্রয়েড' নামে পরিচিত মহাত্মা জাক লাকাঁ একটি মজার উদাহরণের সাহায্যে রোগটির ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

রাস্তার ধারে ছুরি হাতে ছিনতাইকারী বলিল: 'তোমার টাকা দাও, নচেৎ তোমার প্রাণসংহার করিব'। তখন আপনি কী করিবেন?

যদি বলেন টাকা দিব না, আপনার প্রাণটা দিতে হইবে। আর যদি টাকাই দিয়া দেন তবু তো প্রাণই দিলেন, কেন না এই টাকা ছাড়া আপনার জীবন অর্থ-(মানে টাকা) হীন।

এই ধরনের প্রশ্ন তাহা হইলে করা হয় কেন? ছিনতাইকারী বলিতেই পারিত: আপনার প্রাণ লইব। প্রাণ লওয়ার পর তার টাকা লইতেও তো কোন অসুবিধা হইত না। তবু সে ভাড়ায় দেখিল কোন ভূত? বলিল: 'প্রাণ অথবা টাকা?' লাকাঁ এই ধরনের প্রশ্নের নাম রাখিয়াছেন জবরদস্তি নির্বাচন (forced choice)। কথাটা সোনার পাথরবাটির মতনই শোনায়। হোক সোনার, তবুও তো পাথরের বাটি। হোক জবরদস্তি, তবুও তো নির্বাচন!

ভাষার অবস্থাও একই। কথা না বলিলে 'আমি' নাই। কথা বলিলেও আমি নাই: আছে 'পর', 'অন্য' বা 'পরি'। সেই পরির মধ্যে নিজেকে পাওয়ার আপোস যাঁহারা করেন তাঁহারাই মানুষ। তাঁহারাই ভাষারোগী। আর যাঁহারা পারেন না এই আপোসে পৌঁছাইতে, তাঁহারাই পরিচিত হন পাগল বা অপ্রকৃতিস্থ বা বিকারগ্রস্ত নামে। ফ্রয়েডের আবিষ্কার বা মতিবিভাজন তাই শেষ বিচারে দাঁড়ায় 'ভাষার অধীন মানবশাস্ত্র' বা 'মানুষথেকো ভাষাশাস্ত্র' নামে। ভাষাই মানুষের বাসনার নির্জনতম স্থান।

৩

ফ্রয়েডের আবিষ্কার অনেক মানুষেরই পছন্দ হয় নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন তিনি রতি বা কাম লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, সুতরাং ভদ্রসমাজে তাঁহার জায়গা হইতেছে না। কেউ কেউ বলিলেন, তিনি অপবিজ্ঞানী। বিজ্ঞানে তাঁহার ঠাঁই হইবে না। দুইটা অভিযোগই অসত্য অথবা বড়জোর অর্ধসত্য।

আমি এই সকল অভিযোগের জবাব লিখিব ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু জায়গায় অথবা আমার বিদ্যায় কুলাইল না। সাপ্তাহিক ২০০০ বলিয়াছেন এক হাজার শব্দের ভিতরে যাহা লিখিবার লিখিতে হইবে। আমার দশাও হইয়াছে ফ্রয়েড-বর্ণিত মনুষ্যের মতন। না লিখিলে অপ্রকৃতিস্থ হই। আর লিখিলে হই ভাষারোগী। টাকা না দিলে প্রাণ যায়। আর টাকা দিলেও প্রাণটা থাকে না।

সিদ্ধান্ত লইলাম: টাকাও দিব, প্রাণটাও যাইবে। একের ভিতর দুই দেওয়ার এই আনন্দ কোথায় রাখিব? জাক লাকাঁ জানাইয়াছেন: জর্মান ভাষার শব্দ 'ফ্রয়েড' মানেও আনন্দ। (লাকাঁ ১৯৯৭: ২৩২)

সেই আনন্দই না হয় লভিব।

দোহাই

১. Jacques Lacan, *The Psychoses 1955–1956: The Seminar of Jacques Lacan, Book III*, Jacques-Alain Miller, ed., Russell Grigg, trans. (New York: W. W. Norton, 1997).

....

উৎস

সাপ্তাহিক ২০০০ ॥ ঢাকা ২০০৭

৫

ফ্রয়েডের আবিষ্কার: দমন ও বাসনা

ফ্রয়েড নিজেই বলিয়াছেন তাঁহার আবিষ্কৃত মতিবিভাজন (ওরফে মনোবিশ্লেষণ) শাস্ত্রের ভিত্তি গড়া হইয়াছে 'দমন' ধারণার পাথর দিয়া। স্বভাবতই প্রশ্ন হইতেছে 'দমন' জিনিসটা কী? আর কে কাহাকে দমন করিতেছে সেই প্রশ্নও পরিহার করিবেন কী করিয়া? এই বিষয়ে প্রথমে আমরা খোদ আবিষ্কর্তা ফ্রয়েডের প্রস্তাব বিচার করিয়া দেখিব। তাহার সঙ্গে বিচার করিব জাক লাকাঁর ব্যাখ্যা। কারণ লাকাঁই—যাঁহাকে 'ফরাসিভাষী ফ্রয়েড' বলিয়া সম্মান জানাইতেই হইবে—ফ্রয়েডের সর্বাধিক যোগ্য ভাষ্যকার।

১

বাংলা 'দমন' কথাটি আমরা 'ইংরেজি' রিপ্রেশন (repression) কথাটির অনুবাদ স্বরূপ ব্যবহার করিতেছি। ইহার অনুবাদ আমার পূর্বসূরিগণ কেন 'অবদমন' করিয়াছিলেন তা সহজে বুঝিতে পারি নাই বলিয়া আমি 'দমন' কথায় ফিরিয়া যাইতেছি।

ফ্রয়েডের প্রস্তাব মোতাবেক—কোন চিন্তা বা স্মৃতিকে যখন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের এলাকায় ঠাঁই না দিয়া অজ্ঞানের এলাকায় ঠেলিয়া দেওয়া হয় তখন দমন করা হয়। এইখানে দমন মানে তাড়াইয়া দেওয়া মাত্র—হত্যা করা নহে। যাহাকে দমন করা হইতেছে তাহা চিন্তা বা স্মৃতি মাত্র—আসল বস্তু নহে। হিস্টিরিয়া রোগীর চিকিৎসা উপলক্ষে ফ্রয়েড প্রথম নজর করিয়াছিলেন রোগী কোন কোন কথা একেবারেই স্মরণ করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু একবার মনে করিয়া দেওয়ার পর গড় গড় করিয়া

সবই তাহার স্মরণপথে উদিত হইতেছে। ইহা হইতেই ফ্রয়েড ধারণা করিলেন কিছু একটা দমন করা ছিল, মারা যায় নাই। তাহাই এখন সুযোগ করিয়া দেওয়ার ফলে পথ পাইয়াছে আর পথ পাইবার ফলে আসিয়া হাজির হইতেছে। এই ঘটনার নামই ফ্রয়েড রাখিলেন ফেরড্রাংগুঙ্গ (*Verdrängung*) বা দমন। ইহা ফ্রয়েডের আবিষ্কারের প্রথম পর্যায়।

পরে ফ্রয়েড দেখিলেন দমন দুই প্রকারের হইয়া থাকে। একদা যাহা জ্ঞানে ছিল, তাহাকে বিরাগবশত আমরা যদি অজ্ঞানের এলাকায় ঠেলিয়া পাঠাই তাহাতে দমন ঘটে। উপরে ইহার কথাই বলা হইয়াছে। পরে ফ্রয়েড এই দমনের নাম রাখিলেন 'দুই নম্বর দমন' (secondary repression)।

পরের বার ফ্রয়েড আর এক ধরণের দমন কাহিনী বয়ান করিলেন যাহার নাম রাখা হইয়াছে আদের দমন বা আদ্যদমন 'এক নম্বর দমন' (*Urverdrängung* বা primary repression)। ইহার মর্ম এই যে, যাহা আদপেই কোন দিন জ্ঞানের এলাকায় প্রবেশ করে নাই তাহাকে দমন করিয়া অজ্ঞানেই রাখিয়া দেওয়া হয়। এই আদ্যদমন এক ধরনের গল্পকাহিনীর মত হইলেও ইহা অসত্য নহে। একটু চিন্তা করিলেই ইহা বোঝা যাইবে।

ফ্রয়েড মানুষের মনকে যে জ্ঞান ও অজ্ঞান—এই দুই কাণ্ডে বিভক্ত করিলেন তাহার পক্ষে যুক্তি কী? অজ্ঞান সৃষ্টির আগে একটা না একটা কাণ্ড তো দরকার। দমনই সেই কাণ্ড। অর্থাৎ যে দমনের মধ্যবর্তিতায় অজ্ঞান তৈরি হইল তাহাই আদ্যদমন। আদ্যদমন না হইলে অজ্ঞানেরই জন্ম হইত না।

মনে রাখা দরকার প্রাণী মাত্রেরই জ্ঞান (বা 'সাড়া', বা 'হুশ') থাকে। কিন্তু সকল প্রাণীর অজ্ঞান থাকে না। অজ্ঞান থাকে কেবল ভাষা বলা প্রাণী ওরফে মনুষ্য সন্তানের। অবলার নহে। অর্থাৎ অজ্ঞান অনাদি নহে, তাহারও আদি আছে। এই আদিকাণ্ডেরই অপর নাম আদ্যদমন।

প্রথম প্রথম একটু খটকা লাগিলেও লাগিতে পারে। কিন্তু একটু ভাবনাচিন্তা করিলেই দেখিবেন যাহা কোন দিন হাজির ছিল না তাহাও হাজির হইতে পারে 'শূন্য' আকারে। অবশ্য যদি সংখ্যাতন্ত্র (number system) থাকে। 'এক' সংখ্যাটি তৈরির আগে 'শূন্য' বলিয়া কোন সংখ্যার কথা আমরা জানিতাম কি? অথচ 'এক' যখন তৈরি করিলাম তখন দেখিলাম তাহার স্থান প্রথম নহে, দ্বিতীয়। কারণ প্রথম স্থানটি শূন্যকেই ছাড়িয়া দিতে হইবে।

ইহা হইতে সিদ্ধান্ত হইতেছে প্রথমেই কিছু একটা দমন করা হইয়াছে। নহিলে আদপে অজ্ঞানই গঠিত হইত না। অজ্ঞান আবিষ্কার করার পর ফ্রয়েড বুঝিতে পারিলেন দমন দুই প্রকারের: আদ্য ও অন্তিম। প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি।

২

ফ্রয়েডের প্রস্তাব অনুসারে বলিতে হইবে দমনকাণ্ডের ফলে চিন্তা, ধারণা, বা স্মৃতি ধ্বংস হয় না, অন্য কোথাও ঠাঁই লয়। এখানে জাক লাকাঁর কথা তুলিতেই হইবে। তিনি ভাষ্য করিয়াছেন, যাহা দমন করা হয় তাহা আসলে ভাষা-ই। তাই দমিত শব্দ, বাক্য বা বাক্যাংশ অন্য শব্দ, অন্য ভাষা বা অন্য রূপক আকারে প্রকাশ পায়, ফিরিয়া আসে। এই আবিষ্কারটাও ফ্রয়েডেরই। লাকাঁ ইহার কথা নতুন করিয়া বলিয়াছেন। রোগের উপসর্গ বা লক্ষণ, স্বপ্ন, কথার ভুল, পরিহাস ইতি আদি—ফ্রয়েডের দৃষ্টিতে—দমন করা ভাষারই (ফিরে) আসা মাত্র (return of the repressed)। কিন্তু সমস্যার কথা একটাই। যাহা যে আকারে দমন করা হয় তাহা হুবহু সেই আকারে ফেরে না। ফেরে নতুন বেশে, নতুন আকারে। এই আকার বা বেশ পরিবর্তন বুঝিবার উপায় কি?

ইহা বুঝিতে হইলে মনের কাঠামো বা গঠন (structure) সম্পর্কে পূর্বসিদ্ধান্ত করিতে হইবে। এইখানে আমরা আলোচনা সংক্ষেপে করিবার খাতিরে শুদ্ধ জাক লাকাঁর প্রস্তাব বয়ান করিব। লাকাঁর বয়ান মোতাবেক বলিতেছি যেখানে দমন সফলভাবে করা সম্ভব হয় সেখানে মনের গঠন হয় স্নায়ুরোগ (neurosis) আকারে। আর যে সকল জায়গায় তাহা সম্ভব হয় না সেখানে অন্য গঠনের মন ধরিয়া লইতে হইবে। উন্মাদনারোগে (psychosis) দমন ঘটে না, সেখানে ঘটে ফোক বা ফোরক্লোজার (foreclosure)। আর বিকাররোগে (perversion) ঘটে অস্বীকার বা ডিস্যেভাউয়াল (disavowal)। দমনের ব্যর্থতাই আসলে তাহার সাফল্য। এ কথা বলা চলে।

এইখানে মনে রাখিবার কথা একটাই। যাহাকে দমন করা হইতেছে তাহা ভাষা বা প্রতিনিধি মাত্র। ইহার পরিচয় আমরা এতক্ষণ দিয়াছি চিন্তা, ধারণা বা স্মৃতি আকারে। ফ্রয়েড নিজেই বলিয়াছেন আবেগ বা আসল বস্তুর কোন ধ্বংস নাই, কাজেই তাহার কোন দমনও নাই। তাহার ঘটে কেবল স্থানচ্যুতি বা রূপান্তর। দমন কথাটি প্রযোজ্য কেবল তাড়নার (দরজা পাহারাদারের) ক্ষেত্রে। দমন কেবল বাহিরের বা রূপের—অন্তরের বা স্বরূপের নহে।

ফ্রয়েডের আবিষ্কারের তাৎপর্য জাক লাকাঁই সবচেয়ে ভালভাবে আমল করিয়াছেন। তাঁহার বিচার অনুসারে আদ্যদমন মানে আর কিছু নহে—খোদ ভাষা শিক্ষা। শিশুর প্রয়োজন (need) যখন চাহিদা (demand) আকারে ভাষায় ব্যক্ত হয় তখনই আদ্যদমন ঘটে। শিশু যখন 'মা' শব্দটি উচ্চারণ করে তখন কিছু একটার বিনিময়ে মা শব্দটি তার মুখে উঠে আসে। ঐ কিছু একটা—বা শূন্য—দমনের নামই আদ্যদমন।

ইহা অনেকটা 'ঈশ্বর' শব্দের বেলায়ও প্রযোজ্য। সবকিছুর একজন স্রষ্টা থাকিতে হইবে। তাই একজন স্রষ্টা ছাড়া এই বিশ্ব হইতে পারে না। এহেন কথা যখন বলি তখন প্রশ্ন হয় স্রষ্টা ছাড়া কিছু থাকিতে না পারিলে খোদ স্রষ্টা কী করিয়া থাকিতেছেন? তখন আমাদের বলা হয়—এই প্রশ্ন করা যাইবে না। এই অপারগতারই অপর নাম—লাকাঁ কহিতেছেন—আদিদমন। সত্যের সত্য কী—তাহা বলা যাইবে না। অর্থাৎ ভাষার সেই ক্ষমতা নাই। ইহা মন গঠনের আগের বিষয়।

কিন্তু মন গঠনের পর যাহা দমন করা হয় তাহা আমাদের অপেক্ষাকৃত বেশি পরিচিত। এখানেই স্বপ্ন, এখানেই ঠাট্টা, এখানেই ভুল-ভ্রান্তি। এখানে দমন (repression) আর দমনের পর দমিতের প্রত্যাবর্তন (return of the repressed) একই কথা। দমন মানে এখানে রূপান্তর বা রূপক—'এটা তোর জন্মদাতা জনকের জীবনের রুগ্ন কাঁপাত্তর।' এটা রূপক—পাখির নীড়ের মতন কাহারও চোখ কথাটাও ব্যবহৃত দুই নং রূপক। পৃথিবীর তিন ভাগ জলের সমান কাহারও কান্নাভেজা চোখ ইহাও রূপক।

বাসনা অনন্ত বলিয়া দমনেরও অন্ত নাই। কারণ দমন ছাড়া বাসনা নাই। বাসনাই তাই বার বার ফিরিয়া আসে। কারণ আমরা জানি দমন ও বাসনা সমার্থক শব্দ।

কিন্তু দমন করে কে: জ্ঞান না অজ্ঞান? ইহার উত্তর অন্য প্রবন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। এখানে নিতান্ত সময়াভাবে লেখা শেষ করিতে হইতেছে। পাঠিকাগণ অসীম ক্ষমায় আমাকে দেখিতে পারিবেন বলিয়াই আশা রাখি।

....

উৎস

হালখাতা ॥ ঢাকা ২০০৮

৬

এডোয়ার্ড ওয়াদি সায়িদ ও জিকমুন্ট ফ্রয়েড

মহাত্মা এডোয়ার্ড সায়িদ এন্তেকাল করেছেন ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। অন্তত দশ বছর আগে ধরা পড়েছিল, ওঁর লিয়ুকেমিয়া রোগ হয়েছে। অসুখ ধরা পড়ার পরও তিনি সর্বশক্তি দিয়ে জীবনের করণীয় বলে যা সাব্যস্ত করেছিলেন তা করে গেছেন। মৃত্যুর আগের কয়েক বছর তিনি কায়রোর বিখ্যাত *আল-আহরাম* পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লিখতেন। সেই কলামের একটি সংগ্রহ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

এই সংগ্রহের ভূমিকায় একজন মার্কিন বুদ্ধিজীবী লিখেছেন, এডোয়ার্ড সায়িদ ছিলেন খুব সম্ভব তাঁর কালে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী। সায়িদের আগের পুরুষে এহেন খ্যাতির অধিকারী ছিলেন খুব সম্ভব দুইমাত্র ফরাসি লেখক জাঁ-পল সার্ত্র আর ব্রিটিশ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল।

এডোয়ার্ড সায়িদের ব্যাপক খ্যাতির সূত্রপাত খ্রিস্টীয় ১৯৭৮ সালে। সেই বছর ওঁর বই *অরিয়েন্টালিজম* (এর বাংলা *প্রাচ্যবাদ* করা যায়, *প্রাচ্যবিদ্যা*-ও করা চলে, আমি প্রস্তাব করি *প্রাচ্যনামা* করার।) বাজারে ছাড়া হয়। বর্তমান যুগের এয়ুরোপ ও আমেরিকার চিন্তাজগতে তাঁদের তালুকদারি ও তরফদারির সূত্রে তথাকথিত প্রাচ্যজগৎ কিভাবে সাবাড় হয়েছে সায়িদের বইতে তারই সামান্য সুলুকসন্ধান পাওয়া যায়। পনের বছর পর, ১৯৯৩ সাল নাগাদ, *অরিয়েন্টালিজম* বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড পদবাচ্য আরেকটি গ্রন্থ প্রকাশ পায়। নাম *কালচার অ্যান্ড ইম্পিরিয়ালিজম*। বাংলায় বলা যাক *বিদ্যাবুদ্ধি ও পরদেশ ভোগবাদ*।

জনৈক মার্কিন পণ্ডিত সাংবাদিক বলেছেন, সায়িদ যদি *অরিয়েন্টালিজম* বাদে আর কিছু নাও লিখতেন বা আর কোন কাজ নাও করতেন, তবুও তিনি বিংশ খ্রিস্টীয় শতকের শেষ ভাগের সেরা প্রভাবশালী বুদ্ধিজীবীর সম্মান পেতেন। এমনই ওজন ওঁর বক্তব্যের। এর কারণ কী? নিঃসন্দেহে তিনি এমন কথা বলেছেন যা শোনার

অপেক্ষায় পৃথিবী অধীর ছিল। ছোট হয়ে আসছে পুঁজিবাদ। ইহার সর্বোচ্চ পর্যায় সাম্রাজ্যবাদ। আর সাম্রাজ্যবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়কে লোকে বলে 'বিশ্বায়ন'। এ কথা অকারণ নয়।

সায়িদ আরো কাজ করেছেন। *অরিয়েন্টালিজম* লেখার পরপর তিনি আরো দুটি বই প্রকাশ করেন। একটির নাম *ফিলিস্তিন সমস্যা* (*The Question of Palestine*, 1979), অন্যটির নাম *এসলামের আড়াল বা খবর* (*Covering Islam*, 1981)। এই সব বই লেখার ফলে একদিকে তাঁর খ্যাতির বাড় আরো বাড়ে, অন্যদিকে তাঁর বিরুদ্ধে নানামুখী হামলাও বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৩ সাল থেকে নিউইয়র্ক শহরের অন্তঃপাতী কলাম্বিয়া নামক বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টারি করে আসছেন তিনি। মৃত্যুর দিন—২০০৩ সনের ২৪ সেপ্টেম্বর—পর্যন্ত তিনি সেখানেই বহাল ছিলেন। ফিলিস্তিনি জাতীয় আন্দোলনের পক্ষে কাজ করার 'অপরাধে' তাঁকে চাকরিচ্যুত করার অনেক চেষ্টা হয়েছিল। কলাম্বিয়া কর্তৃপক্ষ সেই সব চাপের মুখে মাথা নত করেন নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসরায়েলের সমর্থক এয়াহুদি ও অনতি-এয়াহুদি মহলের প্রভাব খুব বেশি। সেই কথা মনে রাখলে সায়িদের চাকরি না হারানোটাই বিস্ময় জাগায়।

সম্ভবত বিশ্বের সবচেয়ে খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবীর চাকরি খাওয়া লাভজনক মনে হয় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর যত খারাপ সমাজ ব্যবস্থাই গড়ে তুলুক না কেন, লাভক্ষতির অঙ্ক বোঝে না এমন সমাজ তৈরি করেছে এই কথা বলা যাবে না। আমরা এখন বলি, 'গো আমেরিকান'। মানে যার পয়সা সেই দেব। হোটেলে-রেস্তোরাঁয় মার্কিন বন্ধুরা বলেন, 'গো ডাচ' মানে যার পয়সা সেই দাও। এই ডাচবুদ্ধি বা ওলন্দাজি শিক্ষা ওঁরা ভোলেন নাই। ভোলা চলবে না, নিউইয়র্ক শহরের আদ্য নাম ছিল নিউ আমস্টার্ডাম। এই শহর ওলন্দাজদের তৈরি। সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে এই শহর ইংরেজরা দখল করে।

তবে এডোয়ার্ডের ভাগ্য সব সময় সমান ভাল যায় নাই। এসরায়েলি প্রচারের সামনে এডোয়ার্ড একবার সত্য সত্য মার খেয়েছিলেন। ২০০১ সালের মার্চ ১৫–২১ সংখ্যার আল-আহরাম পত্রিকায় সায়িদ নিজেই সেই মারের বয়ান লিখে গেছেন। আজ আমি সেই বয়ানের সার পাঠক-পাঠিকাদের দরবারে নিবেদন করব।

১

'আমি সচরাচর নিজের জীবনকাহিনী পাঠককে শোনাই না।' এই কথা লিখেই সায়িদ নিবেদন করলেন, কিন্তু আজ আমার জীবনের একটি কাহিনী আপনাদের শুনতে হবে। মার্কিন দেশের সংবাদপত্র, রেডিও এবং টেলিভিশন মহলে এডোয়ার্ড সায়িদ

বহুদিন ধরে ফিলিস্তিনি স্বার্থের অথবা আরো ব্যাপক অর্থে আরব স্বার্থের বক্তা পরিচয়ে পরিচিত ছিলেন। একই সুবাদে ওঁকে 'ডিফেন্ডার অব ইসলাম' বা 'এসলামি স্বার্থের উকিল' বলেও ডাকা হত। সায়িদের—একই কাতারে বললে—চতুর্থ পরিচয় 'প্রফেসর অব টেরর' ওরফে 'সন্ত্রাসের অধ্যাপক'।

মজার বিষয় সায়িদ নিজেকে রাজনীতিতে ভারতীয় সাধু মহাত্মা গান্ধির মুরিদ মনে করতেন। ওঁর অন্য গুরুদের মধ্যে মার্কিন কাল সাধু মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়র ওরফে ছোটন) এবং কিয়দংশে দক্ষিণ কাফ্রি নেতা নেলসন মান্ডেলা। সশস্ত্র সংগ্রামের প্রশ্নে ফিলিস্তিন মুক্তি সংগঠনের সঙ্গেও এডোয়ার্ড সায়িদ মাঝে মাঝে দ্বিমত পোষণ করতেন। বিখ্যাত জঁ-পল সার্ত্র সশস্ত্র সংগ্রাম সমর্থনযোগ্য মনে করতেন। সায়িদ এই বিষয়ে সার্ত্রের মতও মেনে নেন নাই। ওদিকে সার্ত্র ছিলেন আবার কট্টর এসরায়েলপন্থীও।

১৯৬১ সালে আলজিরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৈনিক দার্শনিক ডাক্তার ফ্রানৎস ফানোঁর বই *দুনিয়ার লাঞ্ছিত অগ্যাহত* (*Les damnés de la terre*) প্রকাশ পায় পারি নগরে। এই বইয়ের মুখবন্ধ লেখেন দার্শনিক সার্ত্র। মুখবন্ধে তিনি বলেন, কোন পরাধীন মানুষ যখন তার জবরদখলদারকে হত্যা করে তখন সে একই সঙ্গে দুই হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করে। এক নম্বরে হত্যা করে জবরদখলদার বিদেশি ডাকাতকে। দুই নম্বরে খোদ নিজেকে, ভীত-নিশ্প্রাণ পুরানা এক মজলুমকে—তার আপন পূর্বসত্তাকে। সেই জায়গায় সে হয়ে ওঠে নতুন মানুষ। নতুন মানুষের জন্য পুরাতন দাসের, পরভৃত্যের মৃত্যু বিনা সম্ভব নয়। সার্ত্রের এই বিশ্লেষণে সায়িদ আস্থা স্থাপন করেন নাই।

১৯৭৪ সনে ফিলিস্তিনি নেতা ইয়াসির আরাফাত জাতিসংঘে প্রথম ভাষণ দিলেন। সেই ভাষণের ইংরেজি মুসাবিদা সায়িদ লিখেছিলেন। 'এক হাতে রাইফেল বন্দুক, আর হাতে জলপাই গাছের পল্লব আমার'—আরাফাতের এই বক্তৃতার পিছনেও সায়িদের হাত ছিল।

সায়িদের জন্ম ফিলিস্তিনি শহর জেরুজালেমে। ১৯৩৫ সন থেকে ১৯৪৭ সন পর্যন্ত তিনি সেখানেই বড় হয়েছেন। ১৯৪৭ সনে তিনি বাবার সঙ্গে মিসরে চলে যান। ১৯৪৮ সনে ফিলিস্তিনে এসরায়েল রাষ্ট্র কায়েম হয়। এই তথ্য গবেষণা করেই এসরায়েলে সমর্থকরা প্রমাণ করার প্রয়াস করেছিলেন সায়িদ ফিলিস্তিনি নন, বিদেশি।

১৯৭৭ থেকে ১৯৯১ সন পর্যন্ত এডোয়ার্ড সায়িদ ফিলিস্তিনি মুক্তি সংগঠনের উদ্যোগে গঠিত ফিলিস্তিন জাতীয় পরিষদের (Palestine National Council) সদস্য ছিলেন। এডোয়ার্ড সায়িদ নিজের পদত্যাগের কারণ নিজেই বলেছেন। ফিলিস্তিনি নেতৃত্বের আত্মসমর্পণ নীতির প্রতিবাদ হিসাবেই তিনি পদত্যাগ করেন।

১৯৮৮ সনে ঐ পরিষদ প্রথম ঘোষণা করে তারা এসরায়েলের অধিকার মেনে নিয়েছেন। এই ঘোষণার ভিত্তিতে যাকে বলা হয় 'শান্তি-প্রক্রিয়া' তার শুরু। এই

আলোচনা গোপনে শুরু হয় নরওয়ের রাজধানী অসলো শহরে। তাই সংক্ষেপে এই 'আর-যাই-হোক-শান্তি-নয়' প্রক্রিয়ার নাম অসলো প্রক্রিয়া। মনে রাখা দরকার এই সায়িদই সবার আগে ১৯৮০ সন নাগাদ বলেন ফিলিস্তিনি দুই রাষ্ট্র মেনে নেওয়া ছাড়া গতি নাই। তাঁর বাণীই সত্য হয়েছে।

তো কেন তিনি অসলো প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন? কোন কারণে? ১৯৪৮ সনে যেই সকল ফিলিস্তিনি পরিবারকে এসরায়েল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল তাদের স্বদেশে ফেরার কোন বিধান অসলো চুক্তিতে রাখা হয় নাই। ফেরার অধিকার ছাড়া কোন শান্তিই শান্তিপদবাচ্য হয় না।

এসরায়েলি দখলদারির বিরুদ্ধে এডোয়ার্ড সায়িদ শান্তিপূর্ণ সংগ্রামে বিশ্বাস করতেন। তাই ১৯৮৭ সালের পর যেই নিরস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে ওঠে তিনি সেই প্রতিরোধ বা এন্তেফাদার সাফল্যে গভীর আশা পোষণ করতেন। কিন্তু ইতিহাস তাঁকেও হতাশ করেছে।

২

এই শান্তিবাদী লেখক ও অধ্যাপককেই যুক্তরাষ্ট্রের এয়াহুদি লবি 'সন্ত্রাসের অধ্যাপক' ও 'এসলামের উকিল' বলে গাল পাড়ত। জন্মসূত্রে—সকলেই জানেন—এডোয়ার্ড এপিসকোপি গোষ্ঠীভুক্ত খ্রিস্টান। এপিসকোপি শাখা প্রতিবাদী খ্রিস্টান ধর্মের অন্তর্গত সম্প্রদায় বটে।

পাকিস্তানি দার্শনিক একবাল আহমদকে সায়িদ খুবই শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর বরাত দিয়ে তিনি বলেন, ফিলিস্তিনি মুক্তি সংগ্রামকে যাঁরা বলেন জেহাদ তাঁরা মুসলমান, সেই সংগ্রাম দমনকে যাঁরা বলেন ক্রুসেড তাঁরা খ্রিস্টান—ব্যাপারটা এমন সরল নয়। দশম খ্রিস্টান শতাব্দীর পর থেকে এয়ুরোপের খ্রিস্টান সমাজ ও পশ্চিম এশিয়ার মুসলমান-প্রধান সমাজের বিরোধ জিহাদ ও ক্রুসেড নামে পরিচিত হয়েছে। আজ সেখানে অন্তর্যামী হাসছেন। কারণ এয়ুরোপের খ্রিস্টান সমাজ কর্তৃক কয়েক শত বৎসর যাতনা ভোগ করার পর এয়ুরোপীয় এয়াহুদি সমাজের একাংশ আজ ফিলিস্তিনের আরব জনগণকে 'নতুন এয়াহুদি' বানিয়েছে, করেছে ভিটেমাটি ছাড়া। ক্রুসেড ও জেহাদের অর্থ ফিলিস্তিনে এখন সম্পূর্ণ অন্য।

২০০০ সনের জুন-জুলাই মাসে এডোয়ার্ড সায়িদ সপরিবারে দক্ষিণ লেবানন বেড়াতে যান। জুলাই মাসের ৩ তারিখে তিনি দক্ষিণ লেবানন সীমান্তে এসরায়েলি সৈন্যদের ছেড়ে যাওয়া একটি পুরানা ঘাঁটি পরিদর্শন করেন। ঐ জায়গায় এসরায়েলি সৈন্যরা একটি নির্যাতনকেন্দ্র—খিয়াম (Khiam) কারাগার—তৈয়ার করেছিল। ১৯৮৭ সন থেকে ঐ কারায় ৮ হাজার বন্দিকে পঙ্গু করা হয়।

জায়গাটা তখন মাত্র খালি হয়েছে। কোন জনমানুষের চিহ্ন আর নাই সেখানে। সায়িদের সঙ্গে অনেক তরুণ-তরুণীও ছিলেন। তারা খালি বাতাসে ঢিল ছুঁড়ে এসরায়েলি নির্যাতনের প্রতীকী শাপান্ত বা নিকুচি করছিল। হজের সময় হাজিরা যেমন শয়তানের উদ্দেশে ঢিল ছোঁড়েন, এও তেমনি ঢিল ছোঁড়া। এই দৃশ্য ক্যামেরায় তোলা হল। সায়িদ বলতে ছবি তোলার খবরটা জানতেনও না। পরদিনের পরদিন এসরায়েলি পত্রপত্রিকায় এবং পশ্চিমা সকল প্রচারযন্ত্রে ঢিল হাতে এডোয়ার্ড সায়িদের ছবি ছাপা হল। বলা হল এডোয়ার্ড সায়িদ সন্ত্রাসবাদী। সেদিন ঐ সাবেক বন্দিশালার সামনে সায়িদের পর্যটক দল দশ মিনিট 'সন্ত্রাসী' কর্মকাণ্ড চালিয়েছিল বলে সায়িদ স্বীকারও করেছেন। এসরায়েলের সন্ত্রাস 'নিরাকার'। কিন্তু ফিলিস্তিনি সন্ত্রাস 'আকার' পেল সায়িদের হাতের ঢিলা-কুলুপে।

এই ধরনের কুলুপ ছোটবেলায় আমিও চল্লিশ কদম ধরে রাখার সবক পেয়েছিলাম আমার দেওবন্দ ফেরত জ্যাঠামশাইয়ের সাক্ষাৎ। চল্লিশ কদম পবিত্রতা দেয়। তরল শোষণ করে নেয়।

৩

এডোয়ার্ড সায়িদের মৃত্যুর পর মিউনিখ শহরের বিখ্যাত জর্মান পত্রিকা ডি সুডডয়েৎসার সাইতুং (*Die Suddeutscher Zeitung*) শোক প্রবন্ধের নাম দেয় 'ডের উনবেকোয়েমে' (*Der Unbequeme*) বা 'স্বস্তিহীন মনুষ্য'। প্রকৃত প্রস্তাবে এডোয়ার্ড সায়িদ স্বস্তিহীন ছিলেন না, ছিলেন 'অস্বস্তিকর' মানুষ। সায়িদ কাউকেই স্বস্তিতে ঘুমাতে দেন নাই।

২০০১ সনের মে মাসে সাংবাৎসরিক ফ্রয়েড বক্তৃতা দেওয়ার জন্য সায়িদ আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। এই বক্তৃতার আয়োজন করে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা শহরে অবস্থিত ফ্রয়েড ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান। দক্ষিণ লেবানন ও এসরায়েল সীমান্তের খিয়াম কারাগারে সন্ত্রাসী ঢিলা-কুলুপ হামলার অভিযোগ প্রকাশ পাবার কয়েক দিন পর ভিয়েনার ফ্রয়েড ইনস্টিটিউট সায়িদের প্রতিশ্রুত ফ্রয়েড বক্তৃতার অনুষ্ঠান বাতিল করে।

ফ্রয়েডের পিতামাতা এয়াহুদি ছিলেন এবং ফ্রয়েড নিজের ধর্মমত পরিবর্তন করেন নাই। সেই কারণে ফ্রয়েডও এয়াহুদি জাতির সন্তান। ফিলিস্তিনে এয়াহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ফ্রয়েডের নিঃশর্ত সমর্থন পায় নাই। ১৯৩৮ সনে এই ফ্রয়েডকে ভিয়েনা ছেড়ে লন্ডন নগরে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। তখন হিটলারের রাজত্ব সর্বত্র। এডোয়ার্ড সায়িদের বন্ধুরা এসরায়েলি নিষেধাজ্ঞার জবাব উপযুক্ত ভাষায় দিয়েছেন। তারা সায়িদের ফ্রয়েড বক্তৃতার (২০০১) আয়োজন করলেন খোদ লন্ডনে। বাবা

এয়াকুব ফ্রয়েডের হাত ধরে জিকমুন্ট ফ্রয়েড চার বৎসর বয়সে ভিয়েনায় প্রবেশ করেন। বিরাশি বছর বয়সে তিনি নাৎসি দাপটের মুখে লন্ডন নগরে আশ্রয় নেন কনিষ্ঠা কন্যা আনা ফ্রয়েডের হাতে হাত দিয়ে। লন্ডনেই সমাহিত আছেন মহাত্মা ফ্রয়েড। সাধিদের মুখেও কুলুপ আঁটা নাই।

পরিবর্তনের মধ্যে, হিটলারের স্থলে এসরায়েল রাষ্ট্র কায়েম হয়েছে। ফ্রয়েড বক্তৃতা এক বছর ভিয়েনায় হল না, হল লন্ডনে। ইতিহাস কত রঙ্গ দেখে দুনিয়ায়!

দোহাই

১. Edward W. Said, *Freud and the Non-European*, reprint (London: Verso, 2004).

২. --------, *From Oslo to Iraq and Road Map: Essays*, Tony Judt, intro., Wadie E. Said, afterword (New York: Pantheon, 2004).

....

উৎস

দেশবাংলা ‖ ঢাকা, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৫

৭

কঙ্করবোমা

ফ্রয়েড, এডোয়ার্ড সায়িদ ও এয়ুরোপের বিজাতি

ইংরেজি ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ খ্যাতনামা পণ্ডিত এডোয়ার্ড সায়িদ এন্তেকাল করিয়াছেন—এই কথা সকলেই জানেন। কিন্তু সকলেই জানেন কি না আমি জানি না, তিনি ২০০১ সালে লন্ডনে 'ফ্রয়েড ও এয়ুরোপের বিজাতি' নামে একপ্রস্ত বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ২০০৩ সাল নাগাদ তাঁহার সেই বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদিনে পাতলা কাগজের মোড়কে আরো একখানা সংস্করণ বাহিরে আসিয়াছে। আমার সহৃদয় সুহৃদ আসাদুল করিম (প্রকাশ শিশির) লন্ডন হইতে আমার নিকট উপহারস্বরূপ একখণ্ড বহি পাঠাইয়াছেন। তাহাও এক বছরের কথা। বইপত্রের আলোচনা লিখিয়া আমি আংশিক জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকি। কিন্তু কে ছাপাইবে এই জাতীয় লেখা? বন্ধুবর ভ্রাতা রাইসু আমাকে সেই সুযোগ দিয়াছেন। ধন্যবাদ জানাইয়া তাহাকে বড় করিতে চাহিতেছি।

এই বক্তৃতায় এডোয়ার্ড সায়িদ বলিতে চাহিয়াছেন মহাত্মা ফ্রয়েড এয়াহুদি বংশের সন্তান হইলেও নিজেকে এয়ুরোপাবি মনে করিতেন। তবে এয়াহুদি পরিচয়ও তিনি কদাচ অস্বীকার করেন নাই। ১৯৩০ সালের পর এয়ুরোপ মহাদেশে এয়াহুদি বিরোধী আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়া উঠিবার বহু আগেই এয়ুরোপ হইতে এয়াহুদিদের তাড়াইয়া দিয়া অন্য কোথাও উপনিবিষ্ট করিবার পরামর্শ দানা বাঁধিতেছিল। এয়াহুদি জাতির মধ্যে যাঁহারা ফিলিস্তিনে নতুন এয়াহুদি রাজ্য সংস্থাপনের কল্পনায় উত্তেজনা পাইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে সচরাচর জায়নিস্ট (zionist) বা 'জায়নপন্থিক' বলা হইয়া থাকে। শহর জেরুসালেমে এই নামের একটি পাহাড় আছে। জায়ন কথাটি তাহার নাম হইতেই আসিয়াছে।

টিয়োডর হার্তসল নামক এক বিশিষ্ট সাংবাদিক এই জায়ন বা এয়াহুদি রাজ্য আন্দোলনের নেতা বনিয়া গেলেন। তিনি দাবি উঠাইলেন প্রস্তাবিত অখিল এয়াহুদি

রাজ্যটি মোকাম ফিলিস্তিনেই বসাইতে হইবে। ইহার আগে—বিশেষ ১৯ শতকের শেষভাগে—দক্ষিণ আমেরিকার আর্হেন্তিনা কিংবা আফ্রিকার কোন নির্দিষ্ট এলাকায় এই রাষ্ট্র গড়ার প্রস্তাবও উঠিয়াছিল।

আমরা জানি ১৯১৪ হইতে ১৯১৮ সালের যুদ্ধ শেষ হইবার আগে ফিলিস্তিন অঞ্চল তুরস্কের ওসমানিয়া সাম্রাজ্যের তাঁবে ছিল। তখনই এয়ুরোপের এয়াহুদি নেতারা অল্প অল্প জায়গাজমি কিনিয়া ফিলিস্তিনে এয়াহুদি বসতি-বিস্তারের সূচনা করেন। আমাদের কালের ইতিহাসবিজ্ঞরা প্রত্যক্ষ করিতেছেন এই নতুন অভিবাসন বা হিজরত প্রক্রিয়ার শুভ সূচনা ঘটে ১৮৭০ সালের পরের কোন এক সময়।

১৯১৪–১৮ সালের যুদ্ধ—যাহা সচরাচর প্রথম মহাযুদ্ধ নামে কথিত আছে—ঘটিবার পর তুরস্কের পরাজয়সূত্রে ফিলিস্তিন রাজ্যও ইংরেজ সাম্রাজ্যের অধীনে চলিয়া যায়। যুদ্ধ চলিবার সময়ই এয়ুরোপের এয়াহুদি নেতাগণের নেতা ধনুকবের মহাত্মা রথশিল্ড বরাবর ইংরেজ রাষ্ট্রনেতা আলফ্রেড বালফুর মহাশয় সেই বিখ্যাত ঘোষণা পাঠাইয়াছিলেন যাহাতে ওয়াদা দেওয়া হইয়াছিল ফিলিস্তিনে এয়াহুদি জাতির জাতীয় আবাসভূমি (national home) প্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশ সরকার সহায় হইবেন। ১৯৪৮ সালের মধ্যে ঐ ওয়াদামাফিক সেই সহায়তাই করা হইল। ততদিনে ফিলিস্তিনে সংখ্যাগরিষ্ঠ না হইলে কি হইবে, এয়ুরোপ হইতে অপর্যাপ্ত জনসংখ্যা আমদানিপূর্বক শ্রেষ্ঠ শক্তি বনিল এয়াহুদি জাতি। এসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইল।

আজ প্রায় ষাট বৎসর হইতে চলিল পশ্চিমের বলবান জাতিপুঞ্জের সর্বাত্মক সমর্থন ও সহযোগিতা পাইয়া এসরায়েল রাষ্ট্র বিরাজমান রহিয়াছে। এই রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে শুদ্ধ এয়াহুদি জাতির বাসভূমি আকারে। দুনিয়ার যেই কোন দেশের এয়াহুদি ব্যক্তিকে সহজেই ইহার নাগরিক করা হইতেছে। অথচ এমন একদিন ছিল (ওসমানিয়া সাম্রাজ্যের যুগে বা তাহার পর যে ব্রিটিশ যুগ কাটিল তাহাতেও) যখন ফিলিস্তিন দেশটিতে আরব মুসলমান, আরব এয়াহুদি ও আরব খ্রিস্টানগণ একসঙ্গেই বসবাস করিতেন। এক্ষণে সেই অবস্থা আর বিদ্যমান নাই।

মহাত্মা এডোয়ার্ড সায়িদ নিজেও খ্রিস্টান মাতাপিতার সন্তান। তিনি বিশ্বাস করিতেন বিশুদ্ধ এয়াহুদি রাষ্ট্র এসরায়েল সমস্যার কোন সমাধান করে নাই। বরঞ্চ নতুন সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে । 'ফিলিস্তিন সমস্যা' বলিয়া যাহা পরিচিত তাহা সায়িদের বিচারে আদৌ 'ফিলিস্তিন সমস্যা' নহে, আসলে ইহা 'এসরায়েল সমস্যা'রই অন্য নাম মাত্র। তাহা হইলে ইহার সমাধান কী? সমাধান স্বাধীন, ধর্মনিরপেক্ষ, বহুজাতীয় বা নিদেনপক্ষে (আরব ও এয়াহুদি এই দুই জাতি ধরিয়া বলিলে) একটি দ্বিজাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় নিহিত। কিন্তু আজ প্রবল প্রতাপযুক্ত পশ্চিমা সাম্রাজ্যের সমর্থনধন্য জায়নপন্থিকগণ এই ধর্মের কাহিনী শুনিবেন কোন দুঃখে?

এই বিশ্বাসের সমর্থনে আমাদের হাতের ছোট্ট বহিটির মধ্যবর্তিতায় মনীষী এডোয়ার্ড সায়িদ একপ্রস্থ অতিরিক্ত যুক্তি দেখাইলেন। জীবনের শেষ বৎসরে মহাত্মা

জিকমুন্ট ফ্রয়েড হজরত মুসা ও একেশ্বরবাদ (*Moses and Monotheism*) নাম দিয়া একটি নাতিবৃহৎ বহি বাহির করিয়াছিলেন। ঐ বহির প্রস্তাব অনুসারে হজরত মুসা এয়াহুদি জাতির বহুকীর্তিত একেশ্বর-বিশ্বাসের প্রবর্তক। এই একেশ্বরবাদ জিনিসটি সেকালের মিশরদেশ হইতে আনিয়া এয়াহুদি জাতির মধ্যে প্রবর্তন করিয়াছিলেন তিনিই। সঠিক বলিতে হইলে বলিতে হয় হজরত মুসা নিজে মোটেও এয়াহুদি ছিলেন না, ছিলেন ফেরাউনের দেশ মিশরের লোক। তিনি এয়াহুদি ছিলেন না অথচ এয়াহুদিদের প্রধান কীর্তি ঈশ্বরোপাসনায় এককেন্দ্রিকতা জারি করিয়াছিলেন তিনিই।

মহাত্মা ফ্রয়েড বলিয়াছেন, এই সত্য সত্য হইলে বলিতে হইবে এই দুনিয়ায় জাতিগত শুদ্ধতা বা রক্তের বিশুদ্ধতা বলিয়া কিছুই নাই। এয়াহুদি জাতির উপাস্য যে ঈশ্বর—হিব্রুভাষায় যাহার নাম দাঁড়াইয়াছে এয়াহবে (*YAHWEH*)—তিনিও জন্মসূত্রে এয়াহুদি নহেন—আরব। আরবা ঈশ্বর আর মিশরিয়া নবি, এই হইতেছে—ফ্রয়েড দেখাইয়া দিলেন—এয়াহুদি জাতির ইতিকথা। ইহার সহিত সায়িদ যোগ করিলেন—এয়াহুদি জাতির একমাত্র আশা এই ইতিহাসেই। ইহা যদি সত্য হয় তো সওয়াল উঠিতেছে বিশুদ্ধ এয়াহুদি জাতির লোক লইয়া এসরায়েল রাষ্ট্র গড়িবার গোড়ার মাটিটা কোথায়?

বর্তমানে কে না জানে ফিলিস্তিনদেশে মুসলমান-খ্রিস্টান নির্বিশেষে সকল জাতির শিশু ও কিশোর, যুবা ও বৃদ্ধ ছোট ছোট কঙ্কর হাতে লড়াই করিতেছে বন্দুক, ট্যাংক ও যুদ্ধংদেহি উড়োজাহাজের সঙ্গে। এসরায়েল বসাইয়াছে পাথরের দেওয়াল। এয়াহুদি জাতি ও আরব জাতির বসতি আলাদা করিতে হইবে—ইহাই এই দেওয়াল রচনার ভিত। ফিলিস্তিনি কঙ্কর এই দেওয়াল ভাঙ্গিয়া মহিফুর বা মিহিদানা বানাইবার প্রস্তাব—কথাটি বলিয়াছেন এডোয়ার্ড সায়িদ নিজে নহেন, বরং খ্রিস্টোফার বোলাস নামক একজন এয়ুরোপাবি বুদ্ধিজীবী। ইনি এডোয়ার্ড সায়িদের বহির ভূমিকা লিখিয়াছেন।

বহির উপসংহার লিখিয়াছেন লন্ডনের খ্যাতনামা অধ্যাপিকা জ্যাকুলিন রোজ। মহিয়সী রোজ নিজেও এয়াহুদি জাতির সন্ততি। কিন্তু তিনি এসরায়েল রাষ্ট্রের পৃথক্কীকরণ (apartheid) নীতি অনুমোদন করেন না। তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, ভিয়েনার 'ফ্রয়েড প্রতিষ্ঠান ও জাদুঘর' কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত সায়িদের বক্তৃতা বাতিল করিয়া বড় মাপের ভুল করিয়াছেন। বলা প্রয়োজন বোলাস ও রোজ প্রমুখ ইহারাই অধ্যাপক সায়িদকে এই বক্তৃতা দিতে ডাকিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অজুহাত ছিল খুবই খোঁড়া। মুখে তাঁহারা বলিয়াছিলেন, 'মধ্যপ্রাচ্যে উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণেই' এই বাতিল ঘোষণা করা হইয়াছে।

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা খেপিয়াছিলেন এডোয়ার্ড সায়িদের হাতে ধরা একটি কঙ্কর দেখিয়া। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমি শেষ করিব। ২০০১ সালের মে

মাসে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত এই বক্তৃতার দাওয়াত সায়িদকে দেওয়া হয় প্রায় এক বছর আগেভাগে, মোতাবেক ২০০০ ঈসায়ি সালের জুলাই মাসে। দুর্ভাগ্যবশত পরবছর অর্থাৎ ২০০১ সালে, দিনমান বলিতে ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে, এই দাওয়াত বাতিল করা হয়। কারণ আগের বছরের একটি ঘটনা ও সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া সৃষ্ট প্রচারণা।

এডোয়ার্ড সায়িদ ২০০০ সালের জুন-জুলাই মাসে সপরিবারে লেবাননে বেড়াইতে গিয়েছিলেন। জুলাই মাসের ৩ তারিখ নাগাদ লেবানন রাজ্যের দক্ষিণ সীমানায় পৌঁছাইলেন তিনি। সেইখানে 'খিয়াম' নামক জায়গায় একটি কুখ্যাত এসরায়েলি বন্দিশালা ছিল। ঐ শালায় কয়েক হাজার রাজনৈতিক বন্দিকে হত্যা করা হয়, নির্যাতন করা হয় আরো অনেক মানুষকে। ২০০০ সালে সেই জায়গা হইতে যুদ্ধের কারণে ঐ বন্দিশালা উঠিয়া গিয়াছে। সায়িদ ও সঙ্গের জোয়ান মানুষজন শূন্যস্থান লক্ষ্য করিয়া ঐ দিকে কয়েকটি কঙ্কর ছুঁড়িয়া মারিলেন। সেই শূন্যস্থানে তখন কোন মানুষজনই ছিল না। না সমর-সম্বন্ধীয়, না অন্য ব্যবসা-সম্বন্ধীয়। দুইদিন পর এসরায়েলের পত্রপত্রিকা ও দূরদর্শনে সেই ছবি প্রচারিত হইয়া পশ্চিমে ছড়াইল। সায়িদের পরিচয় দাঁড়াইল 'প্রস্তর নিক্ষেপরত ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসবাদী'। অবশ্য তাঁহাকে অনেক আগেই 'সন্ত্রাসের অধ্যাপক' পুরস্কার দিয়াছিল এসরায়েলি আর পশ্চিমা প্রচার। (খান ২০০৫)

ভিয়েনার 'ফ্রয়েড প্রতিষ্ঠান ও জাদুঘর' সেই কারণেই এই বক্তৃতা বিয়োজন করিলেন। ভিয়েনা হইতে খোদ ফ্রয়েডও একবার লন্ডনে সর্বশেষ নির্বাসিত হইয়াছিলেন। ১৯৩৯ সালে সেখানেই তিনি এন্তেকাল করেন। হয়তো সেই স্মৃতি জিয়াইয়া রাখিবার মানসেই লন্ডনের ফ্রয়েড জাদুঘর একই কায়দায় ভিয়েনায় বিয়োজিত ফ্রয়েড বক্তৃতার আয়োজন শেষমেষ করিলেন খোদ মহানগর লন্ডনেই।

ফ্রয়েড বিপ্লবী রাজনীতি করিতেন এই অপবাদ তাঁহার চরম শত্রুও দিবেন না। এডোয়ার্ড সায়িদও শক্তি প্রয়োগ করিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহা মনে করিতেন না। তাঁহার বক্তৃতায় যেই সত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা যে কোন কঙ্করের সহিত প্রতিযোগিতায় পর্যন্ত জিতিয়া যাইবে। এমনকি কোন কোন বোমার সহিতও ইহার তুলনা চলিবে। তবে এই বোমা মনে হইতেছে আত্মঘাতী হইবে না।

দোহাই

১. সলিমুল্লাহ খান, 'এডোয়ার্ড ওয়াদি সায়িদ ও ফ্রয়েড', দেশবাংলা (ঢাকা, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৫); বর্তমান গ্রন্থের প্রবন্ধ ৬, শিরোনাম আংশিক পরিবর্তিত।

২. Edward W. Said, *Freud and the Non-European*, reprint (London: Verso, 2004).

৬. ———, *From Oslo to Iraq and Road Map: Essays*, Tony Judt, intro, Wadie E. Said, afterword (New York: Pantheon, 2004).

....

উৎস
http://arts.bdnews24.com
ঢাকা, নভেম্বর ২০০৭

৮

আধুনিক ও উত্তরাধুনিক

> Il est vrai que la grande tradition s'est perdue, et que nouvelle n'est pas faite.
>
> *It is true that the great tradition is over, and the new tradition is not founded.*
>
> —Charles Baudelaire (1964: 164–65)

এমন এক যুগ ছিল যখন দেশবাসী জনসাধারণের মাথাপিছু আয় দেখে জাতীয় উন্নতি বা অনুন্নতি মাপা হত। সেই যুগ, খবরে প্রকাশ, আর নাই। তবে পুরানা যুগের জায়গায় নতুন কোন যুগ এল বলা মুশকিল।

জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি বা ইউএনডিপি আয় দেখে উন্নতি মাপার জায়গায় 'নতুন' এক মাপকাঠি ব্যবহার শুরু করেছে। এই কাঠির নাম 'মানব উন্নয়ন' বা মূল ইংরেজি বয়ানে যেমন বলে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (human development)। ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত এক প্রচারপত্র মোতাবেক মানব উন্নয়ন 'সাধারণ মানুষের পছন্দের আওতাবৃদ্ধির পথ'। পছন্দের আওতা—জাতিসংঘ বলছে—কেতাবি হিসাব অনুসারে অনন্ত এবং কালে কালে পরিবর্তনের বিষয়ও বটে।

তবে উন্নয়নের যেই তলায়ই হোক, তিনটি জিনিস না হলে সাধারণের চলবে না। এদের মধ্যে এক নম্বরে পূর্ণ ও সুস্থ পরমায়ুর কথা আসে। দুই নম্বরে আসে বিদ্যাবুদ্ধির কথা। শেষ তথা, তিন নম্বরে আসে ভদ্রজীবনযাপনের উপযুক্ত আয়-উপার্জন বা ধনসম্পত্তির কথা। এসব কথায় কারোরই আপত্তি থাকার কথা নয়।

দুঃখের মধ্যে আপত্তির বিষয় একটি আছে। যখন বলা হয় এই তিন জিনিসের মধ্যেই আপনাকে পছন্দ করতে হবে তখন আপনি কী করবেন? যদি বলা হয়

আপনি আয় ভাল পাবেন কিন্তু আয়ু পাবেন অল্প, নেবেন কি? অথবা যদি বলা হয় বিদ্যাবুদ্ধি অনেক হবে আপনার কিন্তু চিরদিন আপনাকে ফকির থাকতে হবে। নেবেন কি এই পছন্দের ভার? ঘটনা যদি এমন হত যে আপনি ইচ্ছা হয় বেছে নিন, ইচ্ছা না হয় ছেড়ে দিন তবে একটা কথা ছিল। আসল ঘটনা কিন্তু সেই রকম নয়। অন্য রকম।

বাছাই করা বা না করার স্বাধীনতা আপনার হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় নাই। বাছতে আপনি বাধ্য। অথবা বেছে না নেওয়ার কিংবা ছেড়ে দেওয়ার স্বাধীনতা আপনার নাই। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচিও এরূপ্রস্ত বিজ্ঞাপন বৈ নয়। এর পিছনে যেই দাতার (মানে বলছিলাম কি না বিজ্ঞাপনদাতার) দল কাজ করছেন তাঁরা ঘোষণা করেছেন 'মানব উন্নয়ন মানে সাধারণের বাছাই করার সীমা বাড়ানো'। বাছাই করার—মানে কোনটাই না চাওয়ার বা সবটাই চাওয়ার—স্বাধীনতা এই সীমার ভিতর পড়ে না। সেই কথা না বললেও, শুনেছি, অনেকের কাছে পরিষ্কার। (ইউএনডিপি ১৯৯৫)

'পছন্দের স্বাধীনতা' বা 'মানুষের অধিকার' কোন এক যুগে সমার্থক পদজ্ঞানে চালু ছিল। সেই যুগকেই আমরা আধুনিক যুগের সূচনাকাল বলে জানি। আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর হতে চলল—বিশেষ এয়ুরোপ মহাদেশে—রটিত হয়েছে আধুনিক যুগ বা মানুষের অধিকারের যুগ শেষ হয়ে গেছে। অন্যান্যের মধ্যে ফরাসি মনীষী মিশেল ফুকো ঘোষণা করেছিলেন: 'মানুষ' কথাটি তেমন প্রাচীন নয়, সমুদ্রতীরে বালিতে আঁকা মুখের মতন একদিন তা ধুয়েমুছে যাবে। (ফুকো ১৯৯৪: ৩৮৭)

এতদিনে মনে হচ্ছে ফুকোর অতীতবাণী সত্য হতে চলেছে। পছন্দের স্বাধীনতা এখন পছন্দের অধীনতায় উন্নীত হয়েছে। এখন আপনি পছন্দ করতে বাধ্য। পছন্দ না করে আপনার উপায় নাই। এই নতুন যুগের নাম ইংরেজি-ফরাসি জবানে দাঁড়িয়েছে post-modern। আমাদের দেশে সাংবাদিকরা বলেন 'উত্তরাধুনিক'। পছন্দের স্বাধীনতা থেকে শেষ পর্যন্ত আধুনিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। আর এখন পছন্দের অধীনতা অনুসারে আপনি হয় সেই সাম্রাজ্য গ্রহণ করবেন নয়তো তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার নামে 'সন্ত্রাস' করবেন। দুইয়ের এক আপনাকে বেছে নিতেই হবে। বেছে নেওয়া থেকে আপনার পরিত্রাণ নাই। এই পরিস্থিতির নামই দাঁড়িয়েছে 'উত্তরাধুনিক' যুগ।

আমাদের ধারণা আধুনিক ও উত্তরাধুনিক বা সাম্রাজ্য ও সন্ত্রাসের মধ্যে একটা বা অন্যটা বেছে নেওয়ার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হওয়ার স্বাধীনতা সম্ভব কি না তা যাচাই করা হয় নাই। সেই কারণে আধুনিক ও উত্তরাধুনিক দুই নীতিরই পরীক্ষা প্রার্থনীয়। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই পরীক্ষার মুখাগ্নি করছি মাত্র।

আমি তুমি সে

১

ফরাসি মনীষী জাক লাকাঁর বিশ্লেষণ করে স্লোভেনিয়াবাসী পণ্ডিত শ্রীমতী আলেনকা জুপানচিচ এই বিচারের সূচনা করেছেন আলান পাকুলা নির্মিত *সুফিয়ার নির্বাচন* (*Sophie's Choice*) ছবি ভর করে। এই ছবির এক স্থলে সুফিয়াদেবী আপন জরায়ুজাত এক ছেলে ও এক মেয়েসহ আউসভিৎস বন্দিশিবিরে এসে হাজির হন। তখন এয়ুরোপে মহাসমর চলছে। জনৈক জর্মান সেনা-কর্মকর্তা এগিয়ে এসে সুফিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। জানতে চান তিনি কমিউনিস্ট কি না। জবাবে সুফিয়া জানান তিনি কমিউনিস্টও নন, এয়াহুদিও নন। পরিচয়ে তিনি অন্য, একে তো পোলদেশি অন্যধারে খ্রিস্টান ধর্মের ক্যাথলিক মজহাবের সদস্যা। জর্মান কর্মকর্তা তখন তাঁকে বলেন তোমাকে পছন্দের স্বাধীনতা দিচ্ছি। দুই সন্তানের একটি তুমি রাখতে পার। অপরটি আমাদের হাতে ছেড়ে দাও। গ্যাসের চুলায় যাবে ওটা।

তিনি কমিউনিস্ট বা এয়াহুদি, অর্থাৎ অসাধারণ নন। পোলদেশি ও ক্যাথলিক, মানে সাধারণ। এই কারণেই ওঁকে পছন্দের স্বাধীনতা বা মানুষের অধিকার (অথবা মানবাধিকারও বলা যায়) দেওয়া হল। সুফিয়া প্রথম প্রথম গাইগুই করেন। জর্মান কর্মকর্তা বারবার পছন্দের স্বাধীনতা দেওয়া সত্ত্বেও তিনি এই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহারে অস্বীকৃতি জানাতে থাকেন। শেষ মুহূর্তে কর্মকর্তা যখন দুই সন্তানকেই বধ্যভূমির দিকে নিয়ে যেতে আদেশ দিলেন তখন সুফিয়া দুজনের একজনকে বেছে নিলেন।

অন্তত একজন প্রাণে বাঁচুক। কিন্তু এই পছন্দের সময় সুফিয়ার মুখ বেদনায় বাঁকা হয়ে আসে, মনে হয় সে ভেংচি কাটছে। আবহে ভেসে আসে তাঁর কন্যার কণ্ঠ, কান্না ও চিৎকার। চলচ্চিত্রে দেখি শেষমেশ সুফিয়ার নির্বাচনে মেয়েটিই হেরে যায়। সুফিয়াও কাঁদতে পারেন নাই। গ্রাহকযন্ত্রের কল্যাণে আমরা দেখি তাঁর ব্যাদান করা মুখ স্থির। (জুপানচিচ ২০০০: ২১৩–১৪)

যেখানে ভাষার শেষ সেখানেই—আমরা বাংলায় বলি—অনির্বচনীয়ের শুরু। এই অনির্বচনীয়েরই এয়ুরোপীয় নাম—লাকাঁ রেখেছেন—অখিল (real)। তাই অখিল শব্দে আমরা বুঝি নির্বাক বা অবাক। সুফিয়ার নির্বাচন শুদ্ধ সুফিয়াকে কেন আমাদেরও অবাক করে। মানে আমরা গেঁথে (suture) যাই। সুফিয়ার নির্বাচনেরই অপর নাম—আমরা সবিনয়ে সবাক করব—উত্তরাধুনিক যুগ বা মানব উন্নয়ন। মাশাল্লাহ!

সুফিয়া কী পেল, কী হারাল এই নির্বাচনে? দুই সন্তানের জীবনের বদলা হিসাবে যদি সুফিয়াকে নিজ জীবনই দান করতে হত, তো এই নির্বাচনে শরিক হতে হত না

তাঁর। কিন্তু সেই সুযোগ তাঁর নাই। জীবন অতি তুচ্ছ জিনিস নয়। সেটাও সই। দেওয়া যায় সেই অমূল্য জীবনও। কিন্তু সুফিয়াকে যা দিতে হয়েছে তা জীবন নয়, জীবনের অধিক কিছু। আমাদের বঙ্গভাষায় এর নামই ভক্তি।

জীবন আমার আছে, প্রয়োজন হয় দিতে পারি। কিন্তু আমাকে এখানে দিতে হয়েছে এমন কিছু যা আমার নাই, যার মালিক আমি নই। জীবন আমার হাব (have)। মানে আমার জীবন আমার কাছে আছে। কিন্তু 'আমি' যে আমার হাব নই, ভাব (being)। অর্থাৎ আমার ভাব আমার কাছে নাই। সুফিয়াকে এই খোদ ভাবই দিতে হয়েছে। হাব যদি মৃত্যুর এই পারে হয়, ভাব জীবন-মৃত্যুর ঐ পারে। কেবল হাবই নির্বাচনের আওতায় পড়ে, মানুষের স্বাধীনতার তালিকায় ওঠে। ভাব নয়। ভাব নির্বাচনের পরপারে। ভাব মনুষের অধিকারের অংশ নয়।

মানুষকে যখন এমন জিনিসও দিতে বাধ্য হতে হয় যা তার নিজ বা ভাবসম্পদ নয় তখনই ভাষা বা বাক হয়ে ওঠে অবাক। তাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমাদের যুগকে বলা হচ্ছে এই অবাক নির্বাচনের যুগ বা উত্তরাধুনিক।

এই পরিস্থিতির সামনে আমাদের করার কিছু নাই। এই কথা বলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে উত্তরাধুনিক মানে 'নিজ জীবনের বাইরে আর কিছু নাই'—এই জ্ঞান। বহুধাবিভক্ত (plural), ছড়ানোছিটানো (local) এবং মুখামুখি (immanent) উত্তরাধুনিক নীতির এই বৈশিষ্ট্য কি আধুনিক নীতির বিকল্প? মোটেও নয়। সুফিয়ার সামনে নিজের প্রাণ বিসর্জনের স্বাধীনতাও নাই কেন? কারণ স্বাধীনতা বা নির্বাচনের ছদ্মাবরণে উত্তরাধুনিক যুগ সন্ত্রাসবাদী।

২

আমাদের প্রস্তাব উত্তরাধুনিক সন্ত্রাসের সঙ্গে আধুনিক ত্রাসের বা সাম্রাজ্যের যোগ নিবিড়। তাই বিকল্প অনুসন্ধানের আগে পরীক্ষা করা দরকার আধুনিক নীতিই বা কী বস্তু? জাক লাকাঁ দেখাচ্ছেন আধুনিক নীতির উদ্ভবের সঙ্গে উত্তম পুরুষের (ego) ত্রাস কিংবা স্বৈরাচার জড়িত। উদাহরণটা তিনি দিয়েছেন প্রাচীন গ্রিসের আন্তিগোনে নাটক সম্বল করে।

রাজা ক্রেয়ন আদেশ করেছেন যুদ্ধে নিহত আক্রমণকারী পলিনিকেসকে যথানিয়মে কবর দেওয়া যাবে না। দেওয়ার চেষ্টা করলে নিশ্চিত শাস্তি মৃত্যু। তা জেনেশুনেই আন্তিগোনে সিদ্ধান্ত নেন তিনি আইন অমান্য করবেন। এই আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিতে আন্তিগোনের অপর বোন ইসমেনে রাজি হন না। আন্তিগোনের নির্বাচনও এক প্রকার অসম্ভব নির্বাচনই। মৃতের প্রতি কর্তব্য পালনের বিনিময়ে নিজেকেও মৃত বানাতে হবে। আন্তিগোনের নির্বাচন এই দুই বিকল্পের

মধ্যে। প্রথম বিকল্প—কর্তব্য বা পারিবারিক দায়। জাক লাকাঁ বলেছেন এরই নাম শুদ্ধ বাসনা (desire)। দ্বিতীয় বিকল্প—আত্মরক্ষা বা রাষ্ট্রের দায়। এর অপর নাম কাপুরুষতা বা কর্তব্যে বিচ্যুতি (bad faith) যা বাসনার বেচাকেনায় রাজি হয় নাই। অনন্ত বাসনার বিনিময়ে সে এক বাসনাকেই সঙ্গী করেছে।

জর্মান পণ্ডিত হেগেলসুদ্ধ অনেক মনীষী আন্তিগোনের সৌন্দর্যের ও সাহসের তারিফ করেছেন। কিন্তু তাঁরা বলেছেন ক্রেয়ন ও আন্তিগোনে দুজনই দুই দিক বিচারে সঠিক। একজন পরিবারের (তথা দিব্য) কর্তব্য পালন করেছেন: কারণ ভাইয়ের কবর দেওয়া বোনের দিব্য কর্তব্য। মানুষের সৎকার মানুষের কর্তব্য, ফরজ। আরজন রাষ্ট্রের (তথা সমাজের) কর্তব্য করছেন: বিদ্রোহীর শাস্তি দেওয়া, আইন অমান্যকারীর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া রাষ্ট্রের কর্তব্য। দুই নীতির সংঘাতে সমানে সমান লড়াই হয়েছে। তাই এই সংঘাতের নাম—হেগেল বলেন—ট্র্যাজেডি। নীতির সঙ্গে নীতির বিয়োগ ঘটেছে এই নাট্যকর্মে। এই বিয়োগ অমোঘ।

এই নাটকের বিচারে জাক লাকাঁ অন্য কাঠি ব্যবহার করেছে। তিনি দেখাচ্ছেন এখানে ক্রেয়নের যুক্তি আধুনিক মানুষের বা উত্তম পুরুষের যুক্তি। উত্তম পুরুষের যুক্তির সবচেয়ে সংহত প্রকাশ ঘটিয়েছেন সতের শতাব্দীর ফরাসি পণ্ডিত রনে দেকার্ত। দেকার্তের বিখ্যাত উক্তি: 'আমি ভাবি, তাতেই প্রমাণ আমি সত্য'—উত্তম পুরুষের বা বক্তার অহঙ্কার (অহম মানে আমি) বা আমিত্ব প্রকাশ করে। যখন কোন উত্তম পুরুষ বলেন 'আমি বলছি আমি মৃত' তখন বোঝা যায় উদ্ধারচিহ্নের ভিতর ব্যবহৃত দুই 'আমি' এক 'আমি' নয়।

যে মানুষই ভাষায় কথা বলে বা সবাক হয় তাকেই ভাষার অধীনতা স্বীকার করতে হয়। তাই সে যখন ভাবে তখন প্রমাণ হয় ভাষাই সত্য—আমি তার উপসত্য মাত্র। ক্রেয়ন যে রাজা বা আইনের বিধাতা সেই সত্যও সেই রকমই উপসত্য বৈ নয়। যেই লোক বলে 'আমি ভাবি তাই আমি রাজা' অথবা 'আমি আইন জারি করেছি তাই আমি রাজা' সেও সেই লোকের মতন, যে বলে 'আমি আইন জারি করেছি তাই আমি মৃত।' জীবিত মানুষ রাজা হতে পারে না, যেমন পারে না ভাষা হতেও। রাজা, আইন ও ভাষা সবই নিশানা মাত্র। অর্থাৎ মৃত। যে লোক মনে করে আমি রাজা, তার চেয়ে বড় উন্মাদ পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নাই।

এই অর্থে ক্রেয়ন লোকটাও ছিলেন উন্মাদ। অথচ হেগেলের মতন মনীষীও বিষয়টি ধরতে পারেন নাই। কারণ খোদ দেকার্তের মতন হেগেলও বুঝে উঠতে সমর্থ হন নাই মানুষ—ভাষার অধীন মানুষ—মাত্রই দ্বিধাবিভক্ত, বিভাজিত। একজন উত্তম পুরুষের ভিতর একই সঙ্গে একটি নামপুরুষও বাস করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে উত্তম, মধ্যম ও নাম তিন পুরুষ তিন শাসনে বাস করেন। শাসনের ইংরেজি প্রতিশব্দ এখানে রেজিস্টার (register), আর তার ফারসি সেরেস্তা। ক্রেয়ন এই সত্যের সন্ধান পান নাই। দেকার্তও পান নাই। হেগেলও না।

তবে হেগেল যা পেয়েছিলেন তার মধ্যে উত্তম ও অধমের লড়াই বিষয়টা আছে। উত্তমের শাসন সেরেস্তা থেকে দেখলেও হেগেল অধমের শক্তিটা টের পেয়েছিলেন। হয়তো সেই জন্যই তিনি আন্তিগোনের তারিফ না করে পারেন নাই।

জাক লাকাঁর মতে, হেগেলও তার পরও যথেষ্ট করেন নাই। ক্রেয়ন নিজেকে বিধাতা ভাবলেন। আন্তিগোনের স্পর্ধা অনুসারে মানুষ মাত্রেই অধম, কেউই বিধাতা নন। সুতরাং ক্রেয়নকেও নেমে আসতে হবে অধমের, নামের সারিতে। অথচ ক্রেয়ন ভেবেছেন, আন্তিগোনে আইন অমান্য করে নিজেকেই পাল্টা উত্তম পুরুষের আসনে বসিয়েছেন। প্রভু বা উত্তম পুরুষ যে আসলেই ফাঁকাবুলি এই সত্য ক্রেয়ন বুঝতে পেরেছেন অনেক দেরিতে, যখন আর সংশোধনের সময় নাই তখন।

আন্তিগোনের নির্বাচন ইউএনডিপি ঘোষিত পছন্দের আওতা কিংবা সুবিধার নির্বাচন নয়। আন্তিগোনের সামনে ছুঁড়ে দেওয়া নির্বাচন নিছক জবরদস্তির নির্বাচন ছিল, অন্তত তাঁর বোন ইসমেনের চোখে তেমনই ঠেকেছিল এই নির্বাচনের প্রকৃতি। নির্বাচন কর বেছে নাওঃ হয় আইন, নয় মৃত্যু। দেখা গেল আন্তিগোনে শুদ্ধ মৃত্যু বেছে নেয় নাই। সে দানও উল্টে দিয়েছে। সাধারণের চোখে মৃত্যু বেছে নেওয়া অসম্ভব। সেই অসম্ভবকে পরিহার করাবার জন্যই কিন্তু এই নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। নির্বাচনের স্পর্ধা কবুল করে আন্তিগোনে অবাক করলেন সবাইকে। আন্তিগোনের নির্বাচন নেহায়েত বেহাত পছন্দ নয়। নির্বাচনের শিকার মাত্র নন তিনি। খেলার নিয়মই পাল্টে দিল তাঁর নির্বাচন।

প্রথমে তিনি মৃত্যু নির্বাচন করলেন। এর ফলে ইসমেনে বাধ্য হলেন নিজেকে কাপুরুষ প্রমাণ করতে। দুই নম্বরে আন্তিগোনের মৃত্যু ক্রেয়নকে বাধ্য করল নিজেদের সিদ্ধান্ত পাল্টাতে। ক্রেয়ন নিজ থেকেই যদি বুঝতে পারতেন তো তাকে বীর বলা যেত। কিন্তু অন্ধ তিরেসিয়স তিরস্কার না করা পর্যন্ত তিনি বুঝতে পারেন নাই তিনি শাঁখের করাতেই পড়েছেন। তাঁর দশা হয়েছে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের মতন। বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

আন্তিগোনের পথ সন্ত্রাসের পথ নয়। একই সঙ্গে তা আবার মহাত্মা গান্ধির দ্বিতীয় সংস্করণ মাত্রও নয়। আন্তিগোনের আহ্বানঃ ক্রেয়ন তুমি উত্তম পুরুষের অহঙ্কার ছেড়ে অধম বা নামপুরুষ হও, দশের একজন হও। অথচ ক্রেয়ন নিজের রাজ্যভার ছাড়তে রাজি হন নাই। নিজের ভিতরের ফাটলটি বুঝতে অস্বীকার করলেন তিনি এবং পরিণামে আমরা দেখলাম সাম্রাজ্যের ভগ্নদশা।

৩

আধুনিক সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে। দেকার্ত এই যুক্তির বিশুদ্ধ প্রবর্তক। এই যুক্তি অনুসারে মানুষ মানে সেই প্রাণী যে ভাবে। তাই সে 'আশরাফুল মখলুকাত'। এই যুক্তিতেই মানুষের মধ্যে বিরাজমান আশরাফ-আতরাফ বিভক্তি নতুন বৈধতা লাভ করে। তথাকথিত মানবধর্ম (humanism) আসলে এই আশরাফ ধর্মেরই নতুন নাম ছিল। এই মতবাদই ক্রমে ক্রমে পৃথিবীব্যাপী ধনতন্ত্রের প্রসার ও প্রতিষ্ঠা সম্ভব করেছে। সাম্রাজ্য বলতে আমরা এই ঘটনারই নির্দেশ করছি। পণ্ডিত হেগেল এর মধ্যে উত্তম পুরুষের প্রতিষ্ঠা দেখেছিলেন। আন্তিগোনের মধ্যে তিনি নতুন আশরাফ শ্রেণীর ছায়া দেখেন। বলা বাহুল্য সেই বস্তু শুদ্ধ তাঁর বিভ্রম।

এখন এয়ুরোপ ও আমেরিকায় যেই পণ্ডিতরা আধুনিক যুগের অবসান ঘোষণা করেছেন তাঁরা আন্তিগোনের মধ্যে সন্ত্রাসবাদীর ছায়া দেখলে আমরা বিস্মিত হব না। আদর্শের জন্য যারা অকাতরে প্রাণ দেন তাদের আমরা বীর বলে থাকি। ফরাসি বিপ্লবের সময় দাগি অপরাধীরাও সাহস প্রমাণ করার জন্য প্রতিযোগিতা করে গিয়োতিনের সামনে মাথা পেতে দিত। কবি বোদলেয়ার তাতে সৌন্দর্য দেখতে পেয়েছেন এবং তার নাম দিয়েছেন 'আধুনিক সুন্দর'। (বোদলেয়ার ১৯৬৪) আন্তি গোনের মধ্যেও অনেকে এই সুন্দরকে দেখেছেন।

আমরা দাবি করব, আন্তিগোনের সুন্দর সুন্দরেরও অধিক। তার মধ্যে ন্যায়ের আভাস আছে। এই আভাসেই প্রমাণ আধুনিকের বিকল্প উত্তরাধুনিক নয়, সাম্রাজ্যের বিকল্প সন্ত্রাস নয়। এই উভয়েরই বিকল্প ন্যায় আছে। আন্তিগোনের পথে সেই ন্যায়ের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অথচ উত্তরাধুনিক মতবাদের বেনামি—যেমন ফুকো—বা স্বনামি প্রবক্তারা—যেমন লিওতার—এই সত্য স্বীকার করতে রাজি হবেন না।

আন্তিগোনের মৃত্যুদণ্ড স্থির হয়ে গেছে। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে গাওয়া তাঁর বিলাপগীতিটি বহু বোদ্ধা পড়ুয়ার পর্যন্ত মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। এমনকি মহাত্মা গ্যেটে পর্যন্ত রায় দিয়েছেন *এই গীতিটি জালিয়াতিতে*। এমন লেখা সোফক্লেসের হতে পারে না। কেন? এই গীতিকায় অসম সাহসী আন্তিগোনে অনুযোগ করে বলছেন: আহা, আমার তো বাসর রাত হবে না, প্রিয়ের বাহু আমাকে কোনদিন জড়াবে না, কোলজুড়ে কোনদিন শিশুও আসবে না, বধূবরণের ডালা থেকে কেউ পুষ্পবৃষ্টি করবে না...।

কী কী তার হবে না সেই তালিকা অফুরন্ত। তারই অপর নাম বাসনা। সেই বাসনা কখনো পূরণ হবে না। সেই বাসনা পরিমাপের অযোগ্য। আন্তিগোনে এখন

এই জীবনের ভাষায় গান গাইলেও তার এক পা পড়েছে জীবন ও মৃত্যুর পরপারে, যেই জগৎ তার সীমানায়। সেখান থেকে দেখলে পার্থিব অপার বাসনা, অসীম বাসনাও পরিমাপের যোগ্য হয়ে ওঠে। পরম বাসনা তাকেই বলে যার বলে অসীম হয়ে ওঠে সসীম।

ইমানুয়েল কান্ট বলেছেন মৃত্যুর পরে জীবন অনন্ত হবে এই বিশ্বাস অর্থহীন হত যদি না মানুষ এমন এক পরমেশ্বর কল্পনা করতেন যিনি এই অনন্তকেও অন্ত দিতে পারেন, পরিমাপ করতে পারেন। জাক লাকাঁও বলেছেন, আন্তিগোনের বাসনা আর মহাত্মা কান্ট-কল্পিত পরমেশ্বর বা সর্বোচ্চ মঙ্গলও একই বস্তু। আন্তিগোনের বাসনা না শেষ বিচার ছাড়া এই পৃথিবীর অন্তহীন বাসনার কোন উপশম নাই। সেই অন্ত থেকেই—যাকে শেষ বিচারের মালিক বা ইচ্ছাপ্রভু বলা হয় সেই পরমেশ্বরের দৃষ্টিকোণ থেকেই—কেবল অনন্তের পরিমাপ করা সম্ভব।

মনে রাখা চাই অনন্ত মানে অন্তের অ (বা অভাব) নয়। অনন্তের নতুন অর্থ অ-এর অন্ত বা অভাবের অন্ত বা বাসনার অন্ত। এতদিন আমরা জানতাম—অবশ্যই জাক লাকাঁর কারণে—বাসনার নাম অনন্ত। এখন আমরা জাহির করব অনন্তের (অ-এর অন্তের) অপর নামই পরম বাসনা। আন্তিগোনে সেই বাসনার চরিত-কথা বৈ নয়।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই নীতি বটে, কদাচ সন্ত্রাস নয়। কারণ সন্ত্রাস মানে সাম্রাজ্যের ছুঁড়ে দেওয়া নির্বাচন, ইউএনডিপির পছন্দের বাধ্যবাধকতা। পছন্দের শিকার হওয়া আর সন্ত্রাসের পথ ধরা সমার্থক। আন্তিগোনের পথ বিকল্প সত্যের সম্ভাবনার ইশারাও দেয়।

এই পথ মানে খোদ সাম্রাজ্যের আঙিনায় বল ছুঁড়ে মারা। সাম্রাজ্যকেই বাধ্য করা, 'পছন্দের স্বাধীনতা' তার হাতে তুলে দেওয়া। ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে মোরশেদ শফিউল হাসানের একটি বই আছে, নাম: *অবাক নাম ভিয়েতনাম*। ভিয়েতনাম অবাক নামই বটে। আন্তিগোনের মতনই সেও বল ছুঁড়ে দিয়েছিল সাম্রাজ্যের হাতে।

পছন্দের স্বাধীনতা আমরা হারিয়েছি। কিন্তু সাম্রাজ্য এখনো সেই স্বাধীনতা অর্জন করে নাই। আধুনিক যুগের অবসান হয়েছে কিন্তু নতুন যুগের সূত্রপাত এখনো হয় নাই। মাঝখানের বিকার বা সঙ্কট আপাতত 'উত্তরাধুনিক' নামে চলছে। তো চলতে থাকুক।

ঘরে বসে যেই বেটা নিজেকে রাজা ডাকে তাকে যেমন রাজা মানা যায় না, তেমনি যুগের শাসনশক্তি নিজের যেই নাম দেয় সেই নামে তাকে ডাকতে হবে এমন কোন কথা নাই। এখনো আধুনিক যুগই চলছে ছদ্মনামে, যেমন সাম্রাজ্যও চলছে সন্ত্রাসের ছাতার আড়ালে।

পছন্দের স্বাধীনতা যেই দিন সাম্রাজ্যের হবে—আমরা আশা করি—সেই দিন উত্তরাধুনিক ছদ্মযুগেরও কবর হবে।

দোহাই

১. Charles Baudelaire, 'On the Heroism of Modern life', in *Flowers of Evil and other works/ Les fleurs du mal et oeuvres choisies*, Wallace Fowlie, trans. and ed. (New York, 1964).

২. Michel Foucault, *The Order of things: An Archaeology of the Human Sciences*, Anonymous, trans., reprint (New York, 1994).

৩. Jacques Lacan, *Ethics of Psychoanalysis: The Seminar of Jacques Lacan, Book VII*, Jacques-Alain Miller, ed., Denis Porter, trans. (New York, 1997).

৪. United Nations Development Programme (UNDP), *Gender and Human Development: Human Development Report 1995* (New York, 1995).

৫. Alenka Zupancic, 'Lacan's Heroines: Antigone and Synge de Coufontaine', in Slavoj i ek, ed., *Jacques Lacan: Critical Evaluations in Cultural Theory* (London, 2003), pp. 276–290.

৬. --------, *Ethics of Real: Kant, Lacan* (London, 2000).

....

উৎস

'কালের খেয়া', ৮৯, সমকাল ॥ ঢাকা, ৬ এপ্রিল ২০০৭

লালন ফকির

৯

আরশি নগর কেমন শহর?

বিষয় ফ্রয়েডের আবিষ্কার ও মহাত্মা লালন ফকির

এই লেখার বিষয় মহাত্মা লালন ফকির। তবে মালিকের অনুমতি পাই তো প্রথমে বন্দনা করি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রখ্যাত রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ প্রফেসর সনজীদা খাতুন একদিন মনের দুঃখে লিখেছিলেন:

> উনিশ শ একষট্টিতে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর বিশ্বব্যাপী আয়োজন এদেশে রবীন্দ্রসঙ্গীতপ্রীতি পুনরুজ্জীবিত করল। এ সময়ে বাধা অগ্রাহ্য করেও ঐতিহ্য রক্ষা করার অকৃত্রিম (sic) আগ্রহ লক্ষিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর যে শ্রোতৃসমাবেশ তাও সর্বসাধারণের সমাবেশ নয়—শিক্ষিতজনেরই সমাবেশ। আজেই এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে আমাদের দেশেও শতবর্ষের রবীন্দ্রসঙ্গীত সাধারণ সঙ্গীত হতে পারল না। (খাতুন ১৯৯৪: ২৭)

কিন্তু কেন? জবাবে সনজীদা খাতুন যা লিখেছেন তা—আমার বিবেচনায়—সাধারণের কৌতূহল মেটাতে পারে। আমি তাই—যতদূর রচনার কলেবর বড় না করে পারি—সনজীদার জবানি শুনব। 'রবীন্দ্রসঙ্গীত', সনজীদা লিখেছেন:

> বাংলা গানের সাগরপ্রবাহে মিলিত একটি বহু শাখাবিশিষ্ট স্রোতস্বিনী। বাংলাদেশের উচ্চাঙ্গ ও লোকসঙ্গীত এবং আংশিকভাবে পুরনো বাংলা গান থেকে উপযোগী রস গ্রহণ করে আপন প্রকৃতি অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীতের ভাণ্ডার পূর্ণ করেছেন। বিশেষ করে সুরের দিক থেকে বিচার করলে এই কথা দাঁড়ায়।

'তাহলে'—সনজীদা জিজ্ঞেস করছেন—'এই বাংলাদেশেরই সুর ছেনে যে সুরলোকের সৃষ্টি তার সঙ্গে সাধারণের যোগটা বিচ্ছিন্ন হল কিসে?' (খাতুন ১৯৯৪: ২৮) একইসঙ্গে সনজীদা খাতুন মনে করেন রবীন্দ্রনাথ 'বাণীর দিক থেকেও বাঙালী সংস্কৃতির সন্তান।' 'রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী সাধারণের চিত্তে সাড়া জাগাতে পারছে

না কেন', সনজীদা অকপটে কবুল করেন, 'তা, বিস্ময়ের কথা বটে।' বিস্মিত প্রফেসরের জিজ্ঞাসা:

> কিন্তু বাউল গানের বাণীর রহস্যময়তা যে দেশের সাধারণ মানুষের চিত্ত স্পর্শ করেছে—কীর্তনের ভাবাবেগে যে সাধারণ চিত্তকে উদ্বেলিত করেছে—রবীন্দ্রনাথের গানের ক্ষেত্রে সেই চিত্তের জড়তা কি সত্যিই স্বাভাবিক ব্যাপার? এর পেছনে গভীরতর কারণ নিহিত নেই? (খাতুন ১৯৯৪: ২৮)

'গভীরতর কারণ'—ভাগ্যের বিষয়—সনজীদা খাতুন জানিয়েছেন আমাদের। তাঁর মতে, সাধারণভাবে সঙ্গীতমুগ্ধ শ্রোতা বা বিশেষ কোন ধারার সঙ্গীতরসিকের পক্ষেও রবীন্দ্রসঙ্গীত-রসোপলব্ধির জন্য ভিন্ন ধরনের চেতনা প্রয়োজন। সেই চেতনার অভাবই—এই প্রখ্যাত রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞের মতে—সাধারণ মানুষের চিত্তের জড়তার পিছনে নিহিত গভীরতর কারণ।

এই কারণের দুই ভাগ বিবেচনায় নিয়েছেন সনজীদা খাতুন। এক নম্বরে সুর। দুই নম্বরে বাণী। তিনি বিশদ করেছেন:

> লোকসঙ্গীত বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রচয়িতা একজন নন। ভিন্ন ভিন্ন জনের সৃষ্টি হয়েও সেইসব সঙ্গীত আপন বিশেষ ধারার সঙ্গীতরূপেই স্বীকৃত। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে অবস্থাটি সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ, এই বেলা বিভিন্ন শ্রেণীর বা ধারার সুর একজনের হাতে এমন বিশেষ একটি অবয়ব পাচ্ছে—যাতে সেই একজনের সৃষ্টি বলে চিহ্নিত হয়ে পড়েছে। (খাতুন ১৯৯৪: ২৮)

তারপর আসে গানের বাণী। সনজীদার বিশ্বাস:

> বাউল বা কীর্তন গানের ভাব এদেশে বহুদিন ধরে প্রচলিত সুপরিচিত ভাব। তার মর্মগ্রহণের জন্য নতুন চিন্তা বা বোধশক্তির প্রয়োজন নেই। এবং যত গীতকারই বাউল বা কীর্তন রচনা করুন না কেন—গানের ভাব সেই এক চিরপুরাতন। অথচ, রবীন্দ্রনাথের গানের কথায় তাঁর শিক্ষিত ও মার্জিত চিন্তা ও বোধ ভিন্ন গানে ভিন্নভাবে ধরা দিচ্ছে। প্রতিটি গানই বিভিন্ন ভাবের বাহন, গান হয়েও কবিতা আর ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধির আকর। (খাতুন ১৯৯৪: ২৯)

তাই তাঁর সিদ্ধান্ত—রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী সাধারণের চিত্তে সাড়া জাগাতে পারছে না—বিস্ময়কর নয়। 'রবীন্দ্রচিন্তা এবং ভাবকল্পনার সঙ্গে পরিচিত শিক্ষিত চিত্তের কাছে এই কাব্যগীতি যতখানি ভাব ও রসে পূর্ণ, সাধারণের কাছে তেমন হওয়া দুষ্কর।' (খাতুন ১৯৯৪: ২৯)

রবীন্দ্রনাথের কাব্যগীতি বিষয়ে আমার কোন মন্তব্য নাই। তবে 'রবীন্দ্রচিন্তা এবং ভাবকল্পনার সঙ্গে পরিচিত শিক্ষিত চিত্ত' যে কি প্রকার ভাব ও রসপূর্ণ তার কিঞ্চিৎ আভাস সনজীদা খাতুনের আলোচনায় পাওয়া যায়। তাঁর সরলতায় আমি মুগ্ধ।

বাংলা জগতের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকেই এই রকম ভাবেন। সরল সনজীদা খাতুনের মতন দু-একজন মাত্র সাহস করে সেই ভাবনা লেখেন। তাই এতটা ঘটা করে আমরা তাঁর কহতব্য নকল করলাম।

১

আমার ধারণা, ভদ্রশ্রেণীর লোকমহিলারা যাকে বাউল বা কীর্তন গান বলে নির্দেশ করেন 'তার মর্মগ্রহণের জন্য নতুন চিন্তা বা বোধশক্তির প্রয়োজন নেই'—এই কথাটা একটু অতিরঞ্জিত। নিজের এন্তেকাল সংবাদ শুনে আমেরিকার বিখ্যাত গল্প লেখক মার্ক টোয়েনও—শোনা যায়—বলেছিলেন, 'খবরটা একটু অতিরঞ্জিত'। মহাত্মা লালন ফকিরের একটি পরিচিত গানের অংশবিশেষ বিচার করে আমি দেখাতে চাই—তার মর্মগ্রহণের জন্য একটু-আধটু নতুন চিন্তা বা বোধশক্তি সম্ভবত অপ্রয়োজনীয় নয়। মহাত্মার 'এদেশে বহুদিন ধরে প্রচলিত' একটি গানের নজির দিয়ে শুরু করা যাক। লালন গেয়েছেন:

> বাড়ির কাছে আরশি নগর
> সেথায় এক পড়শি বসত করে
> আমি একদিনও না দেখিলাম তারে ॥

ফকির জিজ্ঞেস করেছেন—আরশি নগর কেমন শহর? আর এর নাগরিক পড়শিটাই বা কেমন জীব? গত শত-দুইশত বৎসরে এর সন্তোষজনক কোন জবাব কেউ কি দিয়েছেন? আমার প্রস্তাব জর্মান ভাষার মনীষী ফ্রয়েডের আবিষ্কারকে লালনের প্রশ্নের উত্তরজ্ঞানে দেখা যায়। লালন ফকিরের আরশি নগর ফ্রয়েড-কথিত 'অচেতন' বা অজ্ঞান নামক ধারণার অপর নাম। আর লালন অভিহিত 'পড়শি' ফ্রয়েড-পন্থিক জাক লাকাঁ প্রস্তাবিত 'অপর' বৈ নয়। লাকাঁ দুই অপরের কথা পেড়েছেন: বড় অপর ও ছোট অপর। লালনের পড়শি 'বড় অপর'কেই নির্দেশ করে। চলতি বাংলায় একে 'পরম' বলা হয়। এই বিষয়ে পরিষ্কার ধারণার জন্য লাকাঁর হাদিস আলোচনা না করে গতি নাই।

'অচেতন' কী বস্তু? ফ্রয়েড এই বস্তু আবিষ্কার করেছেন প্রায় একশ বছর আগে। সেই আবিষ্কারের তাৎপর্য অনেকদিন মানুষের অধরা ছিল। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগে ফরাসিদেশের ডাক্তার জাক লাকাঁ আবার ফ্রয়েড-আবিষ্কার করেন। ফ্রয়েডের আবিষ্কারের অর্থ লাকাঁই নতুন করে ধরিয়ে দেন। লাকাঁর মতে, এই আবিষ্কার মনুষ্যজাতির চিন্তায় একটি বড় আকারের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। লাকাঁ শুরু করেছেন ফরাসি দার্শনিকদের রাজা দেকার্তের নামে। আমি কে?—এই প্রশ্নের উত্তরে দেকার্ত

বলেছিলেন: 'আমার ভাবনাতেই আমার পরিচয়।' এই যে আমি প্রশ্ন করি সে-ই তো আমি। আমি যে প্রশ্ন করি তার উপর আবার প্রশ্ন হয় কি? জর্মান দার্শনিকদের বাদশাহ হেগেল পর্যন্ত মূল উত্তরের একই ধারা। আমার চেতনাতেই আমি নিষ্পন্ন—*মনের কাণ্ডকারখানা* (*Phenomenology of Spirit*) নামক কেতাবে হেগেলের প্রতিপাদ্যও তাই। লাকাঁ দেখিয়েছেন, ফ্রয়েডের আবিষ্কার অনুসারে এই পুরাতন প্রশ্নের সম্পূর্ণ নতুন জবাব মেলে। আমি কে? আমি আমি নই, অন্য কেউ। আরো কড়াকড়ি বলতে: আমি ও আমার অপর মিলে আমি একটা অন্য কিছু। আমার ভাবনাতেই কেবল আমার পরিচয় লুকিয়ে থাকে না—থাকে আমার নির্ভাবনায়, আমার অচেতনেও। লালনের বাক্যে বলতে, আমি ও আমার পড়শি মিলেই 'আমি-নই' নামক নতুন 'আমি'।

বিশদ করা যাক। একলা মানুষের কোন অচেতন নাই। শুদ্ধ পড়শির স্পর্শে আসার পরই অচেতন তৈরি হয়। সেই বিচারে মানুষ মানুষ হয়েছে নিজের প্রতাপে নয়—হয়েছে পড়শির গুণে। একইভাবে মানুষের মনুষ্যত্ব দাঁড়িয়েছে নিছক জীবনের আদরে নয়, মৃত্যুর ডাকেও। মানুষের পড়শি তার বাইরে নয়, ভিতরেও জুড়ে আছে। ফ্রয়েডের আবিষ্কারের এটাই তাৎপর্য। বড় কথা এই পড়শির সঙ্গে তার কখনো দেখা হয় না।

> সে আর লালন এক সাথে রয়
> তবু লক্ষ যোজন দূরে

কেন হয় না? লাকাঁ বলেছেন: 'মানুষের ভিতরের যেইটুকু তার নিজের হয়েও তার নিজের নয় সেই বস্তুকেই অচেতন বলে।' (লাকাঁ ১৯৭৮: ১৯১) তো সে আর লালন এক সঙ্গে থাকে কোন সুবাদে? থাকে বাদের সুবাদে। 'বাদ' মানে 'বাত', মানে 'কথা'র সুবাদে। মানুষের অচেতন সদা-সর্বদা বিরাজমান। কারণ, মানুষ বাতচিত করে। অচেতন বাতের ভিতরে এবং বাতের কাঁধে ভর দিয়ে চলাচল করে। কিন্তু মানুষের সঙ্গে তার দেখা হয় না। কারণ কী? কারণ মানুষ কথা বলে, কিন্তু তার অর্থ বুঝতে সে সক্ষম নয়।

কথার অর্থ গোপন থাকে দুই কারণে। পয়লা মানুষ ভাষা তৈরি করে না, শেখে। ভাষার অর্থ মানুষের অধরাই থাকে। দুই নম্বর কথা, দেকার্তের 'আমি' যেই পাহারা বসায় তা ভেদ করে কথা ভাষায় ঢুকতে পারে না। লাকাঁ বলেন:

> এই উদাহরণ অনুসারে মানুষের ভাষার জগৎ এই স্থলে দুই টুকরা হয়ে যায়—এক টুকরা হাতের প্যাঁচ, চেনাশোনার ভিতর থাকে। আর টুকরা হাতের নাগালে থাকে না, থাকে অন্যখানে বাঁধা। (লাকাঁ ১৯৭৫: ২২০)

ফ্রয়েডের আবিষ্কার অনুসারে মানুষের স্বাধীনতার বুলি ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। মহাত্মা রুসো দাবি করেছিলেন, মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মায় আর সবখানে সে শিকলে

আটকা পড়ে। লাকাঁর ব্যাখ্যা যদি ঠিক হয় তবে রুসোর দাবিও একটু অতিরঞ্জনের দোষে দুষ্ট। মানুষের জন্ম অসহায় অবস্থায় এবং মানুষ হওয়ার শর্তই—অর্থাৎ ভাষা ব্যবহার করাই—এই বন্দিত্বের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত।

মানুষ ভাষা ব্যবহার করবে অথচ ভাষার আচার মানবে না—তা কী করে হয়? লাকাঁ বারবার বলেছেন, অচেতনের গড়ন হুবহু ভাষার মতন। ভাষার উপর ভরসা করেই তো মানুষ কথা বলে। কিন্তু মানুষ যা বলে, ভাষা নিজে বলে তার শতগুণ। মানুষ বাবু, ভাষা পারিষদদল। চেতন যত বলে অচেতন বলে তার শতগুণ।

আমার 'আমি' যা বলে তা তো বলেই। কিন্তু 'আমি' যা বলে না, তা-ই আরো বেশি বলে। অচেতনের ভাষা অবশ্য 'আমি'র ভাষার হুবহু নকল নয়। সেই ভাষার নিয়মই আলাদা। সেই ভাষা ছড়ানো, সেই ভাষায় 'না' নাই এবং বড় কথা সেখানে আছে মৃত্যুর বাসনা। চেতন জগতের মতন সে মৃত্যু ভয়ে ভীত নয়। সব কথার শেষ কথা: ভাষাই মৃত্যু। অচেতন মৃত্যুর ভয়ে ভীত নয়, তাই ভাষার সত্য বা মৃত্যুময় নৃত্য অচেতনের দৌরাত্ম্যেই মানুষের ভিতরে ঢোকে। হুঁশিয়ার মানুষের নাগালে আসে না ভাষার এই মৃতরূপ (symbolic function)। লাকাঁর কথায়: 'মানুষের সাথে তাঁর ভাষার এই অনাত্মীয়তাই অচেতনের আসল মর্ম। ফ্রয়েড অনবরত প্রমাণ করেছেন তাঁর চরিত অভিজ্ঞতার মূল সত্যও এটাই।' (লাকাঁ ১৯৬৬: ৪৬৯)

ভাষার অনাত্মীয়-চরিত্র অনুসারে একদা মানুষের অচেতন গড়া। এই অচেতন—তাই বলা হয়—বাইরে থেকে আসা। বাইরে থেকে আসা বলেই ভিতরে এসেও সে কিছুটা বাইরের থেকে যায়। এই বক্তব্য লাকাঁর জবানিতেই ভাল শোনায়:

> অচেতন বস্তুটাকে আমি আপনাদের সামনে হাজির করছি মানুষের ভিতরের সেই পদার্থ হিসাবে যা শুদ্ধ মানুষের বাইরে এসেই নিজেকে আদায় করতে পারে। বাইরে এসে মানে সেই বড় পড়শির জায়গায় এসে। শুদ্ধ সেখানেই তার কায়দা-কানুন স্পষ্ট হয়। (লাকাঁ ১৯৭৩: ১৩৪)

২

ফকির লালনের আরশি নগর—লাকাঁর ভাষ্য মোতাবেক চিন্তা করি তো বলতে পারি—ফ্রয়েডের আবিষ্কৃত এই অচেতন জগৎ বৈ নয়। সেই নগরের অলিগলি ভাষার মতন। ভাষা বলতে শুদ্ধ কথা নয়, কথার অধিক যে মৃত্যুময়তা তা-ও বুঝলেই এ কথা যথেষ্ট হবে। মানুষের বড় পড়শি—অনেকটা ঈশ্বরের মতন এই পড়শি সাহেব—এখানেই বাসা কিনেছেন। এখানে শুদ্ধ এইটুকু পরিষ্কার করলেই চলবে যে অচেতনই অপর নয়—অপর বাস করেন অচেতনের চৌহদ্দিতে। কিন্তু খোদ অচেতনই কখনো অপরের জায়গায় দাঁড়ান। আরশি নগরের ভিতর পড়শি থাকেন।

কিন্তু খোদ আরশি নগরও কখনো পড়শি হয়ে ওঠেন। আধার ও আধেয়ের এই রকম বিপর্যয় ভাষার জগতে অভূতপূর্ব ঘটনা নয়। এই অর্থে আরশি নগর ও বড় পড়শি একই বস্তু বটেন।

এক মানুষের সঙ্গে আর মানুষের সম্পর্ক—এক পড়শির সাথে আর পড়শির সাক্ষাৎ—এই বড় পড়শির বাড়ি বা তার আরশি নগরেই ঘটে। ভাষা বিনে উপায় নাই। এক মানুষের মনে কী আছে তা শুদ্ধ ভাষাই জানেন—তা আর মানুষ জানেন শুদ্ধ ভাষারই দয়ায়। চেতন সব সময়ই—এক্ষণে—অচেতনের দয়ার উপর নির্ভরশীল। অচেতন চলে কিসের জোরে? ফ্রয়েড বলেছেন: এই জোরের নামই 'বাসনা'। প্রশ্ন উঠবে: বাসনা কোন গাছের গোটা? লাকাঁর উত্তর শোনার মতন: 'অভাবের সাথে ভাবের সম্পর্কই বাসনা।' ইংরেজিতে অনুবাদ করলে আরো ভাল শোনায়: Desire is a relation of *being* to *lack*. লাকাঁ বলেন:

> এই অভাব—সত্য বলতে—ভাবের অভাব। এটার বা সেটার অভাব নয়, বরং সেই ভাবের অভাব, যার উপর ভর করে ভাব দাঁড়ায়। (লাকাঁ ১৯৭৮: ২৬১)

বাসনারই একটা রূপ 'কামনা' বা 'প্রকৃতি-রতি' বা সংক্ষেপে 'রতি' (sexuality)। ফ্রয়েডের আবিষ্কারের এই মুখটাই আজ পর্যন্ত ইতরে ব্যাখ্যায় বিখ্যাত হয়ে আছে। এর তাৎপর্য আরো বড়। এর ভিতরে মহাত্মা লালন ফকিরের প্রশ্নের উত্তর নিহিত।

আরশি নগর কেমন শহর? নদীর ঐ পারেই শহরটা। কিন্তু কেমন জানি কুয়াশা কুয়াশা। নদী পার না হয়েও যেমন জ্যামিতিওয়ালা নদীর ওসার কত বার করতে পারেন—আরশি নগরে না গিয়েও তেমনি তার মাপজোক নেওয়া যায়। মানুষের ভাষাই সেই নগরের সবচেয়ে বিশ্বস্ত মানচিত্র। ভাষা বিহনে এই শহরও বিলকুল গায়েব, বিলক্ষণ লাপাত্তা।

৩

ফ্রয়েডের আবিষ্কার মানুষের নতুন সংজ্ঞা তৈরি করেছে। স্বাধীনতার মতন মানুষের তথাকথিত ব্যক্তিত্বও এক বিশাল ঘোড়ার ডিম। ঘোড়ার ডিম দুনিয়ায় না থাক কী হয়েছে, ভাষায় তো আছে! ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যও তাই। দেকার্ত থেকে হেগেল পর্যন্ত এয়ুরোপের প্রথম সারির ভাবুকরা যেই স্বপ্ন দেখেছেন তা আমিত্বের অহঙ্কারে ভরা। ফ্রয়েড তাতে একটা বড় আকারের ফুটো করে দিয়েছেন। ব্যক্তির কেন্দ্র আর ব্যক্তির ভিতর নাই—তার কেন্দ্র অন্যত্র। মানুষের নতুন সংজ্ঞা এখন এইভাবে দিতে হবে: 'যেই বস্তু একই সাথে দুই জায়গায় বাস করে তাকেই মানুষ বলে।' এক জায়গার

নাম আরশি নগর আর জায়গার 'বাড়ি'। অথবা 'মানুষ তাকেই বলে যে একই সঙ্গে মানুষ ও মানুষের পড়শি।' অর্থাৎ একই সাথে মানুষ ও ঈশ্বরকে মানুষ বলার একটা রাস্তা তৈরি হল। যেই-মানুষ সেই বস্তু জানে না সে কী করে জানবে সে কী বলছে? লাকাঁর উক্তি: 'মানুষ কী বলছে তা নিজেই জানে না—এবং জানে না খুব সঙ্গত কারণেই—কারণ সে কী তা-ই সে জানে না।' (লাকাঁ ১৯৭৮: ২৮৬) জ্ঞানগাছের গোটা খেয়ে আদমজি বেহেশত হারিয়েছিলেন আর ফ্রয়েডের ফল খেয়ে এখন মানুষ চেতন-শহর বা বাড়ি থেকেও বিতাড়িত।

ফ্রয়েড যখন প্রথম এই প্রস্তাব পেশ করেন তখন তাঁকে নতুন ধরনের রাহসিকতা ঠাওরানো কঠিন ছিল না। জাক লাকাঁর ব্যাখ্যার পর এতদিনে সেই কথা স্পষ্ট হয়েছে (বা অন্তত তা হওয়া সম্ভব) যে অচেতনের জগৎ অলৌকিক জগৎ নহে। আরশি নগর লোকালয়ের তপশিলভুক্ত। এই নগর ভাষার নগর। উচ্চারণের আগেও পর, পরেও পর—শুদ্ধ উচ্চারণের মুহূর্তেই ভাষা মানুষের শহর।

মানুষ কী করে মানুষ হল? এই প্রশ্নের উত্তরে জাঁ জাক রুসো প্রমুখ মহাত্মা সমাজগড়ার চুক্তি কল্পনা করেছিলেন। আসলে এই চুক্তি ভাষাচুক্তি ছাড়া আর কী? ফ্রয়েডের আবিষ্কারের সাক্ষাৎ ফল মানুষের অন্তর্গঠনে ভাষার ভূমিকা নতুন কায়দায় বোঝার পথ খুলে যাওয়া। মানুষ বলতে যদি আমরা আজ পর্যন্ত রক্তমাংসে গড়া কোন জীবের অভিজ্ঞতা বা বংশগতি বুঝে থাকি তা নিতান্তই অল্প বোঝা। লাকাঁ পরিষ্কার মনে করেন, যাকে আমরা মানুষ বলি তা কোনক্রমেই ব্যক্তিমানুষ মাত্র নয়। ফ্রয়েড আমাদের এই সত্য নতুন পথে—পুরানো দার্শনিক-অর্থে বস্তুবাদী কায়দায়—শিখিয়েছেন।

মার্কস একদা স্বপ্ন দেখেছিলেন হেগেলকে আবার তাঁর পায়ের উপর দাঁড় করাবেন। কারণ মহান তত্ত্বজ্ঞানী সত্যকেও উল্টা মাথার উপর খাড়া করে রেখেছিলেন। কিন্তু খোদ মার্কসই বুঝতে পারেন নাই: হেগেলের দর্শনের গোড়া না কেটে এই অসম্ভব-কর্ম সম্ভব ছিল না। মানুষের সামাজিক সম্পর্কই তার ভাবনাকে নিষ্পন্ন করে—মার্কস এইটুকু পর্যন্ত গিয়েছেন। আর ফ্রয়েড দেখিয়েছেন মানুষেরই সামাজিক সম্পর্ক কিভাবে খোদ মানুষের জন্ম দেয়। ফ্রয়েডের আবিষ্কার এই বিচারে সাক্ষাৎ মানুষ আবিষ্কারের সমান।

ভাবতে ভাল লাগছে: মহাত্মা লালন ফকির নিজের ভাষায় এই আবিষ্কারই সম্পন্ন করেছিলেন। পরাধীনতা আমাদের যত ক্ষতি করেছে তার মধ্যে এই বোধশক্তি হারানোটাই সম্ভবত প্রধান।

দোহাই

১. সনজীদা খাতুন, *তোমারি ঝরনাতলার নির্জনে* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪)।

২. Jacques Lacan, *Le Seminaire de Jacques Lacan, Livre II: Le moi dans la theorie de Freud et dans la technique de l'analyse* (Paris: Editions du Seuil, 1978).

৩. --------, *Le Seminaire de Jacques Lacan, Livre I: Les Écrits techniques de Freud* (Paris: Editions du Seuil, 1975).

৪. --------, *Le Seminaire de Jacques Lacan, Livre XI: Les Quartes Concepts Fondamentaux de la Psychanalyse* (Paris: Editions du Seuil, 1973).

৫. --------, *Écrits* (Paris: Editions du Seuil, 1966).

....

উৎস

অচেতন ॥ ঢাকা ২০০১

১০

আমি তুমি সে

সাঁইজির ‘অপর’ আর ‘পর’ কে কে?

আমার প্রাণের চোখ খুলল
প্রিয়ের সঙ্গে দেখা হল
‘কে তুমি?’ পুছ করল সে
‘কেন, তুমি’—জবাব দিলাম আমি

—মনসুর আল হাল্লাজ (বলদিক ১৯৮৯: ৪৭)

মহাত্মা লালন ফকির নদীয়া কুষ্টিয়ার আপন সমাজে ‘সাঁইজি’ নামে জারি আছেন। আমরাও এই নাম গ্রহণ করা উচিত জ্ঞান করি। সম্প্রতি মহাত্মা ফরহাদ মজহারও তাই করেছেন। (মজহার ২০০০)

শ্রী বসন্ত কুমার পাল বাংলা ১৩৩২ সালের শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসী পত্রিকায় ‘ফকির লালন শাহ’ নামা প্রবন্ধ এবং ১৩৬১ সালে ‘মহাত্মা লালন ফকির’ নামা বই প্রচার করেন। (চৌধুরী ১৯৭৪: ১৫৭-১৫৮) ইনি লেখেন: ‘আউল বাউল দরবেশ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সাধক সিদ্ধ হইলে তবে তাঁহাকে ‘সাঁই’ আখ্যা দেওয়া হয়। লালন শাহ ‘সাঁইজী’ আখ্যায় বিভূষিত হইয়াছিলেন।’ (চৌধুরী ১৯৭৪: ১৬১)

পালজি বলেছেন: ‘লালন শাহ সাধনার উচ্চতম শীর্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন।’ তাঁরই উদ্ধার করা কথায়:

আউল বাউল দরবেশ সাঁই
সাঁইয়ের উপরে আর নাই

তবে একখান কথা আছে। সাঁইয়ের মানে আরো আছে। ‘সে’ অর্থও সাঁই। সাঁইজির এক পদ এই রকম:

মনতরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই
শুনি মানবের তুল্য কিছুই নাই
দেবদেবতাগণ করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে ॥
(মজহার ২০০০: ৬৯)

অথবা, আর কথায়:

কলেছে সাঁই আল্লা নূরী
এই জেকেরের দরজা ভারি
সিরাজ সাঁই তায় কয় পুকারি
শোনরে লালন বে-নিরা।
(মজহার ২০০০: ৯৩)

এখন আমরা গরিব। কোথায় দাঁড়াই? কোন 'মানুষ' যখন 'সাঁই', তখন সেই মানুষ 'সাঁই মানুষ'। তখন তাঁর 'আমি' লোপ পায়। সাঁইজি লালনের পদে পদে আমরা এমন পদার্থ পাই। এই লেখায় আমরা এই রকম একজোড়া পদ ও পদার্থেরই সেবা করার বাসনা রাখি। 'অপর' ও 'পর' এই দুই 'পদ' কোন কোন 'পদার্থ' সৃষ্টি করে? সাঁই পদের সাথে এদের কোন নির্বন্ধ? ফরহাদ মজহার এই সম্বন্ধে যে, আলোচনার সূচনা করেছেন তা বাংলা ভাষায় নতুন। এই আলোচনা আগ বাড়িয়ে নেওয়ার দরকার আছে—এই আমাদের ধারণা। তাঁর মীমাংসায় আমরা উপকারও পাই। তবে কিছু সংশোধন করলে আমাদের চিন্তায় আরো মাত্রা যোগ হয়। এই মাত্রারই অপর নাম 'সত্য'।

আজ অল্পের মধ্যে তাই করতে চাই। সম্ভবত সত্যের বিকল্প নাই।

১

আসল কথা তোলার আগে দু-একটা নকল কথা পাড়ি। সাঁইজির পদ ও পদার্থ আলোচনার পদে পদে বাধা। এই বাধা তৈরি করেছেন বাংলা মুলুকের ভদ্রলোক শ্রেণীস্থ হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতির পণ্ডিত লোকজন। এই শ্রেণীর লোকেরা মনে করেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লালন ফকিরের ত্রাণকর্তা। এর মধ্যে কিছু সত্যও আছে। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ফকিরের অর্থকর্তা মাত্র নহেন, অর্থহর্তাও বটেন—সেই কথা চাপা পড়ে গেছে। মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেবকে ভদ্রশ্রেণীর উকিল গণ্য করা যায়। তিনি লেখেন:

> ... রবীন্দ্রনাথ লালন সম্পর্কে কৌতূহলী হয়েছিলেন এবং শ্রেষ্ঠ বাউল কবি হিসেবে তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন বলেই তাঁর প্রতি বাঙালি কাব্যামোদী ও শিক্ষিত জনসাধারণের বিশেষভাবে দৃষ্টি পড়ে। তার ফলে দীর্ঘকাল ধরে আলোচিত হ'তে হ'তে তিনি তাঁর সব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত (হন)। নইলে কতকাল যে তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতেন, বলা যায় না। (চৌধুরী ১৯৭৪: ৮৯)

আবদুল হাইও — আর দশ ভদ্রলোকের মতন — সত্যি মনে করতেন: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তা ও ভাব-সাধনা লালন ফকিরের সাথে তুলনীয়। ভদ্রলোকদের এই অহমিকা দূর করার কর্তব্য আমরা গ্রহণ করছি না। শুদ্ধ শুনে যাচ্ছি:

> রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি, গীতালি ও গীতিমালা প্রভৃতি সঙ্গীতাখ্য কাব্যগুলোতে লালনের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে তার আধ্যাত্মিকতারও একটি সগোত্রতা লক্ষ্য করা যায়। এ সগোত্রতা অবশ্য প্রভাবজাত এতটা নয়, যতটা চিন্তা ও ভাব-সাধনার ঐক্যজাত। (চৌধুরী ১৯৭৪: ৮৯)

হাই সাহেবের এই বাক্য আর ব্যাকরণ-জ্ঞান দেখেও অনুমান করা চলে চিন্তা ও ভাব সম্পর্কে তাঁর ধারণা কত উঁচুতে উঠতে পারে। বাংলাদেশের ভদ্রলোকশ্রেণীর এই দীনতার পটভূমি বিশ্লেষণ না করলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতন খুবই সাধারণ কোন লেখক কি করে এত অসাধারণ বলে গণ্য হন বোঝা কঠিন।

ওদিকে ডক্টর মতিলাল দাশ আরো মজার মানুষ। তাঁর কাহিনীও শোনার মতন:

> ভোলাই সা'র নিকট হইতে গানের পুঁথি আদায় করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। ভোলাই সা' বলিল, 'দেখুন, রবি ঠাকুর আমার গুরুর গান খুব ভালবাসিতেন, আমাদের খাতা তিনি লইয়া গিয়াছেন, সে খাতা আর পাই নাই, কলিকাতা ও বোলপুরে চিঠি দিয়াও কোনও উত্তর পাই নাই।' এ কথার সত্যতা কতদূর কে জানে? কিন্তু ভোলাই কবিগুরুকে লালনের চেলা বলিয়া মনে করে এবং বলে যে কবিগুরু লালনের গানকে রূপান্তরিত করিয়াই জগৎ-জোড়া নাম কিনিয়াছেন। বৃদ্ধের এই মিথ্যা অহমিকা দূর করিয়া তাহাকে কষ্ট দিবার প্রয়োজন অনুভব করিলাম না। (চৌধুরী ১৯৭৪: ৩৭)

দাশজির এই মহানুভবতায় আমরা মুগ্ধ। তিনি সত্যও বলতে পারেন সত্য সত্য। লালনের গান রূপান্তর করার প্রয়োজন রবিবাবুর ছিল না। তিনি প্রতিভাধর মানুষ। কিন্তু মতিলালবাবু হয়তো সন্দেহও করেন নাই মিথ্যা অহমিকাটা ভোলাই সা'র না তাঁর নিজের। পাঠিকা খেয়াল করবেন, মতিলালবাবু কিন্তু বৃদ্ধ ভোলাইয়ের জন্য এক ক্রিয়ারূপ আর রবিবাবুর জন্য অন্য রূপ ব্যবহার করেছেন। এই আমলনামা অচেতনের লক্ষণ (symptom)।

আমরাও মনে করি — তবে উল্টা কারণে — ফকির লালনের গানের পদ ও পদার্থ রবীন্দ্রনাথের উপযুক্ত হয় নাই। তাই আমরা ফরহাদ মজহারের মত সমর্থন করে

বলতে চাই: লালন পড়ার সময় রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ বাদ দেওয়াই উত্তম। ফরহাদ লিখেছেন:

> তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) রোমান্টিকতায় ফকির লালন শাহের 'মানুষ' ধারণাটির তাৎপর্য অনুধাবন অসম্ভবই ছিল। সেই কারণে 'মানুষ' শব্দটি বদলিয়ে 'মানস' শব্দটি বসানোর গুরুতর ভাবগত বিপত্তি তাঁর বিচারে ধরা পড়ে নি। (মজহার ২০০০: ১৪)

ফকির লালন শাহ বাংলাদেশের দেশজ চিন্তার যেই ধারার শিখর পর্যন্ত পৌঁছেছেন সেই ধারার নাম ফরহাদ মজহার দিয়েছেন 'বাংলার ভাবান্দোলন'। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই ধারার সামান্যতম পরিচয়ও নাই। ফরহাদ বলেন:

> বাংলার ভাবান্দোলনের ভাবের সমুদ্রের ধার দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কোথাও হেঁটেছেন তার নজির রবীন্দ্র রচনার কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। (মজহার ২০০০: ১৪)

বাংলাদেশে আমরা কোন জগতে বাস করে আসছি তার আরেকটা নমুনা দেই তো বোঝা যাবে, ফকির লালন শাহকে নিয়ে ভদ্রলোকরা কী করবেন ভেবে নিরুপায় কেন। এই বিপদের মধ্যেই আমি লিখি। দার্শনিক ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন একদিন লালন শাহের তারিফ মনে করে এই ঘোষণা প্রচার করেন:

> লালন শাহ দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের গ্র্যাজুয়েটদের চেয়েও অধিক জ্ঞান রাখেন। এই উম্মি লোকের শব্দ-সম্ভারও দেখা যায় প্রচুর। অতএব এঁকে রীতিমত কৃষ্টিবান বলতে হয়। (চৌধুরী ১৯৭৪: ৬৬)

আলহামদুলিল্লাহ! পাছে আমরা 'উম্মি' শব্দটা ভাল না বুঝি তাই কাজী হুজুর জানাচ্ছেন: লালন লোকটা 'স্বয়ং শিক্ষিত' ছিলেন। বন্ধনীর মধ্যে জানিয়ে দিলেন এর মানে 'অশিক্ষিত'। (চৌধুরী ১৯৭৪: ৬৪) আমার কৌতূহল হয়, রবীন্দ্রনাথও যখন কপালগুণে গ্র্যাজুয়েট হন নাই, তো তাকেও কাজী সাহেব কি 'স্বয়ং শিক্ষিত' (বা অশিক্ষিত) জ্ঞান করতেন? হয়তো বৎসর বৎসর চলে যাবে, এই প্রশ্নেরও মিলবে না উত্তর।

২

সাঁইজির গান বাঁধা হয়েছে শোনার খাতিরে, দেখার দাবিতে নয়। এখন লিখতে গিয়ে লোকে যার যার শিক্ষা ও বিশ্বাস মতন যা সত্য মনে করেন তাই লিখছেন। ফলে বেশ গোল পাকাচ্ছে। এই সমস্যার কথা ভুলে না গিয়েই সাঁইজির এই গানটির কথা বিবেচনা করছি। মতিলাল দাশের সংগ্রহ থেকে আমরা পড়ব:

আমি তুমি সে

আপনারে আপনি রে মন না জান ঠিকানা
পরের অন্তর কেটে সমুন্দর, কিসে যাবে জানা?
পর অর্থে পরম ঈশ্বর, আত্মারূপে করে বিহার
দ্বিদল বারামখানা, শতদল সহস্রদলে অনন্ত করুণা।

কেশের আড়েতে যৈছে, পর্বত লুকায়ে আছে
দরশনে হল না।
এবার হেট নয়ন, যার নিকটে তার
সিদ্ধ হয় কামনা।
সিরাজ সাঁই বলেরে লালন গুরুপদে ডুবে আপন
আত্মার ভেদ চেনে না।
আত্মা আর পরমাত্মা নিত্য ভেদ জেন না।
(চৌধুরী ১৯৭৪: ৩৮)

এই কালের অভিজ্ঞতায় জানা যায়, মনুষ্যশিশু ভাষা শেখার গোড়ার দিকে শুদ্ধ নাম শেখে। 'আমি' বলার আগে নিজেকেও 'সে' হিসাবেই চেনে। বাইরের জগতের ভিতরে শিশু 'আবিষ্কার' করে নিজেকে। নিজেকেও সে একটা নাম ধরে ডাকে।

যখন তার 'আপন' বা 'আমি' জ্ঞান হয়—তখন একই সাথে তার 'পর' জ্ঞানও হয়। আপন না হলে পর হয় না, পর না হলে আপনও নাই। শিশুর প্রথম পর তার মা। মা কোন ব্যক্তির নাম হিসাবে নয়, যেই জায়গায় মা আছেন সেই জায়গার নাম হিসাবেও গণ্য। নগণ্য নয়। শিশু মা'র কাছে সব আশা করে। এই আশালতা, এই নির্বন্ধ নাড়ি কাটার পরও অনেক দিন—জীবন্যায়—থাকে। যখন শিশু বড় হয়, কথা বলা শেখে, তখন মা ও শিশুর মাঝখানে ভাষা এসে হাজির হয়। এই ভাষাকে আমরা নামের দুনিয়া বলতে পারি। এই নামের দুনিয়া না হলে 'মা' কে তা-ও চেনার উপায় থাকত না।

এই নামের গুণেই শিশু বুঝতে শুরু করে, মা-ই শেষ কথা নয়, বাবাও আছে। 'মা' ও 'বাবা' এই দুটি পদের তাৎপর্যই আলাদা। যখন শিশুর জগতে কেউ নাই তখন শিশু ও মা একাকার, একদেহ। জন্মের পর শিশু দেখে মা কাঁদলেই ছুটে আসে, নড়েচড়ে, দুধ দেয়। এই লীলা চলে মা ও শিশু এই দুইয়ের আকারে। শিশুর কাছে মা-ই 'পর'। কিন্তু যখন সে টের পায় মা সব দিতে পারে না, সব বাসনা মেটাতে পারে না—ভাষার দিকে বা তৃতীয় কিছুর দিকেও নজর দিতে হয়—তখন মায়ের খুঁত ধরা পড়ে। ভাষার মধ্যে বিধি আছে। একটা পদের পাশে আর পদটা বিধিমতন বসে। মা নিখুঁত নয়; তার ভিতরে শূন্য আছে। তখন মা হয়ে যায় 'অপর'। আর যার মধ্যে শূন্য নাই সেই তৃতীয় হয়ে ওঠে পর। এই পরেরই অপর নাম 'ভাষা'।

যেই পরের ভিতর খুঁত থাকতে পারে সেই পরকে 'পর' বলা যায় না। সেই পরকে বাংলা ভাষার প্রতিভায় আমরা 'অপর' বলি। পরের মর্যাদা হারিয়ে মা হয়ে ওঠেন শিশুর অপর। মহাত্মা ফরহাদ মজহার এই ভেদটা বুঝেছেন। তিনি বলেন:

> "অপর" মানে পর নয়, এটা শুরুতেই বুঝতে হবে। অ-পর কথাটার আক্ষরিক দ্যোতনাও হচ্ছে, যে পর নয়। আবার আপনও নয়। (মজহার ২০০০: ৩৫)

ফরহাদ মজহারের দান স্বীকার করার পর আমরা কবুল করছি: পর' ও 'অপর' ভেদটি তিনিও শেষ পর্যন্ত ভেদ করেন নাই। আমরা সবিনয়ে সাঁইজির যে যে পদ উপরে নকল করলাম তারই উল্লেখ করে বলব: 'পর অর্থে পরম ঈশ্বর'। পরের চূড়ান্ত অর্থ 'পরম'। ঈশ্বর বা আল্লাহ বা অন্য যেকোন পদে তার ভাব বিরাজ করে। সাঁইজির বোধে কোন ফাঁক ছিল না এই প্রশ্নে। তো ঈশ্বর পরম কেন? কারণ তার কোন খুঁত নাই, অপূর্ণতা নাই। দার্শনিক হেগেল এই খুঁতহীন, নিঃশূন্য ভাবকে পরম ভাব (Absolute Idea) নাম দিয়েছিলেন।

'আপন' তো পূর্ণ নয়। প্রথম 'পর' ওরফে 'অপর'ও পূর্ণ নয়। কোন অসম্ভব পূর্ণ যখন নিজেকে দু-ফালা করে তখন এক ফালার নাম দাঁড়ায় 'আপন', 'নিজ', 'আমি', 'অহম' ইত্যাদি। আর ফালার নাম দাঁড়ায় 'পর', 'তুমি', 'অন্য', 'মানুষ', 'লোক' ইত্যাদি। অপূর্ণতার অপরাধে তার নাম দিতে হয় 'অপর'।

এই স্থলে বাংলা ভাষার একটু তারিফ না করি তো বড় অন্যায় হয়। বাংলায় ভাগিস 'অপর' ও 'পর' দুইটি কথাই আছে। এয়ুরোপের কোন কোন ভাষায়—যেমন ইংরেজি বা ফরাসিতে—নাই। ইংরেজরা অপর অর্থে আদার (other) লিখবেন। 'ও' অক্ষরটি ছোট পক্ষের দিতে হয়। মুখে বলে 'ছোট পর' বা লিটল আদার। আর পর অর্থে আদার (Other) লিখবার সময় প্রথম হরফটি বড় হাতের দিতে হয়। বলতে হয় বিগ আদার বা 'বড় পর'। ফরাসিতে পরের জন্য ওত্র (*autre*) শব্দ লেখা হয়। ওরাও বড় 'আ' ছোট 'আ' লিখে এই ভেদ দেখান। জর্মান ভাষায় নির্দেশক বদলিয়ে কাজ সারার নিয়ম। ফ্রয়েড অপর বা ছোট পরের কাছাকাছি অর্থে *der Andere* (অপরলোক) লেখেন। আর পর—মানে বড় পর—অর্থে *das Andere* (অপরত্ব) লেখেন। (ইভানস ১৯৯৬: ১৩২)

তো আমাদের সামান্য বক্তব্য এই দাঁড়াল। সাঁইজির কথায় 'একেতে হয় তিনটি আকার, অযোনী সহজ সংস্কার হে!' (চৌধুরী ১৯৭৪: ২৪) এই তিনটি আকারই ভাষায় 'আমি', 'তুমি' ও 'সে' অথবা 'আপন', 'অপর' ও 'পর'। চলতি ভাষায় আমি বলতে যা বোঝায় এখানে তার একটু অধিক কথা আছে। সাঁইজি প্রায়ই বলেন, 'অধম লালন'। এই অধম মানেও আমি-ই। একটা সম্পর্কের মধ্যে এই আমি বিরাজ করে; আলাদা থাকা তার ভাব নয়।

৩

বাংলা মুলুকের সাধক ফকিররা মাঝে মাঝে পরম ঈশ্বর বা আল্লাহকেও 'তুমি' ডাকেন। এখানে পর অপর হয়ে ফেরে। এর কী তাৎপর্য? প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে পরম ঈশ্বর মানে পিতাও বটেন। সাঁইজিও গেয়েছেন:

শুনতে পাই পরম পিতা গো তুমি
অতি অবোধ বালক আমি
যদি ভজন ভুলে কুপথে ভ্রমি
তবে দাও না কেন সুপথ স্মরণ করে ॥
পতিতকে তারিতে পতিত পাবন নাম
তাইতো তোমায় ডাকি গুণধাম
তুমি আমার বেলায় কেন হইলে বাম
আমি আর কতকাল ভাসব দুখের পাথারে ॥
(মজহার ২০০০: ৮৮)

বিধিই বাম হতে পারেন। আর মা যেমন একটি জায়গা—সম্পর্কের একটা কোণা বা বিন্দু—পিতা বা ঈশ্বরও তাই। কিন্তু বাড়তি এক সমস্যা দেখা দেয় এখানে। ঈশ্বর স্বয়ং বিধিরও অপর নাম। ঈশ্বর যখন একটা কোণা তখন কিন্তু তিনিও নিখুঁত নন, পর হিসাবে পূর্ণ নন। তিনি তখনই নিখুঁত ও পূর্ণ, যখন তিনিই স্বয়ং সম্পর্ক, শুদ্ধ তার একটা কোণা, প্রান্ত বা বিন্দু নন। এই পদের নামই পর—পরম পিতা বা ঈশ্বর, হেগেলের 'পরম ভাব'।

ফরাসি দার্শনিক জাক লাকাঁর যুগান্তকারী তাৎপর্য ঠিক এখানেই যে তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, এই পরম ভাব, পিতা বা পর আর কেউ নয়: স্বয়ং ভাষা। এবং পরম, পর বা ভাষার কাহিনীকেই তিনি সনাক্ত করেছেন মহাত্মা ফ্রয়েড-কথিত 'অচেতন' বলে। সাঁইজির পর ও অপর বোঝার খাতিরে জাক লাকাঁর এই আবিষ্কার আমাদের অনেক সাহায্য করেছে।

মহাত্মা জাক লাকাঁর মত অনুসরণ করে বলছি: অপর ও পরের মধ্যে ভেদটি সামান্য ব্যাপার নয়। এই কথা সত্য যে আমরা নিত্যদিনের কায়কারবারে এই দুই পদ গুলিয়ে ফেলি। কিন্তু তার ফল ভাল নয়। পরের জগৎ শুদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মেরই জগৎ নয়। এই জগৎ সাধারণভাবে নীতি ও ধর্মের জগৎ। বিধি ও ভাষার জগৎ। ফরহাদ মজহার লিখেছেন: '[ফকির লালন] কোন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাস করতেন না, কোন সাধকই করেন না। সেই কারণে মোল্লা-পুরোহিতদের সঙ্গে সাধকদের লড়াই সবসময়ই অনিবার্য।' (মজহার ২০০০: ৩৬)

তবে ফরহাদ মজহার বা অন্য কোন দার্শনিকও আশা করি দাবি করবেন না যে সাধকরা ভাষায় বিশ্বাস করতেন না। সাধকদের যে বিশিষ্ট ভাষা, তাও সম্ভব হবে না যদি আমরা সামান্য ভাষার দাবি গ্রাহ্য না করি। আমি নীতি বা বিধি বলতে ভাষার সমান কোন বড় পদার্থ নির্দেশ করছি। যেই সকল চিন্তাবিদকে ফরহাদ মজহার 'আধুনিক' নামে ডাকেন, সেই মহাশয়রাও বলেন: 'নীতি ও ধর্ম মানুষের তৈরি।' দাবিটা এক অর্থে ঠিক হলেও অন্য অর্থে বেঠিকই।

এই নীতি বা সেই নীতি, এই ধর্ম বা সেই ধর্ম মানুষের তৈরি, অতএব তা বদলানোর যোগ্য। ঠিক কথা। কিন্তু খোদ নীতি—এই বা সেই নীতি নয়, যে কোন একটা নীতি বা স্বয়ং ধর্ম, যে কোন ধর্ম—ছাড়া মানুষের চলে না। এই অর্থে মানুষ নীতির ফসল, ধর্মের সন্তান। বিনা নীতিতে মানুষ নাই, বিনা ধর্মে সমাজ হয় না।

মানব নয় এমন পশুদের প্রতি যথাবিহিত সম্মান দেখিয়েও বলা যায়, মানুষ ধর্মায়ত্ত, নীতির আয়ত্ত, রাষ্ট্রায়ত্ত পশু। কাজেই ধর্মই মানুষ তৈরি করেছে, নীতিই মানব সমাজের জনক, রাষ্ট্রই মানবের সারকথা।

এই সত্যেরই সমান আরেক সত্য: পরই আপনের স্রষ্টা। তবু আমাদের সাধু-সাধকরা মাঝে মধ্যে পরম পিতাকে ডাকেন 'সে' বলে নয়, 'তুমি' বলে। 'সে' যদি হয় 'পর', 'তুমি' হয় 'অপর'। সাচ্চা বাত। এই সে পদকেই পুরাণ ডেকেছে 'পুরুষ' নামে আর 'তুমি' পদকে 'প্রকৃতি' নামে।

আমরা প্রকৃতিকে ভালবেসে 'নারী' বলতেই বেশি পছন্দ করি। কাজেই 'পর' ও 'অপর' ভেদটা সহজ নহে। শাস্ত্রীয় ভাষায় এই ভেদের আরো এক নাম আছে: পর মানে 'পরমাত্মা', অপর মানে 'জীবাত্মা'। পরই আপনের আসল স্রষ্টা। অথবা জাক লাকাঁর মতন বললে: ভাষাই বাক্যের স্রষ্টা। 'ভাষা' পদের পদার্থ 'পর', 'বাক্য' পদের পদার্থ 'আপন' এবং 'অপর' দুই-ই। সাঁইজি বলেন:

আমি ঢাকা দিল্লি হাতড়ে ফিরি
তবু কোলের ঘোর ত যায় না।
আত্মারূপে কর্তা হরি
মনে নিষ্ঠা হলে মিলবে তারি
ঠিকানা।

বেদ বেদান্ত পড়বি যত
বেড়বে তত লখনা।

ধড়ের আত্মা কর্তা কারে বলি
কোন মোকাম তার কোথায় গলি
আর না যাও না।

সেই মহলে লালন কোন জন
তাও লালনের ঠিক হল না।
(চৌধুরী ১৯৭৪: ২২)

জাক লাকাঁর লেখা সুপরিচিত। জ্ঞানী পাঠিকা জানেন—লাকাঁ যাকে 'সাকার' (imaginary) বলেন, লালনের 'কোলের ঘোর' সেই পদার্থই। লাকাঁ যাকে নামান্তর (metonymy) বলেন, লখ্না (লক্ষণা) পদের অর্থও তাই। লখ্নার অন্য অর্থ উপসর্গও (symptom) হয়। ধড়ের আত্মা ইমাজিনারি। 'আত্মারূপে কর্তা হরি'—কিন্তু শুদ্ধ আকার (symbolic)। কথা আজ আর বাড়াব না।

৪

অপর ও পর এর মধ্যে ভেদ করতে যে জানে না—জাক লাকাঁর মতে—তার পক্ষে আর যাই হোক মনুষ্য সমাজের শিক্ষক (analyst) হওয়া সম্ভব নয়। (লাকাঁ ১৯৭৭: ১৪০) শিক্ষক বা সাঁইকে কথা বলতে শোনা যায় পরম সাঁই বা পরের উদ্দেশে, 'উদ্দেশ্যে' নয়। তাঁর সামনে যেই শাবক বসে আছে সে 'অপর'। এই অপরের অলাত থেকে, এই অপরকে ভর করেই 'পরম পর' অর্থাৎ 'পরম সাঁই' তার সাথে কথা বলেন। কথা বলেন ভাষায়।

এই ভাষাই 'পরম' বা পরের পর। সাঁই ও শিষ্য এই ভাষার ভিতরই সঙ্গম করেন। তাই ভাষাই সত্য, একই সাথে 'আপন' ও 'পর'। একমাত্র এই ভাষা হয়েই সাঁইয়ের পক্ষে সম্ভব পরম বা পরের কাহিনী শোনা।

ফরহাদ মজহার লিখেছেন (এবং এই লেখা অর্থময়):

> কবি যে আনন্দে, অবচেতনে, অভিমানে, ভয়ে, আশংকায় তার সকল ইন্দ্রিয় ও উপলব্ধিসহ কবির "অপর" বা আমাদের অতি পরিচিত "তুমি"-র সঙ্গে সারাক্ষণই কথাবার্তা ডাকাডাকি কথা চালাচালি করে, সাধকের দয়ালকে ডাকা একই ব্যাপার। "তুমি" বলে যেমন কেউ নেই, তেমনি "দয়াল" বলেও কেউ নেই। নবী, গৌর, নিতাই বা কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে সাধক যখন আহ্বান করেন তখন এটি আবহ সৃষ্টির জন্যে, একই সঙ্গে ভাব জগতে সেই বিশাল মানুষটির অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবার জন্য। একটা ভাবগত রূপকে সহজ কল্পনার সুবিধার্থে, কিন্তু সেটা কোন ধর্মের প্রতি পক্ষপাতী হয়ে নয়। (মজহার ২০০০: ৩৬)

অন্য কথায় ভাষার প্রতি পক্ষপাতী হয়ে।

সাচ্চা কথা। এই ভাষা কোন পদার্থ? এই ভাষার অপর নাম ইতিহাস। সাধকও ইতিহাসে বাস করেন। অর্থাৎ ইতিহাসে বিরাজ বা রাজত্ব করেন। মানুষের একদিকে

আছেন পরস্বরূপ ভাষা বা পর। অন্যদিকে বিরাজ করেন আপনস্বরূপ ভাষা বা ইতিহাস।

ইতিহাস ও পর যখন এক বিন্দুতে মিলিত হন, তখন এই সাঁই আর সেই সাঁইয়ে ভেদ ঘুচে যায়। মহাত্মা লালন ফকির সম্ভবত সেই বিন্দুর কাছাকাছি কোথাও পৌঁছেছিলেন।

দোহাই

১. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত, *লালন স্মারক গ্রন্থ* (ঢাকা, ১৯৭৪)।
২. ফরহাদ মজহার সম্পাদিত, *সাঁইজীর দৈন্য গান* (ঢাকা, ২০০০)।
৩. Julian Baldick, *Mystical Islam: An Introduction to Sufism* (New York, 1989).
৪. Dylan Evans, *An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis* (London, 1996).
৫. Jacques Lacan, *Écrits: A Selection*, A. Sheridan, trans. (New York, 1977).

....

উৎস
যুগান্তর ‖ ঢাকা, ১২ অক্টোবর ২০০১

১১

সহজ মানুষ

সহজ মানুষ ভজে দেখনা রে মন দিব্যজ্ঞানে।
পাবি রে অমূল্য নিধি বর্তমানে ॥
—ফকির লালন শাহ

'সহজ মানুষ' কথাটা নিতান্ত সহজ কথা নয়। এর একটি কারণ কথাটি প্রথম চালু করেছিলেন জাতিভেদ-বিরোধী বৌদ্ধধর্মানুসারী কোন এক সম্প্রদায়। তান্ত্রিক বা সহজযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ভাবাদর্শ ব্রাহ্মণশাসিত বাংলাদেশের সমাজে জাতের সঙ্গে অজাতের, উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্ণের অবাধ মিলনের আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মের মহাযানী ও হীনযানী শাখার চেয়ে সহজযানী শাখাই বাংলাদেশে বেশি পাত্তা লাভ করেছিল বলে নজির পাওয়া যায়।

এখনো বাংলাদেশে 'তন্ত্র' বলতে নির্বিচার কামোৎসব মনে করা হয়। অন্ধ কামের মতন আদ্যশক্তির জোরে জাতিভেদের দেয়াল ভেঙে পড়তে পারে—এই আশঙ্কায় প্রচার করা হয়েছে তন্ত্র মানে কামজ রেলেল্লাপনা। এই কামজ মানুষ কামার্ত। একালের 'বাউল' নামে বহুল নিন্দিত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেও এই রটনা অব্যাহত আছে। 'সহজ মানুষ' কথাটা তাই প্রায় কামার্ত মানুষ অর্থে গ্রহণ করেছে ব্রাহ্মণ্যবাদী মহল।

বাংলাদেশের ইতিহাসে 'সহজ মানুষ' কথাটি প্রায় স্বাধীন বা মুক্ত মানুষ অর্থে জারি রেখেছেন মহাত্মা ফকির লালন শাহ। অথচ মানুষের কাম বা বাসনার সঙ্গে এর সম্পর্কচ্যুতি তিনি ঘটান নাই। এই দ্বন্দ্বপূর্ণ ধারণার যেই মীমাংসা ফকির লালন শাহ'র ধারায় এখন জারি আছে তা বুঝতে আরো আলোচনার ডাক পড়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমি একটা নতুন আলোচনার সূত্রপাত করছি মাত্র।

১

উচ্চবর্ণের হিন্দু রটনা অনুসারে চিন্তা করি তো, বাংলাদেশের ইতিহাসকে সম্পূর্ণ ভুল বোঝার পথে পা বাড়াব। শুরুতেই তাই হুশিয়ার থাকা উচিত। উনিশ শতকের মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলার 'বাউল'দের সম্পর্কে জানিয়েছিলেন: 'এই সম্প্রদায়ের মধ্যে নরমাংস-ভোজন (মৃতদেহ) এবং শবের বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া পরিধান করা প্রচলিত আছে।' পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মন্তব্য করছেন:

> দত্ত মহাশয়ের এই কথা শুনিলে বর্তমান বাউল-সম্প্রদায়ের লোকেরা নিশ্চয়ই শিহরিয়া উঠিবে। সাধারণত এই সম্প্রদায়ের মধ্যে মাংস-ভোজন-প্রথা নাই। (ভট্টাচার্য ১৪০৮: ৫৮)

আমার প্রস্তাব সামান্য। এয়ুরোপে বিখ্যাত আবিষ্কর্তা জিকমুন্ট ফ্রয়েড মানুষের যেই নতুন ব্যাখ্যা হাজির করেছেন তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার জাক লাকাঁ। বাংলার দার্শনিক সাধকরা যেই রকম মানুষকে 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ' ভাগে ভাগ করেন, ফ্রয়েডের দোহার জাক লাকাঁও তেমনি মানুষকে সম্পূর্ণ অন্য ভিত্তিতে দুই খণ্ডে খণ্ডিত করেছেন। তার এক খণ্ডের নাম—উত্তম বা অহম (ego), আর খণ্ডের নাম অধম বা বান্দা (subject)।

এই দুই খণ্ডের নাম অন্যভাবেও বাংলায় তর্জমা করা যায়। যেমন করা যায়—এগো অর্থে 'অহম' এবং সাবজেক্ট অর্থে 'পরম'। সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন ওঠে: অধম আর পরম তাহলে কি একই মাল? করজোড়ে নিবেদন করব: হয়তো তা-ই। এখানেই আমি পেশ করব আমার নবীন প্রস্তাব।

যে অধম বা পরম একই জিনিস তারই অপর নাম সাবজেক্ট। ফকির লালনসুদ্ধ বাংলার জাতীয় ভাবধারায় প্রাপ্য 'সহজ মানুষ' এবং ফ্রয়েড ও হেগেলের যুগ্ম উত্তরাধিকারস্বরূপ জাক লাকাঁ প্রস্তাবিত 'সাবজেক্ট' একই জিনিস। সাবজেক্ট কথাটা জর্মান ভাষায় জুবিয়েক্ট (*Subjekt*) আর ফরাসি জবানে 'সুজে' শোনায়। বাংলা 'সহজ' কথার সঙ্গে ফরাসি সুজে (*sujet*) আওয়াজের মিল আছে। এই মিল আকস্মিকও হতে পারে, নাও হতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীর যেই ঘটনাকে বাংলার রেনেসাঁস বলা হয়ে থাকে তার এক শ্রেষ্ঠ প্রকার অক্ষয়কুমার দত্ত। তিনি আরো বিচার করেছেন: 'বোধ হয় সম্প্রদায়-প্রবর্তকের অভিপ্রায় উত্তমই ছিল, কিন্তু তাঁহার গতানুগতিকেরা তৎপ্রদর্শিত পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। বিশেষত ব্যভিচারদোষ তাঁহাদের সকল গুণগ্রাম গ্রাস করিয়াছে।' দত্ত মহাশয়ের এই ধারণা ঠিক নয়। বিংশ শতাব্দীর গবেষক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সেই বিচার খণ্ডন করেছেন:

> দত্ত মহাশয় তাঁহার বর্ণিত আউল-বাউল-নেড়া-কর্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ধর্মমতের প্রধান বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই, তাই পুনঃ পুনঃ তাহাদের স্কন্ধে ব্যভিচার-দোষ চাপাইয়াছেন। কিন্তু ইহা ব্যভিচার নয়—সুকঠিন যোগ-সাধনা। প্রকৃতি-পুরুষ-মিলন তাহাদের ধর্মসঙ্গত প্রধান ক্রিয়া—'নারী হিজড়ে ও পুরুষ খোজা' হইয়া সাধনা। এই মিলন কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নয়—কাম দমন করিবার জন্য—কামকে প্রেমে রূপান্তরিত করিবার জন্য। নানা সহজিয়া-গ্রন্থে ও বাউল-গানে ইহা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। (ভট্টাচার্য ১৪০৮: ৬৯–৭০)

ঘটনার আরো এক দিক আছে। এই অপপ্রচারের তোড়ে পণ্ডিত আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন পর্যন্ত ভেসে গেছেন। তিনি 'সাচ্চা বাউল' নামে এক নতুন পদার্থ আবিষ্কার করেছেন। তিনি লিখেছেন:

> সহজ ভাব সম্বন্ধীয় যে-কয়খানা পুঁথি পাওয়া যায়, তাহাতে সাচ্চা বাউল-ভাবের পরিচয় মেলে না। আসল বাউল তো পুঁথির ধারই ধারে না। যাঁহারা আধা বৈষ্ণব আধা বাউল, কি আধা তান্ত্রিক আধা বাউল, তাঁহারাই নিজেদের পরিচয় খানিকটা বৈষ্ণব ও তান্ত্রিকভাবে, compromise-এর মত দিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু যথার্থ যে নির্ভীক শক্তি বা রচনার গভীরতা খাঁটী বাউলদের নাই। সহজ নামে তাঁহারা যে সস্তা ইন্দ্রিয়-উপভোগের পন্থা খুলিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকপক্ষে কোনো সাধনার ভিত্তি হইতে পারে না। চর্যাচর্যবিনিশ্চয় প্রভৃতি গ্রন্থও তান্ত্রিক ভাবের খাঁটী বাউলের শ্রেণীর নয়। (ভট্টাচার্য ১৪০৮: ৮০)

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় ক্ষিতিমোহন সেনের এই মতবাদকে বলেছেন 'ইচ্ছানুরূপ সত্যকে গোপন বা বিকৃত করিয়া' খাড়া করা 'একটা মন-গড়া আদর্শ'। আমরা ভট্টাচার্য মহাশয়ের উক্তির পিছনে দাঁড়াতে পিছপা হব না। তিনি বলেন:

> বাউলদের ভিত্তি-ভূমি হইতে এই বিষয়টি দেখিতে হইবে। তাহাদের প্রকৃতি-পুরুষ-মিলন ইন্দ্রিয়-উপভোগ নয়, ইন্দ্রিয়-দমন। ইহা বিন্দু-ধারণের জন্য সুকঠিন যোগ-সাধনা, ইহার বিশেষণ 'সস্তা' হইতে পারে না, ইহার বিশেষণরূপে 'দুর্লভ' কথাটি প্রযোজ্য। ইহা ক্ষয়ের আয়োজন নয়, সঞ্চয়ের সাধনা। (ভট্টাচার্য ১৪০৮: ৮১)

বাংলাদেশের মনীষী কবি ফরহাদ মজহার নিশ্চয়ই ক্ষিতিমোহন সেনের ব্যাখ্যা মেনে নেবেন না। কিন্তু সম্প্রতি জর্মান মনীষী শ্রীমতি মারিয়া মিজকে তিনি যা বলেছেন তা শুনে আমি খানিকটা ভড়কে আছি। না জানি তিনিও এই ব্রাহ্মণ্যবিচারে কতটা ভয় পেয়েছেন! ক্ষিতিমোহন সেন বাউলদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ চালু করে দাবি করেছেন, 'সাচ্চা বাউল' সে-ই—

> যে-বাউল কোনোরূপ প্রকৃতি-ঘটিত সাধনা করিবে না। যে-বাউল ক্ষণে ক্ষণে বিশ্ব-প্রকৃতিতে ও মানুষের মধ্যে ভগবানের লীলা দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইবে, যে ভগবানের

> প্রেমে সর্বসময় উন্মত্তবৎ ঘুরিয়া বেড়াইবে এবং তাঁহার প্রেম-স্পর্শ পাইবার জন্য লালায়িত হইবে, তাহার মনের মানুষকে পাইবার জন্য সর্বদা আকুলি-বিকুলি করিবে; কোনো আনুষ্ঠানিক ধর্ম মানিবে না, শাস্ত্রাচার বা দেব-দেবতা মানিবে না, কেবল ভগবানের প্রেমে সর্বদা আত্মহারা, উন্মাদবৎ হইয়া থাকিবে ইত্যাদি ইত্যাদি। (ভট্টাচার্য ১৪০৮: ৯৪; ভাষা ঈষৎ পরিবর্তিত)

গত বছর ২৪ জানুয়ারি মারিয়া মিজের সাক্ষাৎ কবি ফরহাদ মজহার বলেছিলেন, লালন অনুসারীদের কাছে 'লালন' নামটির অর্থ 'অমর'। সমাজে এই নাম উচ্চারণ করলে সারি সারি অর্থের জন্ম হয়, মানুষের জীবনের আনন্দপূর্ণ যাত্রায় এই নাম দিশারির ভূমিকা পালন করে। অথচ লালনের দেহ দৃষ্টিপথের আড়ালে চলে গেছে। লালন রক্তমাংসের দেহে ধারণা বা ভাবস্বরূপ দেখা দিয়েছিলেন আর এই ধরনের দেখা দেওয়ার নাম 'আবির্ভাব'। এই সুবাদে তাঁর মৃত্যু বা চলে যাওয়ার নামও তাই 'তিরোধান'।

ফরহাদ মজহারের মিহি ইংরেজি থেকে আমি মোটা বাংলায় তর্জমা করছি। তিনি আরো বললেন:

> লালন কিংবা তাঁর শিষ্যদের সাক্ষাৎ জীব আকারে জন্ম লওয়ার অর্থ প্রকট নয়। জীব আকার থেকে প্রজ্ঞার আবির্ভাবই আসল কথা। স্বভাবজাত জীব আকার থেকে আমাদের হয়ে ওঠার ঘটনাকেই বলে আবির্ভাব।
>
> এই আবির্ভাবই আমাদের আগ্রহের বিষয়। জন্মটা নয়। তাই তো লালনের কোন জন্মদিন নাই, কেউ জানে না উনি কখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে যেদিন 'লালন' নামটি প্রজ্ঞার প্রতীকস্বরূপ আবির্ভূত হল, আমরা টের পেলাম কালে, দেশে ও বিশেষ পাত্রে বিশেষ কাণ্ড ঘটেছে। না সমন, না মহাকাল কেউ এই কাণ্ডের মুণ্ডুপাত করতে পারবে না। এই ঘটনাকেই লালনের দর্শনে 'সহজ মানুষ' বলে। আক্ষরিক অর্থে এতে বোঝায় 'ভাবের সহজ আবির্ভাব'। আগের বৈষ্ণব 'সহজিয়া' নামে পরিচিত নানা ঘরানায় 'সহজ মানুষ' বলতে যা বোঝাত লালন ফকির তার অর্থকে এক কাঠি গভীরে নিয়ে গেছেন। (মিজ ২০০৪)

ফরহাদ মজহারের এই সাক্ষাৎকারটি এখনো বাংলাদেশে প্রকাশ পায় নাই। আশা করি তিনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। হয়তো সাক্ষাৎকার বলেই তিনি সব কথা এর ভিতর প্রকাশ করেন নাই।

আমার সওয়াল হল জীবের ভিতর শিবের আবির্ভাবে তটের কী ভূমিকা। তট মানে ভাষা বোঝাচ্ছি। মানুষ যদি তটস্থ জীব, ভাষার অধম হয় তবে এর মধ্যে কী ভূমিকা জৈব প্রকৃতির? আশা করি ফরহাদ মজহার এই বিষয়ে অধিক বলবেন কোন এক সুযোগে। আমার আগ্রহ, তিনি ক্ষিতিমোহন সেন প্রণীত ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুমোদিত 'সাচ্চা' তথা প্রকৃতি বর্জিত বাউল বিষয়ে কী ভাবেন, একটু জানি শুনি।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এই প্রশ্নে আপোসহীন। তিনি কপাট খুলে বলেছেন: 'বাংলার বাউলের প্রেম মানবিক প্রেম এবং 'অধর মানুষকে ধরিবার সাধনা, প্রকৃতি-পুরুষ-মিলনাত্মক যোগ-সাধনা'।' (ভট্টাচার্য ১৪০৮: ৯৩) তাঁর এই প্রস্তাবে ক্ষিতিমোহন সেনের বিরোধিতা স্পষ্ট। সেন মহাশয়ের মতে, বাংলার বাউলদের সাধনা ভগবৎ-প্রেমের সাধনা। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মনে করেন, এই ব্যাখ্যা মনগড়া। বাংলার বাউলরা প্রেম কথাটা খাটান। কিন্তু এই প্রেম ভগবৎ-প্রেম নয়।

এই প্রেম তাহলে কার প্রেম? উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যও স্বীকার করেন, বাংলার বাউলদের সাধনা 'অধর মানুষ' ধরার সাধনা। এই 'অধর মানুষ' আর 'সহজ মানুষ', 'মনের মানুষ', 'অটল মানুষ', 'রসের মানুষ', 'আলেক মানুষ', 'ভাবের মানুষ', সবই সমার্থক বা প্রায় সমার্থক পদ। যে ধরতে চাচ্ছে সে কে এখানে?

বৈষ্ণব সহজিয়া মতানুসারে মানুষ তিন প্রকার: 'অযোনি', 'সহজ' ও 'সংস্কার'। অযোনির কথা থাক। বাকি সহজ ও সংস্কার। সংস্কার মানুষ চাইছে সহজ মানুষ ধরতে। এই যদি হয় সমস্যা তা হলে তার পদ্ধতি কী? বাউল সাধনার এটাই লক্ষণ। ধড়ের মধ্যেই সে অধরকে ধরবে। ধড়েই প্রকৃতি, ধড়েই পুরুষের আবির্ভাব। আতেই প্রকৃতি-পুরুষের ভেদ লোপ পায়। এই অবস্থায় সাধক 'জ্যান্তে মরা' অর্থাৎ আত্মবিস্মৃত ও চেতনাহীন অবস্থাপ্রাপ্ত হয়, কামলুপ্ত হয় এবং শেষে তার নিজের সঙ্গে নিজের দেখা হয়।

এই মানুষই সহজ মানুষ। লালন ফকির গেয়েছেন:

> জেন্তে-মরা প্রেম-সাধন কি পারবি তোরা।
> যে প্রেমে কিশোর-কিশোরী হয়েছে হারা ॥
> শোসায় শোষে না ছাড়ে বান,
> ঘোর তুফানে বায় তরী উজান,
> ও তার কাম-নদীতে চর পড়েছে
> প্রেম-নদীতে জল পোরা ॥
>
> হাটিতে মানা, আছে চরণ,
> মুখ আছে তার, খাইতে বারণ,
> ফকির লালন কয়, এ যে কঠিন মরণ,
> তা কি পারবি তোরা ॥
>
> (ভট্টাচার্য ১৪০৮: ৬০৬-০৭)

২

বাংলার 'সহজ মানুষ' আর ফরাসি দেশের 'সুজে'র মিল আছে। 'সুজে' কথাটা জাক লাকাঁ নিয়েছেন জর্মান দার্শনিক হেগেলের ঘর থেকে। বলছি, কারণ খোদ ফ্রয়েডও এই পদটি এস্তেমাল করেন নাই। অথচ ফ্রয়েড বলেছেন আমি পদটি—একইভাবে তুমি বা সে পদটিও—ইন্ডিভিজুয়াল (individual) নয়। ইন্ডিভিজুয়াল কথাটার বাংলা আমি করছি ব্যক্তি নয়, 'অভাগা'—যার ভাগ হয় নাই। 'আমি' অভাগা নয়, ভাগা। আমি শব্দটা উচ্চারণ-মাত্রই দুই খণ্ডে খণ্ডিত হয়, দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এক ভাগ উচ্চারণের 'আমি'। আর ভাগ অর্থের 'আমি'। আরো লুটিয়ে বললে, পদ 'আমি' ও পদার্থ 'আমি'।

দার্শনিক দেকার্ত যখন বলেন, 'আমি ভাবি তাই আমি ভাব (অর্থাৎ আছি)'—তখন দুই 'আমি'র জন্ম হয়। এক আমি মানে 'যেই ভাব আমি' সে। আর এক আমি মানে 'সেই ভাবের অর্থ আমি'। অখিলের আমি ও অর্থের আমি। দুইয়ের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গা আছে অর্থাৎ দুই এক নয় এই কথাটা দেকার্ত টের পান নাই।

'আমি' কথাটা ভাষায় উড়ে গিয়ে জুড়ে বসে। এই কথার 'আমি' বার্তার 'আমি'কে হটিয়েই শুদ্ধ জায়গাটা দখল করে, তাকে সঙ্গে নিতে পারে না। এই ঘটনা বা কাণ্ডকেই ফ্রয়েড নাম দিয়েছেন 'আমি'র আদি তিরোভাব বা জর্মান জবানে উয়রফেরড্রাংগুঙ (*Urverdrängung*/ primal repression)। এক 'আমি'র আবির্ভাব অন্য 'আমি'র তিরোভাব ঘটায়। এই ব্যতিহারেরই অন্য নাম 'অজ্ঞান' (unconscious)। একের জন্যে অন্যের মূর্ছা।

মনে রাখতে হবে: মূর্ছা মানে মরণ নয়। এ 'জ্যান্তে-মরা' মাত্র। মানুষ বা সাধক উচ্চারণ মাত্রই মূর্ছা যায়। আহমদ ছফার 'ওঙ্কার' গল্পে এই ঘটনা ঘটে। বোবা বউ 'বাংলা' শব্দটি বলেই জ্ঞান হারায়। এই কাণ্ড এক নম্বর।

দুই নম্বর কাণ্ডটি আরো মজার। কথা বলার পর আমি আর 'আমি' নাই। আছি নিছক একটা 'শব্দ' বা পদ মাত্র। শব্দের মধ্যে আমি থেকেও নাই। এই না থাকাটার সঙ্গে থাকার একটা ভাগ আছে। ভাষার মধ্যে যাওয়া মানেই পরের জায়গায় জুড়ে বসা। অথচ পরের সঙ্গে ভেদটা ঘোচে নাই। পদ বা ভাষাই এখানে জননী। কার জননী? সহজ মানুষের। কিন্তু জননীর সঙ্গে রমণ তার জন্য নিষিদ্ধ বা অসম্ভব। একেই বলে পরসঙ্গ বা মাতৃবিগ্রহ। বৈষ্ণব কবিদের বিরহ এখানেই। পদ সহজ মানুষের জননী। কিন্তু এই জননী দুর্গা—মানে যার কাছে দুঃখে গমন করা যায়)—তাঁর কাছে যাওয়া দুরূহ, অসম্ভব। কারণ পদ স্থির: 'হাঁটিতে মানা, আছে চরণ/ মুখ আছে তার, খাইতে বারণ'। অথচ পদে পদে সম্বন্ধ চলে। 'সোনার শেষে না ছাড়ে

বান।' পদের অর্থ আসে পদার্থ থেকে নয়, অন্য পদ থেকে। অটল পদ ও অর্থহীনতার মধ্যে টানাপোড়েন চলে। যে শুদ্ধ অটল পদে প্রকাশিত এই মানুষ সেই 'সংস্কার মানুষ' মাত্র। সহজ মানুষ এখানে অধম এবং অনুপস্থিত।

এখন দ্বিতীয় কাণ্ড। এই কাণ্ডের নাম বিচ্ছেদ (separation)। ফরাসি ভাষায় 'সেপারের' শব্দটিকে দুই টুকরা করলে শোনায় সে পারের (*se parere*)। এর মানে সে নিজেই নিজের জনক/জননী। এখানে জননী হয়ে ওঠে রমণী। নিজের যেটুকু হারিয়ে বসেছিল সেটুকু পুনরুদ্ধারে সে ব্রতী হয়। পদ আর পদার্থের ভেদ থেকে যেই শূন্যতা বা খিল বা ফাঁক তৈরি হয়, তা পূরণের জন্য সে পদ থেকে পদান্তরে ছোটে। অথচ এই ছোটা মানে পরের জায়গায় ঘর বানানো ছাড়া কিছুই নয়। এই ছোটা অনন্ত, নামাবলি আওড়ানো মাত্র। (লাকাঁ ১৯৯৫, লেমোয়ার ১৯৭৭: ৬৭-৭৭)

পদের আবির্ভাবে পদার্থের তিরোভাব ঘটেছিল। এখন পদার্থ পদের পিছনে ছোটা শুরু করে। কিন্তু তার নাগাল পায় না। আবির্ভাব আর ঘটে না। পদার্থও শূন্যময়, পদও শূন্যময়। দুইয়ের যখন দেখা হয়, তখন সে জ্যান্তে-মরা বা অজ্ঞান। সহজ মানুষের আবির্ভাব তাই অলৌকিক।

এয়ুরোপের শাস্ত্রে বলে ভাবের (বা পদার্থের) কবরের উপরেই ভাষার (বা পদের) সৌধ। সহজ মানুষের খুন থেকেই কেবল মানুষের জন্ম। সহজ মানুষের ছবি বা নাম শুদ্ধ 'সংস্কার' মানুষে বা নির্বিশেষ মানুষে আছে। এছাড়া তার আত্মপ্রকাশের অন্য কোন জায়গা নাই। অথচ এই জায়গাটি সহজ নয়। এই জায়গাটি পরের, মানে ভাষার।

মানুষের নাম গ্রহণ করা মানেই পরের অধীন হওয়া, পরের অভিধানে যেই অর্থ লেখে সেই অর্থের কবলে পড়া। না পড়লে পরিচয় নাই। অথচ পরিচয় ছাড়া তার চলে না। এরই অনিবার্য পরিণতি সহজ মানুষের তিরোভাব। ভাষা ও বাক্যের মধ্যে সহজ মানুষ নাই। লালন বলেন:

> আল্লা হরি ভজন পূজন
> মানুষের সকল সৃজন
> আচানক অচিনাই কথন
> জ্ঞান ইন্দ্রিয় না সম্ভবে ॥
>
> মনের ভাব প্রকাশিতে
> ভাষার সৃষ্টি এই জগতে
> আচানক অধরকে চিনতে
> ভাষা বাক্যে নাহি পাবে ॥

৩

এযুরোপে জাক লাকাঁ প্রস্তাবিত 'সুজে' বা অধম মানুষকেও ভাষায় পুরাপুরি ধরা যায় না। পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যেই তার বসবাস। নাছোড়বান্দা যাকে বলে আর কি! এগো (ego) বা উত্তম মানুষ প্রকৃত প্রস্তাবে প্রকৃতিচ্যুত, একান্ত পুরুষের বশংবদ, অপরের লীলাভূমি মাত্র।

মানুষের স্বাধীনতা বা আত্ম-আস্বাদনের পথ প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে হয় না। সেই জন্যই সহজ মানুষের আবির্ভাব ও মানুষের স্বাধীন ভাব সমার্থক। ফকির লালন শাহের তাৎপর্য এখানেই বলে আমাদের ধারণা।

লালন শাহের সাধনায় 'প্রকৃতি' মানে 'বর্তমান', মানে 'দেহভাণ্ড'। বাংলাদেশের কল্পনায় দেহই যুগপৎ পুরুষ ও প্রকৃতি, উত্তম ও অধম। পুরুষ প্রথমে একা ছিলেন। তখন তিনি রস আস্বাদন করতে পারেন নাই। তিনি তাই নিজেকে প্রকৃতি ও পুরুষ ভাগে ভাগ করলেন। এই যে এক থেকে দুইয়ের সৃষ্টি, এই সৃষ্টিই বাসনার কারণ। একই কারণে এই সৃষ্টি বাসনার লক্ষ্যও বটে।

জাক লাকাঁর শেষ দিককার অনেক বক্তৃতায় মনে হয় লালন ফকিরের অনুবাদ শুনছি। আমার এই বিশেষ আনন্দ দুই ভাগ করার জন্য আজ এই নিবন্ধ এখানেই শেষ করছি।

দোহাই

১. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, ৩য় সংস্করণ (কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৪০৮)।

২. ফকির লালন শাহ, *লালন-সঙ্গীত*, দ্বিতীয় খণ্ড, ফকির আনোয়ার হোসেন (মন্টু শাহ) সম্পাদিত, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ (ছেঁউড়িয়া, কুষ্টিয়া: লালন মাজার শরীফ ও সেবা-সদন কমিটি, ২০০০)।

৩. Jacques Lacan, '*Position of the Unconscious*', Bruce Fink, trans., in Richard Feldstein et al., eds., *Reading Seminar XI: Lacan's Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis* (Albany, N.Y.: State University of New York Press, 1995); এই লেখাটি এখন Jacques Lacan, *Écrits: The First Complete Edition in English*, Bruce Fink, trans. (New York: W. W. Norton, 2006) গ্রন্থেও পাওয়া যায়।

৪. Anika Lemaire, *Jacques Lacan*, David Macey, trans. (London: Routledge and Kegan Paul, 1977).
৫. Maria Mies, *On Fakir Lalon Shah: Interview with Farhad Mazhar*, (Dhaka: UBINIG, 28 January 2004); সীমিত সংস্করণ।

....

উৎস

'কালের খেয়া', ১৯, সমকাল ‖ ঢাকা, ১৪ অক্টোবর ২০০৫

গয়রহ

১২
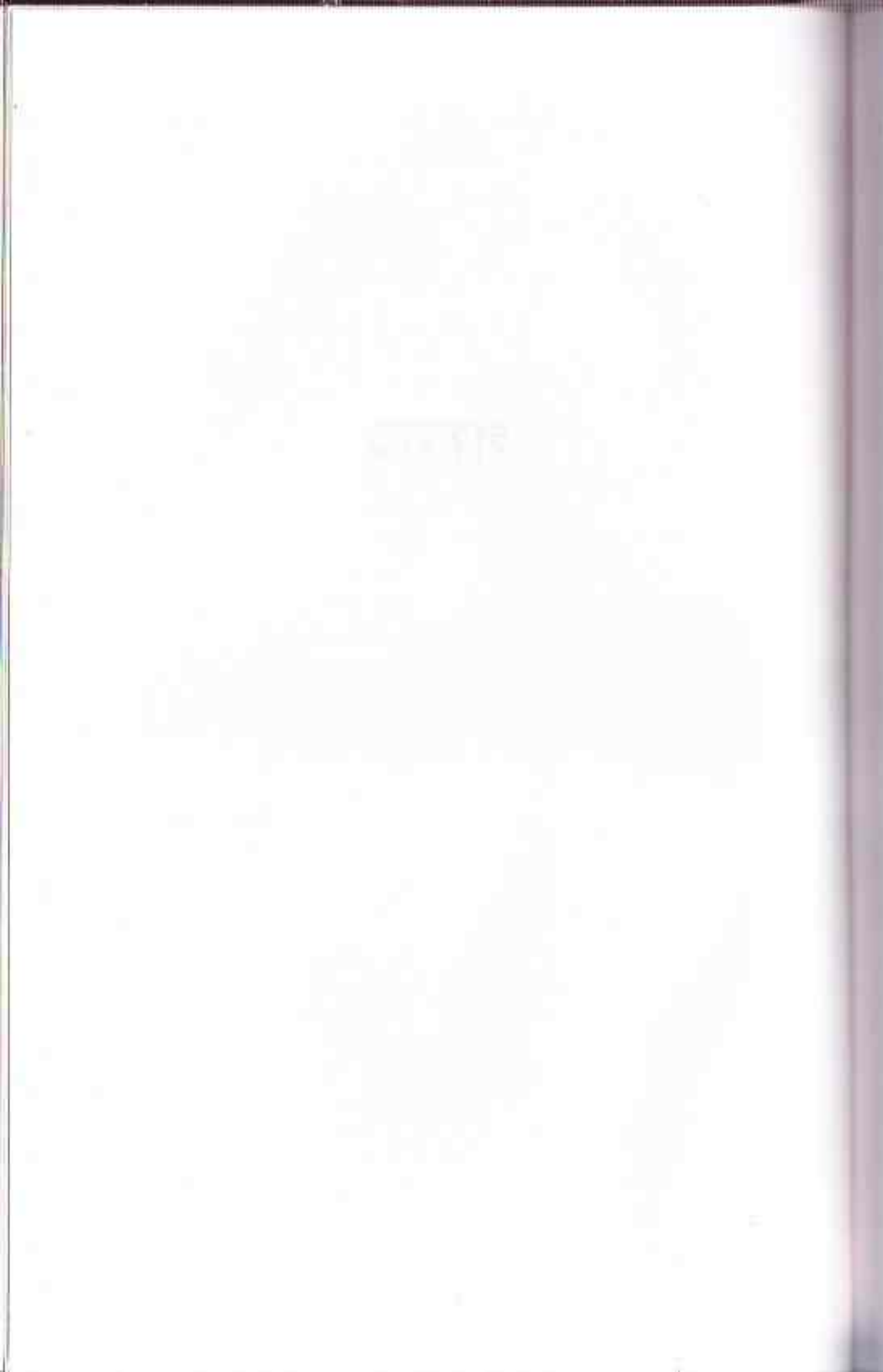
নজরুল ইসলামের সাকার, আকার ও নিরাকার

> আল্লা কে বোঝে তোমার অপার লীলে।
> তুমি আল্লা ডাক আল্লা বলে ॥
>
> নৈরাকারে তুমি নূরী
> ছিলে ডিম্ব অবতারি
> সাকারে সৃজন, গঠলেন ত্রিভুবন
> আকারে চমৎকার ভাব দেখালে ॥
>
> —ফকির লালন শাহ (২০০০: ৫৩)

এই প্রবন্ধের নামে ব্যবহৃত 'সাকার' 'আকার' ও 'নিরাকার' শব্দ তিনটি ফকির লালন শাহের গান থেকে নেওয়া। এই তিন শব্দকে ফরাসি দার্শনিক জাক লাকাঁ প্রবর্তিত তিনটি শব্দের—যথাক্রমে 'ইমাজিনারি' (imaginary), 'সিম্বলিক' (symbolic) ও 'রিয়েল' (real)—তর্জমা হিসাবেই গ্রহণ করা যায়। লাকাঁর মতে, 'ইমাজিনারি' শব্দটির মূলে আছে ইমেজ বা ছবি। মূর্তিও বলতে পারি বাংলায়। ইমাজিনারির অপর অর্থ: মনগড়া বা কাল্পনিক থেকেও আমরা কিছু ইশারা পেতে পারি। সব মিলিয়েই সাকার। অপরদিকে ভাবের প্রকাশ আকারে—অক্ষরে, শব্দে। ভাব শব্দে আজকাল ইংরেজি 'আইডিয়া' (idea) বোঝায়, ভাবের আদি অর্থ ইংরেজি 'বিয়িং' (being)। সেই আদোর 'ভাব' অর্থে আকার বা প্রতীকরূপ গ্রহণ করে। কিন্তু খোদ 'ভাব' আদপে অপ্রকাশ্য বা নিরাকার। মানে যার আকার অসম্ভব। একেই জাক লাকাঁ বলেন রিয়েল। যথা মৃত্যু বা ঈশ্বর।

নজরুল ইসলামের রচনায় 'আল্লাহ' ও 'রসুল' শব্দ দুটির চলন ও গড়ন পর্যালোচনা করে আমরা সাকার, আকার ও নিরাকারের অর্থ দেখাবার চেষ্টা করব।

জাক লাকাঁর প্রস্তাব মোতাবেক শব্দ মাত্রই আকার বা সিম্বল। এবং তাঁর মতে: শব্দের অর্থ কেবল শব্দের ভিতরে থাকে না, থাকে তার চারপাশে—বাইরে, সমগ্র ভাষা জুড়ে। ভাষার সমস্ত এলাকা থেকেই শব্দ আপনকার অর্থ কুড়িয়ে আনে। অভিধানের প্রত্যেকটি শব্দের ব্যাখ্যা অভিধানের ভিতরের আর সমস্ত শব্দের উপর ভর করে। এই অর্থেই শব্দকে বলা হয়, 'সিগনিফায়ার' (signifier) বা অর্থপতি। কারণ শব্দের অর্থ স্থির নয়, চলিষ্ণু—নির্ধারিত নয়, নির্ধারক। পুরানা যুগের পণ্ডিতরা শব্দকে 'সাইন' বা অর্থের বাহক বলতেন। সেই ধারণা এখন অচল, বাতিলযোগ্য। পুরানো ধারণা মোতাবেক শব্দ কোন বস্তু বা ধারণার প্রতিনিধি মাত্র। নতুন ধারণা অনুসারে তা ঠিক নয়। শব্দের সাথে সম্পর্ক থেকেই ভাষায় অর্থের সঞ্চার। আধুনিক ভাষাবিদ্যার এটাই সবচেয়ে বড় আবিষ্কার। নজরুল ইসলামের কয়েকটি গানে 'আল্লাহ' ও 'রসুল' শব্দের ব্যবহার কোন কোন অর্থে শব্দের এই সার্বভৌম বা অর্থপতি চরিত্র প্রকটিত করে—তা দেখানোই আমার ইচ্ছা।

১

জাক লাকাঁর প্রস্তাব অনুসরণ করে বলা যায়, ভাষার সকল শব্দ দুই প্রস্ত নিয়মের অধীন। কখনো এক শব্দকে সরিয়ে বা নাবিয়ে দিয়ে আর শব্দ তার জায়গা নেয়। এতে অর্থ বাড়ে, কমেও হয়তো বা। এই নিয়মের নাম মেটাফর (metaphor) বা রূপান্তর। বাংলায় এর নাম রূপক। ভাষায় শব্দ গড়বার দ্বিতীয় নিয়মের নাম মেটোনিমি (metonymy) বা নামান্তর। ধরতাই বাংলায় লক্ষণা। এক শব্দ গড়িয়ে আর শব্দের অর্থ গ্রহণ করে, কিংবা এক শব্দকে ঠেলে সরিয়ে আর শব্দের অভিষেক হয়। এইভাবে অর্থের গতি বিধান করাই লক্ষণার প্রধান লক্ষণ।

রূপক আর লক্ষণা—মেটাফর ও মেটোনিমি—ব্যাকরণের দুই অলঙ্কার মাত্র নয়। ভাষার সমগ্র অস্তিত্ব—সকল শব্দই—এই দুই নিয়মের অধীন। জাক লাকাঁর এই তাৎপর্যপূর্ণ প্রস্তাবের পিছনে ভাষাবিদ্যা ও মনোবিশ্লেষণ বিদ্যার সমর্থন আছে। রোমান ইয়াকবসন ও জিকমুন্ট ফ্রয়েডের রচনা পড়েই জাক লাকাঁ তাঁর মতে পৌঁছান বলে আমরা জানি। ফ্রয়েডের জগদ্বিখ্যাত বই খাবনামা (*The Interpretation of Dreams*) এই বিষয়ের প্রথম সূত্রপাত করে। স্বপ্নের মধ্যে আমরা সিনেমার পর্দার মতন যেই ছবি দেখি, তা ফ্রয়েডের চোখে ভাষার মতন পাঠযোগ্য। তার এক একটা অংশ আর আর অংশের সাথে দুই নিয়মে সম্পর্কিত। একটির নাম কনডেনসেশন (condensation) বা ঘনা। ধরতাই বাংলায় সংক্ষেপণ। এটি রূপকের কাছাকাছি প্রক্রিয়া। অপরটির নাম ডিসপ্লেসমেন্ট (displacement) বা ঠেলা। ধরতাই বাংলায় বিক্ষেপণ। এটি নামান্তরের আত্মীয়া।

২

নজরুল ইসলামের গানের একটি 'ক্ষুদে সংগ্রহ থেকে আমি আমার দরকারি উদাহরণ জোগাড় করেছি। (ইসলাম ১৩৯৫) এই জাতীয় আলোচনার প্রয়োজন যদি আরো দেখা দেয় তো আরেক দিন মেসাল আরো দেওয়া যাবে। 'আল্লাহ' ও 'রসুলের' কথা বলতে নজরুল নানান ধরনের রূপক ও লক্ষণার শরণ নিয়েছেন। কল্পনার এই বিচিত্র স্ফূর্তি, রূপক ও লক্ষণার এই বিপুল আরোহ, চলতি ন্যায়বিদ্যার মাপে কখনো দুর্বোধ্য, কখনো বা অবোধ্য ঠেকে। আমার প্রস্তাব: ফ্রয়েডের অমর আবিষ্কার 'দি আনকন্সাস' (the unconscious) বা অজ্ঞাতসারকে যদি আমরা এই স্ফূর্তির আদি উৎস ধরে নেই তো এই সমস্যার এক প্রকার রাহা হয়। এই প্রবন্ধে তার ইশারা মাত্র করা গেল। বিস্তারের জন্য কিছু পরিসর চাই। আজ তা স্থগিত থাকবে।

নজরুলের এই দুটি চরণ বিবেচনা করা যাক:

> ইসলামের ঐ বাগিচাতে ফুটলো দুটি ফুল:
> শোভায় অতুল সে ফুল আমার আল্লা ও রসুল।
> (ইসলাম ১৩৯৫: ৩২)

এই রূপকে আল্লাহ ও রসুল সমতুল। তবে আরেক রূপকে নজরুল ইসলাম আল্লাহকে তরু আর রসুলকে ফুল বলেছেন।

> আল্লাহ রসুল তরু আর ফুল প্রেমিক-হৃদয় জানে
> কেহ বা তরুরে ভালোবাসে ভাই, কেহ ফুল ধরে টানে।
> (ইসলাম ১৩৯৫: ২৬)

আরেক রূপকে নজরুল আল্লাহকে বলেছেন 'বীজ'। আর রসুলকে বীজ পুঁতবার যেই জমি তার 'পত্তনীদার'।

> (আমি) আল্লাহ নামের বীজ বুনেছি, এবার মনের মাঠে
> ফলবে ফসল, বেচব তারে কেয়ামতের হাটে
> পত্তনীদার যে এই জমির
> খাজনা দিয়ে সেই নবীজীর
> বেহেশতেরই তালুক কিনে ব'সব সোনার খাটে
> (ইসলাম ১৩৯৫: ২২)

ইসলামের শাস্ত্রীয় বিশ্বাস অনুসারে আল্লাহ নিরাকার। তিনি কারো জন্মের কারণ নন, কেউ তাঁকে জন্মও দেন নাই। তথাপি ভাষায় তিনি একটা আকার হিসাবে—

শব্দ আকারে—হাজির। তাঁর প্রকাশ 'আল্লাহ্' নামে। নাম মাত্রই আকার বা প্রতীক, এটুকু মনে রাখা বাঞ্ছনীয় এখানে। নিরাকার, নিরঞ্জন, ঈশ্বরের কথা দুনিয়ার আর পাঁচ ধর্মশাস্ত্রে আছে। কথা মাত্রই যখন আকার তখন তাহা ঈশ্বর।

আল্লাহ বা ইয়াহবেহ—যা-ই উচ্চারণ করি না কেন—উচ্চারণ ঘটা মাত্রই আকারের উদ্ভব এবং নিরাকারের অবসান।

নিরাকারে তুমি নূরী
ছিলে ডিম্ব অবতারি—

এই যুক্তি অনুসারে নিরাকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব থেকে আকারস্বরূপ ঈশ্বরের (অর্থাৎ ঈশ্বর শব্দের) উদ্ভব নয়। ব্যাপার বরং অন্য।

'ঈশ্বর' শব্দ থেকেই 'নিরাকার ঈশ্বর' নামক ধারণার বা মানসছবির বা অর্থ-পরিবারের বপন। অর্থ-পরিবার কথাটা আমি ইংরেজি 'সিগনিফায়েড' (signified) শব্দের তর্জমা স্বরূপ লিখলাম। বপনের ইংরেজি এখানে প্রিসিপিটেশন (precipitation)। শব্দ হিসাবে ঈশ্বর আকারস্বরূপ বা সিম্বলিক এবং সেই শব্দকেন্দ্রিক যেই জগৎ তার নাম আকার-জগৎ (symbolic order)।

ভারতবর্ষাদি দুনিয়ার আর যেই পাঁচ মুলুকে মূর্তি বা বিগ্রহ পূজার চল আছে তাতে দেখা যায়, ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভা সেখানে দুই মাত্রার ছবি কিংবা তিন মাত্রার মূর্তিতে সাকার হয়েছে। জাক লাকাঁ কথিত 'ইমাজিনারি' এবং ফকির লালন প্রবর্তিত 'সাকার' এই পরিস্থিতিরই ইঙ্গিতবহ। ইসলামের শাস্ত্র—মানে নিরাকার—ছাড়িয়ে নজরুল ইসলাম সাকারে পৌঁছলেন কিভাবে তা আমরা উপরের কয়েক চরণে দেখলাম।

৩

আরো একটু দেখার আছে এক্ষণে। আল্লাহ ও রসুলের তাৎপর্য আলাদা। শাস্ত্র অনুসারে আল্লাহকে বড়জোর আকারে প্রকাশ করা যায়, কিন্তু মানুষ 'রসুল' যতদিন জীবনধারণ করতেন ততদিন তো সাকার ছিলেন। নবীর হাদিস অনুসারে জানা যায়: তাঁর কাছে আল্লাহর ওহি আসত। সেই কথা বাদ দিলে তিনিও আর দশ মানুষের সমান সাধারণ মানুষ। 'আনা বাশারুম মিসলুকুম ইল্লা ইয়ুহা আলাইয়া' (আমি তোমাদিগের মতনই মানুষ বটি)। সাকার নবীর রূপ-বন্দনায় নজরুল ইসলাম বৈষ্ণব ভাবধারায় আপন্ন:

আল্লাহ থাকেন দূর আরশে নবীজী রয় প্রাণের কাছে
প্রাণের কাছে রয় যে প্রিয়

সেই নবীরে পরাণ যাচে
পয়গম্বরও পায় না খোদায় মোর নবীরে সকলে পায়

... ...

খোদার নামে সেজদা করি
নবীরে মোর ভালবাসি
খোদা যেন নূরের সুরুজ
নবী যেন চাঁদের হাসি।

নবীরে মোর কাছে পেতে
হয় না পাহাড় বনে যেতে
বৃথা ফকির দরবেশ মরে
পুড়ে খোদার আগুন মাঝে।

(ইসলাম ১৩৯৫: ৩০)

নজরুল ইসলামের ইমাজিনারি বা সাকার-বন্দনা বৈষ্ণবকবির সাকার-নিষ্ঠার আকার গ্রহণ করে। ইসলামের পয়গম্বরকে আকার জগতের বা বিধানের প্রতিনিধি হিসাবে নেওয়ার পরিবর্তে সাকার জগৎ বা প্রেমের গৌরাঙ্গ হিসাবে নেওয়া সাহসের নিদর্শন ও অজ্ঞান সত্যের প্রমাণ। নজরুল তা-ই রেখেছেন।

যে রসুল বলতে নয়ন ঝরে
সেই রসুলের প্রেমিক আমি
চাহে আমার হৃদয়-লায়লী
সে মজনুরে দিবস-যামী
ফরহাদ সে আমি শিরী ...

(ইসলাম ১৩৯৫: ৯৬)

নজরুলের রসুল বর্ণনা মনোহর। তার বড় রূপক চাঁদ। পয়গম্বর সাহেবের কায়িক সৌন্দর্য এই রূপকে প্রকটিত:

নূরের দরিয়ায় সিনান করিয়া
কে এলো মক্কায় আমিনার কোলে
ফাগুন-পূর্ণিমা-নিশীথে যেমন
আসমানের কোলে রাঙা-চাঁদ দোলে।

(ইসলাম ১৩৯৫: ৭৬)

আরো মজার রূপক সওদাগর, দুলা এবং রাখাল। নজরুল লিখেছেন:

ইসলামের ঐ সওদা লয়ে এল নবী সওদাগর
বদনসীব আয়, আয় গুনাহগার, নতুন করে সওদা কর

... ...

মারগ হতে পথ ভুলে এ এল মদিনা শহর
নামে মোবারক মোহাম্মদ, পুঁজি 'আল্লাহু আকবর'
(ইসলাম ১৩৯৫: ৩৩)

কিংবা আরেকবার যেমন বলেছেন নজরুল:

মদিনাতে এসেছে সই নবীন সওদাগর
সে ইরাজহরতের চেয়ে অধিক মনোহর
(ইসলাম ১৩৯৫: ৮৬)

অন্যত্র নবীর রূপ বর বা দুলার মতন:

দেখে যা রে দুলা সাজে সেজেছেন মোদের নবী
বর্ণিত সে-রূপ মধুর হার মানে নিখিল কবি।
(ইসলাম ১৩৯৫: ৭০)

নজরুলের রসুলবন্দনা শাস্ত্রের মুখাপেক্ষী নয়। নবীজীবনী আর বৈষ্ণবকাহিনী খানিক মিশিয়ে নজরুলের সাকার নবীমূর্তি গ্রহণ করেন:

মেষ চারণে যায় নবী কিশোর রাখালবেশে
নীল রেশমী রুমাল বেঁধে চারু চাঁচর কেশে
তাঁর রাঙা পদতলে পুলকে ধরা টলে
তাঁর রূপলাবনীর ঢালে মরুভূমি গেল ভেসে।

তাঁর মুখে বহে চাহি মেষশিশু তৃণ তুলি
বিশ্বের শাহানশাহ আজ মাখে গোঠের ধূলি
তাঁর চরণনখরে কোটি চাঁদ কেঁদে মরে
তাঁরে ছায়া ক'রে চলে আকাশের মেঘ এসে
কিশোর নবী গোঠে চলে।

তাঁর চরণ-ছোঁওয়ায় পথের পাথর মোম হয়ে যায় গলে
তসলিম জানায় পাহাড়
চরণ ঝুঁকে তাঁহার
নারঙ্গী আঙুর খজুর পায়ে নজরানা দেয় হেসে।
(ইসলাম ১৩৯৫: ৯০)

৪

বন্দনায় নজরুল ইসলাম বেশির ভাগ সাকারের আশ্রয় নিয়েছেন। এই কথা সত্য। তবে সাকারের সাথে শুদ্ধ আকার-বন্দনায়ও তার যাওয়া কম নয় বলা যায়। এই আকার থেকেই সাকারের যাত্রা। নজরুল বলেন:

ও নামের রওশন জমীন আসমান
ও নামে মাখা তামাম জাহান
ও নাম দরিয়ায় বহায় উজান
ও নাম ধেয়ায় মরু ও পর্বত
আমার নবীর নাম জপে নিশিদিন
ফেরেশতা আর হুরী পরী জিন
ও নাম যদি আমার ধ্যানে রয়
পাব কিয়ামতে তাঁহার শাফায়াত॥
(ইসলাম ১৩৯৫: ১৯)

নবীর নামকে নজরুল ইসলাম নতুন ব্যঞ্জনা দেন। নামের এই আকার ভাবের সাকাররূপে প্রকাশ পায়। পুরো গানটি তুলে দিতে পারি এই প্রয়োজনে:

হে প্রিয় নবী, রসুল আমার
পরেছি আভরণ নামেরই তোমার
নয়নের কাজলে তব নাম
ললাটের টিপে জ্বলে তব নাম
গাঁথা মোর কুন্তলে আহমদ
বাঁধা মোর অঞ্চলে তব নাম
দুলিছে গলে মোর তব নাম মণিহার
তাবিজ অঙ্গুরী তব নাম
বাজু ও পৌঁচী চুড়ি তব নাম
দুলিছে গলে মোর তব নাম
ভয়ে ভয়ে পথে পথে ঘুরি যে
পাছে কেউ করে চুরি তব নাম
ঐ নাম রূপ মোর ঐ নাম আঁখি ধারা
বুকের বেদনা ঢাকা তব নাম
প্রাণের পরতে আঁকা তব নাম
ধ্যানে মোর জ্ঞানে মোর তুমি যে,

প্রেম ও ভক্তিমাখা তব নাম
প্রিয় নাম আহমদ জপি আমি অনিবার ॥
(ইসলাম ১৩৯৫: ১০৭)

এই ধ্যানের আকার খুব অল্প আয়াসেই নজরুলের চোখে রূপের লহর তুলে নাচে:

আমিনার কোলে নাচে হেলেদুলে
শিশু নবী আহমদ রূপের লহর তুলে
রাঙা মেঘের কাছে ঈদের চাঁদ নাচে
যেন নাচে ভোরে আলো গোলাব গাছে
চরণে ভোমরা গুঞ্জরে গুল ভুলে ॥
(ইসলাম ১৩৯৫: ২৫)

এই নাম সঙ্কীর্তন শুদ্ধ রসুলের নয়, আল্লাহরও। নজরুল বলেন, 'শত ঈদের চাঁদও দিতে নারে আল্লাহ নামের দান ॥' (ইসলাম ১৩৩৫: ৯০) আল্লাহ ও রসুল নামের একত্র বন্দনায় আবার দামের প্রশ্ন:

(মোরা) রসুল নামের ফুলে এনেছি রে
আয় গাঁথবি মালা কে?
এই মালা দিয়ে রাখবি বেঁধে
আল্লাহতালাকে

অতি অল্প ইহারই দাম
শুধু আল্লাহ রসুল নাম
এই মালা পরে দুঃখশোকের
ভুলবি জ্বালাকে ॥
(ইসলাম ১৩৯৫: ৯১)

৫

রূপকের নিয়মই, আমরা দেখলাম, নজরুল ইসলামের প্রধান প্রবণতা। এই লক্ষণকে ইয়াকবসন রোমান্টিক কবিতার বৈশিষ্ট্য মনে করেন। তাঁর মতে গদ্যের—বিশেষত উনিশ শতকিয়া এয়ুরোপীয় বর্ণনামূলক গদ্যের—স্বাতন্ত্র্য লক্ষণার ব্যবহারে। নজরুলের কোন কোন রচনায় শব্দের নামান্তর বা লক্ষণার আবির্ভাব দেখতে পাওয়া কঠিন নয়। নজরুল দেখিয়েছেন কি সহজে নবীর নাম 'আহমদ' আল্লাহর নাম 'আহাদের' লক্ষণা হয়ে ওঠে।

এই ক্ষেত্রে নজরুল মৌলিক—এই দাবি আমি করছি না। লালন ফকিরও একই লক্ষণার শরণ নিয়েছেন বহু আগেই। নজরুলের লক্ষণা তবুও স্বতন্ত্র:

মিম হরফ না থাকলে যে আহদ
নামে মাখা যাঁর শিরীন্ শহদ
নিখিল প্রেমাস্পদ আমার মোহাম্মদ
ত্রিভুবন উজালা ॥
(ইসলাম ১৩৯৫: ৩১)

কিংবা:

আহমদের ঐ মিমের পর্দা
উঠিয়ে দেখ মন
আহাদ সেথায় বিরাজ করেন
হেরে গুণীজন ॥
(ইসলাম ১৩৯৫: ৩১)

ফকির লালন শাহের গানেও আমরা এই লক্ষণার আনাগোনা দেখি। লেখার সীমা যেন বেড়ে না যায় তাই আমি নজির কমিয়ে দেব। লালন বলেন:

আহাদে আহাম্মদ এসে
নবী নাম তাই জানালে।
নবী যে তনে করিল সৃষ্টি
সে তন কোথায় রাখিলে ॥

আহাদ নামে পরোয়ার
আহম্মদ রূপে সেহি এবার
জন্ম মৃত্যু হয় যদি তার
শরার আইন কই চলে ॥
(শাহ ২০০০: ৬৫)

৬

নজরুল ইসলাম আল্লাহর রসুল মোহাম্মদকে কল্পনা করেছেন সাকারে, নানান রূপকে, বিচিত্র বেশে। তাঁকে ডেকেছেন 'মদিনার বুলবুলি', 'মদিনার নাইয়া', 'মদিনাবাসী প্রেমিক', 'কাণ্ডারী', 'দীনের বাদশা', 'মদিনা দুলাল', 'কিশোর-রাখাল', 'তরুণ প্রেমিক' ও 'শিশু ইসলাম' প্রভৃতি অপরূপ নামে। বলেছেন তাঁকে 'আমিনা-

লালা', 'গুলে-লালা', 'কমলী-ওয়ালা', 'ঈদের-চাঁদ', 'সোনার-চাঁদ' এবং 'আল আরাবী সাকী' ইত্যাকার বিচিত্র রূপে। নবীজী নজরুলের চোখে:

মদিনার শাহানশাহ কোহ-ই-তুর বিহারি
মোহাম্মদ মোস্তফা নবুয়তধারী
আল্লাহ প্রিয় সখা, দুলাল মা আমিনার
খাদিজার স্বামী, প্রিয়তম আয়েশার আসাবের হামদম ওয়ালেদ ফাতেমার
বেলালের আজান, খালেদের তলোয়ার
কেয়ামতে উম্মত শাফায়াতকারী
(ইসলাম ১৩৯৫: ৮৭)

এবং তাঁর উপসিদ্ধান্ত:

(আছে) আল্লা আমার মাথার মুকুট
রসুল গলার হার।
(ইসলাম ১৩৯৫: ৭২)

তাঁর সিদ্ধান্ত 'আল্লাহ' ও 'রসুল' ব্যবসায় তিনিও শরিক হবেন:

আমি বাণিজ্যেতে যাব এবার মদিনা শহর
আমি এ দেশে হায় গোনাহগারি ছিলাম জীবন ভর
পাঞ্জেগানার বাজার যেথা বসে দিনেরাতে
দু'টি টাকা 'আল্লাহ রসুল' পুঁজি নিয়ে হাতে
কত পথের ফকির সওদা করে হল সওদাগর।
(ইসলাম ১৩৯৫: ২২-২৩)

সাকারে যে ভালোবাসার চাহিদা তার সীমা আছে। কিন্তু আকারে অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই চাহিদা পরিণত হয় শুদ্ধ বাসনায়। এই বাসনার শেষ কোথায় কেউ জানে না। এই অজানারই অপর নাম বেহেশতি আরাম। প্রয়োজন যদি যুক্ত হয় নিরাকারের সঙ্গে এবং চাহিদার সম্পর্ক যদি সাকারের সঙ্গে তবে বাসনার দীপশিখা শুদ্ধ জ্বলে নামের মহিমায়। আকারেই শুদ্ধ বাসনার ভাষা পরিণতি পায়:

ফেরি করি ফিরি আমি
আল্লাহ নবীর নাম।
দেশ-বিদেশে পথে ঘাটে
হাঁকি সুবহ-শাম
কলমা শাহাদাতের বাণী

যে বারেক বলে একটুখানি
সে চাওয়ার অধিক দেয় আমারে

মোর সওদার দাম
দাম দিয়ে সব দুনিয়াদারীর
দামী জিনিস চায়
অমূল্য এই আল্লারই নাম
কেউ চাহে না হায়।

আল্লাহ নামের ফেরিওয়ালায়
ডাকে ওরা শেষের বেলায়
ঐ নাম দিয়ে সে আখেরে পায়
বেহেশ্‌তী আরাম ॥
(ইসলাম ১৩৯৫: ৭৯-৮০)

আকার ও সাকার চাহিদা ও বাসনার দুই লক্ষ্য। আকার, সাকার ও নিরাকার এই তিন নিয়ে আমাদের জগৎমালা। এই তিনের সম্পর্ক এমন যে একটিকে বাদ দিলে তিনটিই অচল।

নিতান্ত সাকার বা খামোকা আকারনিষ্ঠায় বাসনার নির্বাপণ হয় না। প্রাণ চায় নিরাকার নিরঞ্জন। কিন্তু প্রাণের সেই চাওয়া কখনোই পূর্ণ হবার নয়। নিরাকার মানে সত্যস্বরূপ, কিন্তু সেই সত্য অপ্রকাশ্য। কিংবা—জাক লাকাঁ যেমন বলেন—নিরাকার মানে না-থাকা, অসম্ভব-থাকা (The real is impossible)।

আকার ও সাকারকে যদি আমরা নিরাকার নিরঞ্জনের দুই রকম প্রকাশ ধরি তবে নিরাকারের গূঢ় অর্থ প্রকাশিত হয়। নিরাকার যদি না থাকে তো আকার ও সাকার অর্থ হারায়। এখানেই নিরাকারের তাৎপর্য। এই তাৎপর্য বাদ দিলে ঈশ্বর ও নিরীশ্বর অভেদ।

ঈশ্বর শব্দের ভিতর যে অর্থ উপস্থিত তার পরিবার কোথায়? সেই পরিবারের নাম 'অজ্ঞাতসার', অথবা—লালন ফকির যাকে বলেছেন—'অচিনদেশ'। নজরুল ইসলামের নিরাকার বাসনা সেই অজ্ঞাতসারের ভিতরে থাকে।

এ নিখিল দুনিয়া জাহান।
নিশিদিন জমীন ও আসমান ॥
খুঁজিয়া তোমারে প্রভু।
করিল তব গুণগান।

ডাকিতে বিশ্ব শিশুর প্রায়।
ফেরেশতা হুরপরী ইনসান ॥
ব্যাপিয়া আজ ত্রিভুবন।
ধরিতে চাহে তবু প্রাণ ॥

দোহাই

১. ফকির লালন শাহ, *লালন-সঙ্গীত*, দ্বিতীয় খণ্ড, ফকির আনোয়ার হোসেন (মন্টু শাহ) সম্পাদিত, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ (ছেঁউড়িয়া, কুষ্টিয়া: লালন মাজার শরীফ ও সেবা-সদন কমিটি, ২০০০)।

২. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল ইসলামী সঙ্গীত*, সম্পাদকের নাম ছাড়া (কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৩৯৫)।

৩. Jacques Lacan, *Écrits: A Selection*, A. Sheridan, trans. (New York: W. W. Norton, 1977).

....

উৎস
প্রথম আলো ॥ জুলাই ২০০০
অচেতন ॥ ঢাকা, ৬ মে ২০০১

১৩

কাজী নজরুলের অজ্ঞান

> Let us say that the limit of the *Unbewusste* is the *Unbegriff*—not the non-concept, but the concept of a lack.
>
> *অজ্ঞানের সীমানা অধারণা—মানে ধারণার অভাব—নয়, বরং অভাবের ধারণা—এই কথা বলা যেতে পারে।*
>
> —Jacques Lacan (1998: 26)

মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একদিন লিখেছিলেন: 'বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে দুঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নাই। বরং অন্যান্য ভাষার অপেক্ষা বাঙ্গালায় এই জাতীয় কবিতার আধিক্য।' (চট্টোপাধ্যায় ১৯৯৫: ২৫৬) বাংলাদেশে গীতিকাব্যের এত বাহুল্য কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছিলেন, 'বাংলা মুলুকে গীতিবাহুল্যের কারণ বাংলার জলবায়ু।' বঙ্কিমের জবানেই শোনা যাক:

> তথাকার তাপ অসহ্য, বায়ু জলবাষ্পপূর্ণ, ভূমি নিম্না এবং উর্ব্বরা এবং তাহার উৎপাদ্য অসার, তেজোহানিকারক ধান্য। সেখানে আসিয়া আর্য্যতেজঃ অন্তর্হিত হইতে লাগিল, আর্য্যপ্রকৃতি কোমলতাময়ী আলস্যের বশবর্ত্তিনী এবং গৃহসুখাভিলাষিণী হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমরা বাঙ্গালার পরিচয় দিতেছি। এই উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল। সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখপরায়ণ। সে কাব্যপ্রণালী অতিশয় কোমলতাপূর্ণ, অতি সুমধুর, দম্পতিপ্রণয়ে শেষ পরিচয়। অন্য সকল প্রকারের সাহিত্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া, এই জাতিচরিত্রানুকারী গীতিকাব্য সাত-আট শত বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের জাতীয় সাহিত্যের পদে দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য গীতিকাব্যের এত বাহুল্য। (চট্টোপাধ্যায় ১৯৯৫: ২৫৭–৫৮)

আমি তুমি সে

কোন দেশের জলবায়ু দিয়ে সেই দেশের জাতিচরিত্র গঠিত হয় এবং জাতিচরিত্র অনুসারে সেই জাতির সাহিত্য হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্ত মোটের উপর যদি এই বলে আমরা ধরে নিতে পারি তবে বলা যায়, তাঁর বক্তব্য অতি-সরলতা দোষে দুষ্ট। 'কোমৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যেরূপ তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ তদ্রূপ করিতে পারেন নাই'—এই কথা বলার পর বঙ্কিমচন্দ্র তদ্রূপ চেষ্টায় নেমেছিলেন। দুঃখের মধ্যে মহাত্মার সেই চেষ্টা সফল হয়নি। বাংলায় গীতিকাব্যের বাহুল্য কেন?—এই সওয়ালের জওয়াব হয়নি।

কোন দেশের কবিতার চরিত্র নির্ণয়ে সেই দেশের আবহাওয়ার ভূমিকা বড়জোর গৌণ—আমরা সবিনয়ে এই কথা নিবেদন করব। কবিতার চরিত্র নির্ণয়ে কবির অজ্ঞানই প্রধান ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের গীতিকবিতার ইতিহাস থেকে এই প্রস্তাব সমর্থন করা যায় কি না, সেটা আমরা দেখতে চাই। কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা এখনো এই প্রস্তাব অনুসারে বিচার করা হয়নি। করা হলে—আমার ধারণা—বিস্ময়কর ফলাফল পাওয়া যাবে।

১

বাংলা মুলুকে এয়ুরোপীয় শাসন প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত যেই গীতিকবিতা উৎপাদিত হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করেন। বঙ্কিমের সম্মানে এঁদের বলা যায় যথাক্রমে জয়দেব শ্রেণী ও বিদ্যাপতি শ্রেণী। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন: 'জয়দেবাদিতে বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য। বিদ্যাপতি প্রভৃতিতে অন্তঃপ্রকৃতির রাজ্য।' (চট্টোপাধ্যায় ১৯৯৫: ২৫৮) প্রমাণ—বঙ্কিমের বিচারে—জয়দেব, বিদ্যাপতি উভয়েই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কথা গীত করেন কিন্তু জয়দেব যেই প্রণয়গীত করেন, তা বহিরিন্দ্রিয়ের পিছনে ছোটে আর বিদ্যাপতির কবিতা বহিরিন্দ্রিয়ের বাইরে। ভাল কথা। পরাধীন যুগের বাংলা কবিতার দোষের মধ্যে বঙ্কিম দেখেছেন প্রগাঢ়তা গুণের অভাব:

> বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতার বিষয় সংকীর্ণ, কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ়: মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতার বিষয় বিস্তৃত, বা বিচিত্র, কিন্তু কবিত্ব তাদৃশ প্রগাঢ় নহে। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, কবিত্বশক্তির হ্রাস হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, ইহা তাহার একটি কারণ। (চট্টোপাধ্যায় ১৯৯৫: ২৫৯)

যদি আমরা ধরে নিতে পারতাম জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানের হ্রাস ঘটে তবে বঙ্কিমচন্দ্রের বিচার ঠিক থাকত। দুর্ভাগ্যের মধ্যে 'জ্ঞান' ও 'অজ্ঞান' পরস্পরবিরোধী শব্দ নয়। কারণ অজ্ঞান শব্দটির প্রকৃতি অনুসারে অর্থ করি তো বুঝতে পারি অজ্ঞান মানে জ্ঞানের অভাব নয়, এক ধরনের জ্ঞান, এক্ষণে অ-এর বা অভাবের জ্ঞান।

ফ্রয়েডের আবিষ্কারের গোড়ার কথা এই 'অ-জ্ঞান' বা 'অ-ভাব'। কিন্তু মহান আবিষ্কর্তার শিষ্যশাবকরা এই অর্থ কিছুদিন হারিয়ে ফেলার পর অন্য এক মহাত্মা— তাঁর সুনাম জাক লাকাঁ—দিশা ফিরিয়ে এনেছেন। তিনি বলেন:

> বহিঃ ও অন্তঃ এই দুই প্রকৃতির মধ্যে যদি কোন ছেদ থেকে থাকে, তবে তার নামই 'অ'। অভাব বা অজ্ঞান সেখানেই অর্থ গ্রহণ করে। (লাকাঁ ১৯৯৮: ২৫)

আমি ও আমার নামের মধ্যে কী পার্থক্য? নাম নাই তো আমি কে? নাম নাই তো আমিও নাই। অতএব নাম এক দেশ, একটি জায়গা। নাম দিয়েই ভাষা। তাই ভাষার প্রথম রূপ দেশ। অজ্ঞান প্রথম এই দেশেই দেখা দেয়। কিন্তু দেশ আমার শেষ নয়। আমার নামে আমি আছি, তবু নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিচার অনুসারে কবিতার অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির যথার্থ সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধের কারণে উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে:

> যখন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তাহা অন্তঃপ্রকৃতির সেই ছায়া সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। যখন অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনীয় তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়া সমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যিনি ইহা পারেন, তিনিই সুকবি। ইহার ব্যতিক্রমে এক দিকে ইন্দ্রিয়পরতা, অপর দিকে আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মে। এ স্থলে শারীরিক ভোগাসক্তিকেই ইন্দ্রিয়পরতা, বলিতেছি না—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আনুরক্তিকে ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি। (চট্টোপাধ্যায় ১৯৯৫: ২৫৯)

বঙ্কিমচন্দ্র ইন্দ্রিয়পরতা দোষের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন জয়দেব ও কালিদাস নামে, আর আধ্যাত্মিকতা দোষের নাম করেছেন পোপ ও জনসনের উদাহরণ দিয়ে। পরাধীন বাংলাদেশের কবিগণ বঙ্কিমের চোখে 'কিয়দংশে আধ্যাত্মিকতা দোষে দুষ্ট'। তিনি ব্যতিক্রম পেয়েছিলেন একমাত্র মাইকেল মধুসূদন দত্তে। বিচারকের চোখে: 'মধুসূদন, যেরূপ ইংরেজি কবিদিগের শিষ্য, সেইরূপ কতক দূর জয়দেবাদির শিষ্য, এই জন্য তাঁহাতে আধ্যাত্মিক দোষ তাদৃশ স্পষ্ট নহে।' (চট্টোপাধ্যায় ১৯৯৫: ২৫৯) রূপ ও দূর, ইংরেজ ও বাঙালি, এই পার্থক্যের ফাঁক দিয়েই মধুসূদনের অজ্ঞান প্রথম দেখা যায়। কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়েও কি একই কথা বলা যায়? এই প্রবন্ধে সেটাই আমাদের নির্বন্ধ।

২

কাজী নজরুলের *অগ্নিবীণা* ১৯২২ ইংরেজি সনের অক্টোবরে (বা ১৩২৯ বাংলা সালের কার্তিক মাসে) বই আকারে বের হয়। সকলেই জানেন এই বইয়ের কবিতা গণনা

অনুসারে বারটি। সমালোচকরা এর মধ্যে কয়টি মুসলমান ভাবের কবিতা আর কয়টি হিন্দু ভাবের কবিতা তারও একটা তালিকা তৈরি করেছেন। 'শাত-ইল্-আরব' নামের কবিতাটি ছাপা হয় বাংলা ১৩২৭ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা মোসলেম ভারত পত্রিকায়। 'আগমনী' প্রকাশ পায় ১৩২৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা উপাসনা পত্রিকায়। এই সম্পর্কে উপাসনা-সম্পাদক শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কি লিখেছিলেন তা আবদুল কাদির তৎ-সম্পাদিত নজরুল রচনাবলীর পরিশিষ্টে উল্লেখ করেছেন:

> নজরুলের এক বিশিষ্ট দিকের কবিতা 'শাতিল আরব' যখন 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশ হয়, প্রায় ঠিক সেই সময়ে হিন্দুর দেব-দেবী নিয়ে প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় 'উপাসনা'য়—
>
> এ কি রণ-বাজা বাজে ঘনঘন।
>
> (ইসলাম ১৪০৩: ৮৮৬)

সাবিত্রীপ্রসন্ন মহাশয় যাকে বিশিষ্ট দিক বলেছেন সেটা কী জিনিস? হিন্দু দেব-দেবীর বিপরীত কোন মুসলমান দেব-দেবী কি? কাজী নজরুলের অজ্ঞান বাসনা কি এর মধ্যে ছায়া দেয়?

মোসলেম ভারত পত্রিকায় প্রকাশের সময় শাতিল আরব পরিচয় থেকে লেখা নোটে 'একজন সৈনিক' জানান:

> টাইগ্রীস (দিজলা) আর ইউফ্রেটিস (ফোরাত) বসরার অদূরে একজোট হয়ে 'সাতিল আরব' নাম নিয়েছে। তার পর, বসরার পাশ দিয়ে বয়ে পারস্য-উপসাগরে গিয়ে পড়েছে। এর তীরে দু' তিন মাইল করে চওড়া খর্জুর-কুঞ্জ; তাতে ছোট্ট নহর, তারই কূলে আঙুরলতার বিতান, বেদানা-নাশপাতির কেয়ারী। এখানে এলেই অনেক পুরানো স্মৃতি জেগে ওঠে আর আপনিই গাইতে ইচ্ছা করে—
>
> সাতিল-আরব! সাতিল-আরব! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
> শহীদের লোহু দিলীরের খুন ঢেলেছে যেখানে আরব-বীর।
>
> (ইসলাম ১৪০৩: ৮৮৭)

কাজী নজরুলের এই বিশিষ্ট দিকের কবিতা কি বিশিষ্ট? 'একজন সৈনিক' নামে তিনি 'চিত্র-পরিচয়' লিখেছিলেন, তিনি যদি নজরুল ইসলাম হন, তো আরো ভাল। পুরানো স্মৃতি জাগানোর জন্য তিনি সেখানে হাজির ছিলেন। কিন্তু তার প্রয়োজন ছিল না।

'ইকারুসের আকাশ' লেখার জন্য শামসুর রাহমানকে গ্রিসে যেতে হয় না, 'কাফকার জামা' সিকদার আমিনুল হক ঢাকাতেই সেলাই করেন। কিন্তু শাতিল আরবের তীরে আরো ঘটনা আছে। বাংলাদেশের কোন কোন মুসলমানের প্রিয় ফল আম নয়, খেজুর। এই উত্তর পাওয়ায় অনেকেই হেসেছেন। এদের মধ্যে শ্রীনীরদচন্দ্র

চৌধুরী থেকে জনাব বদরুদ্দীন উমর পর্যন্ত অনেকেই আছেন। নিঃসন্দেহে কাজী নজরুল ইসলাম এঁদের দল করেন না। তবে কার দল করেন নজরুল ইসলাম?

> খঞ্জরে ঝরে খর্জুর-সম হেথা লাখো দেশ-ভক্ত-শির!
> শাতিল্-আরব! শাতিল্-আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
>
> ইরাক বাহিনী! এ যে গো কাহিনী,
> কে জানিত কবে বঙ্গ-বাহিনী
> তোমারও দুঃখে "জননী আমার!" বলিয়া ফেলিবে তপ্ত নীর!
> রক্ত-ক্ষীর—
> পরাধীনা! একই ব্যথায় ব্যথিত ঢালিল দু' ফোঁটা ভক্ত-বীর।
> শহীদের দেশ! বিদায়! বিদায়!! এ অভাগা আজ নোয়ায় শির।
> (ইসলাম ১৪০৩: ৩৫)

এয়ুরোপে—জর্মানি ও ইংলন্ডের মধ্যে—১৯১৪ সালের যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলীয় অনেক দেশ—ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তিন ও জর্দানপার—তুরস্কের ওসমানিয়া সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। যুদ্ধের সময় বর্তমান ইরাকের জমি পর্যায়ক্রমে ইংরেজ বাহিনীর পদানত হয়। এই যুদ্ধেরই এক পর্যায়ে কুত-আল-আমারা নামক এক স্থানে (মধ্য ফোরাত অববাহিকায়) ইংরেজ সেনাপতি টাউনস্যান্ড দশ হাজার সৈন্যসহ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। নজরুল ইসলামের কবিতায়ও সেই কথার উল্লেখ আছে।

> 'কুত-আমারা'র রক্তে ভরিয়া
> দজ্‌লা এনেছে লোহুর দরিয়া;
> উগারি' সে খুন তোমাতে দজ্‌লা নাচে ভৈরব 'মস্তানী'র
> ত্রস্তা-নীর
> গর্জে রক্ত-গঙ্গা ফোরাত,—'[শাস্তি] দিয়েছি গোস্তাখীর!'
> দজ্‌লা-ফোরাত-বাহিনী শাতিল! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
> (ইসলাম ১৪০৩: ৩৪)

'দজ্‌লা-ফোরাত-বাহিনী শাতিল' এই পদ নজরুল ইসলামের কবিয়ানার—অজ্ঞানের একশেষ করেছে। শাতিল আরব দজ্‌লা ও ফোরাত বয়ে আসে দজ্‌লা ও ফোরাতের (গেরিলা) বাহিনী ও ডাকাত ইংরেজ বাহিনীর গোস্তাখি ও বেয়াদবির শাস্তি দিয়েছে।

ইঙ্গ-জর্মান যুদ্ধে তুরস্ক জর্মানির দল করেছে। ইরাকসুদ্ধ সকল আরব দেশ তুর্কি শাসনের হাত থেকে নিস্তার চায়। এই তথ্যে নিঃসন্দেহে ইংরেজ বাহিনী গোয়েন্দারাজ লরেন্স প্রভৃতির সহায়তায় সারাদেশে তুর্কিবিরোধী বিদ্রোহের

আয়োজনে জ্বালানি সরবরাহ করে। বিনিময়ে আরবদের স্বাধীনতা মঞ্জুরের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

কিন্তু ১৯১৬ সালের মাঝামাঝি ফরাসি ও ইংরেজ সরকার এক গোপন চুক্তির মাধ্যমে স্থির করে যে আরব জাহানকে তারা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেবে। ১৯১৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে রাশিয়ায় রাষ্ট্র পরিবর্তনের পর লেনিনের বিপ্লবী সরকার পুরানো জার সরকারের মহাফেজখানায় রক্ষিত দলিল ঘেঁটে 'সাইকস্-পিকো (Sykes-Picot) চুক্তি' নামে খ্যাত এই চক্রান্ত প্রকাশ করে দেয়।

বিক্ষোভ দেখা দেয়, কিন্তু ব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদের হাতেই ন্যস্ত থাকে। যুদ্ধের পর ইরাক ইংরেজদের হাতে পড়ে। চুক্তিতেও তা'ই লেখা ছিল। পরিবর্তনের মধ্যে পূর্বে যে প্রদেশটি ফরাসিদের ভাগে দেওয়ার কথা ছিল সেই মসুল অঞ্চলও ইংরেজদের হাতে পড়ে। ফলে বাগদাদ, বসরা ও মসুল মিলে গড়ে ওঠে নতুন ইরাক। কুর্দি ও কুয়েত সমস্যার এক উৎস এখানেই পাওয়া যায়।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরপরই ইরাকের নানা এলাকায় বিচ্ছিন্ন স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয়। দুটি বুর্জোয়া রাজনৈতিক মোর্চা গড়ে উঠে কিন্তু জনগণের উপর এদের প্রভাব ছিল সামান্য। পরবর্তী যুগের ইংরেজ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুগত ইরাকি প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতি নুরি আস সায়িদ এই যুগেরই নেতা।

১৯১৮ সালের বসন্ত নাগাদ নজফে এবং মধ্য ফোরাত এলাকার আর দুই-চার শহরে বিশাল বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৯১৯ সালের মে ও জুন মাসে শেখ মাহমুদ নামের এক নেতার অধীনে কুর্দি অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। সহি বড় ও আসল যুদ্ধ দেখা দেয় ১৯২০ সালের জুন মাসে। এই যুদ্ধ ছিল প্রকৃত জনযুদ্ধ। এই জনযুদ্ধে ইরাকের মধ্যশ্রেণীর সমর্থন নিয়ে শাতিল আরব ও দজলা-ফোরাতের দোয়াত অঞ্চলের বেদুয়িন আরবরা ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ে। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই যুদ্ধে ইংরেজদের হিসাব মতে ইরাকি হতাহতের সংখ্যা ৮,৪৫০ জন। ইংরেজপক্ষে নিহতের সংখ্যা ৪০০ বলে বলা হয়। এই যুদ্ধকে ইংরেজরা বিদ্রোহ বলে পরিচয় দেন। 'বিদ্রোহ' দমনে ইংরেজদের ব্যয় হয় ২ কোটি পাউন্ড, রাজস্বের ক্ষয়ক্ষতি হয় ৪ লাখ পাউন্ড। (কার্ক ১৯৫৫: ১৪৩)

বিদ্রোহের কারণ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। আশু কারণ, ইতিহাস লেখকরা বলেন, ১৯২০ সালে সান রেমো শহরে সাম্রাজ্যবাদী দেশের নেতারা আরব জাহানে নিজেদের দখল আইনসঙ্গত করার উদ্দেশ্যে যে সম্মেলন ডাকেন সেই সম্মেলন। ১৯২০ সালের বিদ্রোহে সমগ্র ইরাক এক প্রকার স্বাধীন হয়ে যায়।

ঐ বছরের নভেম্বরের আগে ইরাকে ইংরেজদের পূর্ণ কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই বিদ্রোহ দমনে ইংরেজ পক্ষ ১ লাখ ৫০ হাজার সৈন্য মোতায়েন করতে বাধ্য হয়। (আলেকসান্দ্রভ ১৯৮৬: ৪১২) সেই সময় সমগ্র ভারতবর্ষেও ঠিক এই সংখ্যায় সৈন্য মোতায়েন ছিল। এতেই অনুমান করা যায় এই যুদ্ধের বিস্তৃতি। (কার্ক ১৯৫৫:

১৪৩) অনুমান করতে আরো সুবিধা হয় যদি মনে রাখি, তখনকার ইরাকের জনসংখ্যা তখনকার ভারতীয় মোট জনসংখ্যার একশ ভাগের এক ভাগ। এই বিস্তৃতির পিছনে, ইংরেজ লেখকরাও উল্লেখ করেন—ইংরেজদের অত্যাচার একটি মাঝারি ভূমিকা পালন করে।

উদাহরণ হিসাবে তারা উল্লেখ করেন, ১৯১১ সালে তুর্কিরা যত টাকা আদায় করত ১৯২০ সালে ইংরেজরা তার চেয়ে সাড়ে তিন গুণ বেশি আদায় করে। কিন্তু আসল কারণ আরো গভীর।

১৯২০ সালের এই স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই কাজী নজরুল ইসলাম 'শাত-ইল-আরব' কবিতাটি লেখেন। ইতিহাসের পরিহাস—এই বিদ্রোহ দমনে ইংরেজ সরকার তার ভারতীয় বাহিনীকে বিপুল সংখ্যায় নিয়োগ করে, কাজী নজরুল নিজেও কিছুদিন আগ পর্যন্ত এসব বাহিনীর একটিতে সৈনিক ছিলেন। নজরুল লিখেছেন আরব বেদুয়িন সৈনিকদের প্রশংসানামা:

বহায়ে তোমার লোহিত বন্যা
ইরাক আজমে করেছে ধন্য—
বীরপ্রসূ দেশ হ'ল বরেণ্য মরিয়া মরণ মর্দবীর!
মর্দ বীর
সাহারায় এরা ধুঁকে মরে তবু পরে না শিকল পদ্মতির।
শাতিল্-আরব! শাতিল্-আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
(ইসলাম ১৪০৩: ৩৪)

পাছে কেউ ভাবেন নজরুল শুদ্ধ মর্দ বীরের আখড়ায় মগ্ন, তাই স্মরণ করি কবিতার প্রথম ভাগের বীর-নারীর কথা। নজরুলের জাতিভাবও রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদের ভিতর আটক হয় নাই। যেমন:

যুঝেছে এখানে তুর্ক-সেনানী,
য়ুনানি মিসরি আরবি কেনানি:—
লুটেছে এখানে মুক্ত আজাদ বেদুইনদের চাঙ্গা-শির!
নাঙ্গা-শির—
শমশের হাতে, আঁসু-আঁখে হেথা মূর্তি দেখেছি বীর-নারীর!
শাতিল্-আরব! শাতিল্-আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর!
(ইসলাম ১৪০৩: ৩৪)

নজরুল ইসলামের রাজনৈতিক আদর্শ কী? এই প্রশ্ন ঢের তোলা হয়েছে। কবি আবদুল কাদির বহুদিন থেকে প্রচার করে এসেছেন—নজরুল ইসলাম তুরস্কের নেতা কামালের অনুসারী। অন্ততপক্ষে তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রথম যুগে। আবদুল কাদিরের মতানুসারে, 'কামাল আতাতুর্কের সুশৃংখল সংগ্রামের পথেই তিনি

ভেবেছিলেন স্বদেশের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য সর্বাপেক্ষা সমীচীন পথ। (কাদির ১৩৭৩: সম্পাদকের নিবেদন) কামালের কথা তুলে নজরুল লিখেছিলেন:

> এই তো সত্যিকারের মুসলিম। এই তো ইসলামের রক্ত-কেতন। দাড়ি রেখে গোশত খেয়ে নামাজ রোজা করে যে খিলাফৎ উদ্ধার হবে না, দেশ উদ্ধার হবে না, তা সত্য মুসলমান কামাল বুঝেছিল, তা না হলে সে এতদিন আমাদের বাংলার কাছাখোলা মোল্লাদের মতন সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কাছা না খুলে কাবার দিকে মুখ করে হর্দম ওঠ বোস্ শুরু করে দিত। (ইসলাম ১৩৭৩: ৭৩৬)

নজরুল পরিষ্কার বলেন, ওসব ধর্মের ভণ্ডামি দিয়ে ইসলামের উদ্ধার হবে না 'ইসলামের বিশেষ তলোয়ার। দাড়িও নয়। নামাজ রোজাও নয়।' (ইসলাম ১৩৭৩: ৭৩৬) কিন্তু ইসলামি রূপান্তর নজরুলের বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির ভেদ বা অজ্ঞান থেকে এই ভাবে প্রকাশ পায়:

> দুশমন-লোহু ঈর্ষায় নীল
> তব তরঙ্গে করে ঝিল্-মিল্,
> বাঁকে বাঁকে রোষে মোচড় খেয়েছে পিয়ে নীল খুন পিণ্ডারীর!
> জিন্দা বীর
> 'জুলফিকার' আর 'হায়দরী' হাঁক হেথা আজো হজরত্ আলীর
> শাতিল্-আরব! শাতিল্-আরব!! জিন্দা রেখেছে তোমার তীর!
> (ইসলাম ১৪০৩: ৩৪)

বাংলা সাহিত্যে শোচনীয় ঘটনার অভাব নাই। নজরুল ইসলাম এই সাহিত্যের ভাষায় ও ভাবনায় যে বৈপ্লবিক আবিষ্কার সম্পন্ন করেছিলেন ১৯২০ সনে, তার ৮০ বছর পরও আমরা দেখছি সে আবিষ্কারের অর্থ লোকে আজো ঠিক করতে পারছে না।

বাংলায় হিন্দু ও মুসলিম-পুরাণ নজরুল ইসলামের আবিষ্কার এই কথা অস্বীকার করার জো নাই। এই দুই পুরাণের দুই দেয়ালের মাঝখানে একটি চিপা গলি আছে। ওই গলির নাম নজরুল ইসলামের গলি। আমরা একেই বলছি কাজী নজরুলের অজ্ঞান। নজরুলের এই অজ্ঞান হিন্দু ও মুসলমান প্রকৃতির বাইরে। এই প্রকৃতির নাম স্বাধীনতা। ইরাক-বাহিনীর সঙ্গে বঙ্গ-বাহিনীর তপ্ত নীর ফেলার নাম নজরুল ইসলামের অজ্ঞান। এই জ্ঞানই বাসনার দীপশিখা। পুনশ্চ বলি। ২০০৩ ইংরেজি সালে:

> পরাধীনা! একই ব্যথায় ব্যথিত ঢালিল দু' ফোঁটা ভক্ত-নীর।
> শহীদের দেশ! বিদায়! বিদায়!! এ অভাগা আজ নোয়ায় শির।
> (ইসলাম ১৪০৩: ৩৫)

দোহাই

১. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-রচনাবলী*, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, নতুন সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ (ঢাকা, ১৪০৩)।

২. ———, *নজরুল রচনাবলী*, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ১ম খণ্ড (ঢাকা, ১৩৭৩)।

৩. আবদুল কাদির, 'সম্পাদকের নিবেদন', কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-রচনাবলী*, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ১ম খণ্ড (ঢাকা, ১৩৭৩)।

৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *নির্বাচিত রচনা*, ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত (নতুন দিল্লি, ১৯৯৫)।

৫. V. Alexandrov, *A Contemporary World History*, 1917–1945 (Moscow, 1986).

৬. George E. Kirk, *A Short History of the Middle East*, 3rd ed. (London, 1955).

৭. Jacques Lacan, *The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis*, Jacques-Alain Miller, ed., Alan Sheridan, trans. (New York, 1998).

....

উৎস
যুগান্তর। ২৯ আগস্ট ২০০৩

১৪

জালাল উদ্দীন খাঁর ভাব, স্বভাব ও অভাব

আরবি 'জালাল' শব্দে 'গৌরব' বোঝায়। দীনের গৌরব জালাল উদ্দীন খাঁ জন্মে পূর্ব ময়মনসিংহের, কিন্তু বিষয় গৌরবে সারা বাংলা সংস্কৃতির। অধ্যাপক যতীন সরকার *জালালগীতিকাসমগ্র* প্রকাশোপলক্ষে লিখিত নাতিদীর্ঘ ভূমিকায় জালাল উদ্দীন খাঁর পরিচয় দিয়েছেন এই ভাবে:

> এককালে পূর্ব ময়মনসিংহের নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ ও তার আশপাশের সুনামগঞ্জ ও সিলেটের কিছু অংশ, এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নরসিংদি প্রভৃতি এলাকা নিয়েই গড়ে উঠেছিল একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতি-অঞ্চল। সে-অঞ্চলের কবিদের মধ্যে নারায়ণ দেব, দ্বিজবংশী দাস, চন্দ্রাবতী, গঙ্গারাম—এ-রকম কয়েকজনই মাত্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে 'মধ্যযুগের কবি' বলে স্থান পেয়েছেন। এঁদের বাইরে আছেন যে-কবিবৃন্দ, তাঁদের সবাইকে চিহ্নিত করা হয়েছে 'লোককবি' অভিধায়। এ-রকমই 'লোককবি' সুনামগঞ্জের হাছন রাজা ও রাধারমণ, নরসিংদির দ্বিজদাস ও হরিচরণ আচার্য, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মনমোহন দত্ত, নেত্রকোনার লাল মামুদ, সুলা গাইন, বিজয় নারায়ণ আচার্য, দীন শরৎ (শরৎচন্দ্র নাথ), কিশোরগঞ্জের রামু মালী, রামগতি শীল, রামকানাই নাথ। এঁরা এবং এ-রকম আরো যে-সব কবি পূর্ব ময়মনসিংহ ও তার আশপাশের অঞ্চলে উনিশ শতকে বাংলা কবিতার মূলধারাকে সচল রেখেছিলেন, তাঁদেরই প্রত্যক্ষ উত্তরসাধক বিশ শতকের জালাল উদ্দীন খাঁ। (সরকার ২০০৫: ভূমিকা, 'ছয়')

জালাল উদ্দীন খাঁর বংশধর গোলাম মোরশেদ খান লিখেছেন, প্রতি বছর নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় জালাল উদ্দীন খাঁর মুষ্টিমেয় অনুরাগী-অনুসারী ভক্ত তাঁকে স্মরণ করেন। তবে 'বৃহত্তর বিদ্বৎসমাজে' তিনি উপেক্ষিত, এই অভিযোগও মোরশেদ খান করেছেন। অভিযোগ অসত্য বা অসার নয়। মোরশেদ জানিয়েছেন, প্রায় এক হাজার গানের রচয়িতা ছিলেন তিনি। তাঁর প্রাণবিয়োগের আগে ও পরে

মোট পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত *জালালগীতিকা*য় মোট ৭২০টি গান স্থান পেয়েছে। বাদবাকি কী অবস্থায় আছে? পরিষ্কার কোন তথ্য দেননি তিনি। তবে তিনি বলেছেন, পূর্ব বাংলার হাটে-মাঠে তাঁর গান আজো নিত্য গাওয়া হয়। শিল্পী আব্বাস উদ্দীনের মতন বিখ্যাত মানুষ তাঁর গুণ গ্রহণ করেছেন।

তবু তাঁর গান চুরি গেছে কিছু। যতীন সরকার মহাশয় একটি উদাহরণ দিয়েছেন।

> মানুষ থুইয়া খোদা ভজ, এই মন্ত্রণা কে দিয়াছে
> মানুষ ভজ কোরান খোঁজ, পাতায় পাতায় সাক্ষী আছে

এটা জালাল খাঁর বিখ্যাত গান। অধ্যাপক সরকারের মতে এই গানটি জালালের কবিকৃতির প্রধানতম বৈশিষ্ট্যও ধারণ করে। *জালালগীতিকা* প্রথম খণ্ডে গানটি ছাপা আছে। সেই ১৯৪৭-৪৮ সালের কথা। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সম্পাদিত *হারামণি* সপ্তম খণ্ডে এই গানটি মুন্সিগঞ্জের কবি ওসমান বয়াতির নামে ছাপা হয়েছিল। ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে এই প্রমাদ সংশোধন করা হয়নি। তারপরও জালাল উদ্দীন খাঁর কীর্তি ম্লান হবে না। '২০০০ সালে প্রকাশিত প্রথম আলোর মিলেনিয়াম স্মারকসংখ্যায় বিংশ শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ বাঙালিদের মধ্যে জালাল উদ্দীন খাঁর নাম ছাপা হয়েছে'—এই কথা জালালের উত্তরাধিকারী মোরশেদ খান সাহেব উল্লেখ করেছেন।

১

এ তো গেল একদিক। বিপদ অন্যদিকেও কম নয়। কলকাতার লোককবি বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত সুধীর চক্রবর্তী মহোদয় লিখেছেন: 'জালালের গান আমাদের দেশের পরম্পরায় খুব গুরুত্বপূর্ণ... তার গানগুলোর আলাদা টীকাভাষ্য লেখার প্রয়োজন নেই, কারণ তাঁর রচনা খুব প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী।' প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী হলেই বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই—এই কথা বলা কিন্তু চলে না। চক্রবর্তী মশায়ের এই উক্তি *জালালগীতিকা* সমগ্রের ধুলোঝাড়া জ্যাকেটে তুলে ধরা হয়েছে। নিশ্চয়ই প্রশংসার্থে। নিন্দার্থে হলেও বলতে হয় জালালের গান প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। আমার সহসা মনে হল খ্যাতনামা রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ ও শিল্পী সন্‌জীদা খাতুনের কথা। তিনিও একবার লিখেছিলেন:

> বাউল বা কীর্তন গানের ভাব এ দেশে বহুদিন ধরে প্রচলিত-সুপরিচিত ভাব। তার মর্ম গ্রহণের জন্য নতুন চিন্তা বা বোধশক্তির প্রয়োজন নেই এবং যত গীতিকারই বাউল বা কীর্তন রচনা করুন না কেন—গানের ভাব সেই এক চির পুরাতন। (খাতুন ১৯৯৪: ২৯)

'প্রয়োজন নেই' কথাটার পুনরাবৃত্তি আমাকে চমকে দেয়। অথচ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কীর্তি যখন আলোচ্য তখন সেই প্রয়োজনের পুনরাবৃত্তি হল। সনজীদা খাতুন লিখলেন: 'অথচ, রবীন্দ্রনাথের গানের কথায় তাঁর শিক্ষিত ও কর্ষিত চিন্তা ও বোধ ভিন্নভাবে ধরা দিচ্ছে। প্রতিটি গানই বিভিন্ন ভাবের বাহন। গান হয়েও কবিতা আর ভিন্ন উপলব্ধির আকর।'

এই অন্ধতা কোথা থেকে আসে? দোষ দেব কাকে? জালালবংশের শ্রী প্রদীপ মহাত্মা মোরশেদ খানও এই দোষমুক্ত থাকেন নাই। গত বছর *প্রথম আলো* পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধে গোলাম মোরশেদ খান জানিয়েছিলেন—নিঃসন্দেহে বিনয়বশত—'তাঁর গান বিশ্লেষণের যোগ্যতা আমার নেই।' ভাল কথা। কিন্তু তাঁর নিবন্ধের নাম 'এপারে যার বসতবাড়ি' তো জালাল উদ্দীন খাঁর লেখার পারভার্সন বা বিকার করা বাখ্যাই।

আবদুল আলীমের গাওয়া বিখ্যাত গানে আছে:

> সে পারে তোর বসতবাড়ি
> এ পারে তোর বাসা।

পাছে আমরা মনে করি মুদ্রণপ্রমাদ, তাই তিনি সঙ্গে বলেও দিয়েছেন: 'ওপারের বাসায় চলে গেছেন জালাল খাঁ কিন্তু তার বসতবাড়ি এপারেই।' এই এ পার সে পার বিপর্যয়—সংক্ষেপে পারবিপর্যয়—দার্শনিক বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। গোলাম মোরশেদও শেষ পর্যন্ত বিনয় রক্ষা করতে পারেন নাই। মোরশেদ খান বিশ্লেষণ দিয়েছেন:

> ইহজাগতিকতার বিপরীতে যাকে বলা হয়ে থাকে পরকাল বা পরজগৎ—তার অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্পর্কে তার সন্দেহবাদী মন সর্বদাই ছিল প্রশ্ন কণ্টকিত।

সে পারকে এ পার বানিয়ে মোরশেদ খান কাঁটাটা তুলেই ফেললেন!

২

জালাল উদ্দীন খাঁ দাবি করেন নাই তিনি 'দর্শন' বা 'জ্ঞান' লিখছেন। বিনয়ের সঙ্গে তিনি 'তত্ত্ব' কথাটা ব্যবহার করেন। যেমন: আত্মতত্ত্ব বা পরমতত্ত্ব। তত্ত্ব শব্দে, তালাশও বোঝায়, 'তাহাত্ব'ও বোঝায়। ইংরেজিতে বললে আদারনেস (otherness) বোঝায়। বাংলায় একেই বলে পরকীয়া।

আমি যে আমি নই, 'তাহা'র বা তৃতীয়ের এই কথাই কি আত্মতত্ত্ব নয়? আত্মের পরত্ব বা আত্মের তল্লাশ—দুই অর্থেই আত্মতত্ত্ব। গ্রিক অর্থে জ্ঞানপ্রেম (*philosophia*)।

বসতবাড়ি সেপারে না এপারে—মূল সমস্যা এটা নয়। সেপার কেটে এপার লিখলে সমস্যার রাহা হয় না, মোরশেদ খান এটা টের পান নাই। এই রোগেরই প্রচলিত নাম 'বস্তুবাদ' বা 'প্রগতিশীলতা'। আমি তো দেখছি এই রকম কাটাছেঁড়া করে—পারবিপর্যয় বা পারভার্সন করে জালাল উদ্দীন খাঁকে প্রগতিশীল বা বস্তুবাদী বানানো যাবে না।

কেন্দ্র কোথায়? পৃথিবীতে না সূর্যে? অথচ সত্য এও তো হতে পারে আসলে কেন্দ্রই নাই। কেন্দ্রের অভাবই হয়তো ভাবের স্বভাব। বসতবাড়ি মেকি, সত্য এপারের সঙ্গে ওপারের ফাঁকটা। এই ফাঁক থেকেই ওপার জন্মায়! ফ্রয়েডের আবিষ্কার করা অজ্ঞান নামক ধারণার সঙ্গে এখানে জালাল উদ্দীন খাঁর তথা বাংলার লোকধর্মের আশ্চর্য আলাপ শোনা যায়।

বিভক্তিই সত্য। ঐক্য নয়। তথাকথিত মানবতাবাদ—যা বুর্জোয়া রোমান্টিক আন্দোলনের অবশিষ্টাংশ মাত্র—শুদ্ধ ঐক্য দেখে। ফ্রয়েড দেখেন বিভক্তি। প্রথমে দ্বিধাবিভক্তি। ভাষার সঙ্গে ভাবের বিভক্তিই আসলে পরকালের সঙ্গে ইহকালের বিভক্তি আকারে হাজির হয়। এই বিভক্তি জন্ম দেয় ভাষা। ভাষাই তাই বাসনার জনক এ কথা স্বীকার করা কর্তব্য। মনে রাখতে হবে বাসনার সঙ্গে প্রয়োজনের কোন সমন্বয়ই নাই।

জালাল উদ্দীন খাঁ কি লেখেন নাই এই সব?

> বাসনায় বিভেদ জীব, নিবৃত্তি প্রাণ কুমিমরা
> তা-না হলে সারা বিশ্বে আমি তুমি কেবা কয় ॥
> (খাঁ ২০০৫: ৪৮)

কিংবা

> বাসনায় বিভক্ত হলাম তোমায় ছেড়ে বাইরে এলাম
> তোমার হাতেই রেখে দিলাম সৃষ্টি কিংবা স্থিতি-লয় ॥
> (খাঁ ২০০৫: ৪৩৪)

মানুষ মানুষ হয় বাসনার জোরে। কিন্তু বাসনার বাহন তো ভাষাই। ভাষা অনন্ত সেই কারণেই। সেই বিধানেই। আমাদের প্রগতিশীল, বস্তুবাদী বন্ধুগণ তার ধারেও নাই, কাছেও নাই। যাবার জো-ই তাঁদের নাই। ফকির লালন যখন বলেন:

> অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই
> দেখি মানবের উত্তম কিছু নাই

তখন তিনি আসলে ভাষার কথাই বলছেন। হাজির নাই যা তাই ভাষায় হাজির করা যায়। যেমন ঘোড়ার ডিম। যেমন শূন্য। মানুষে ও বাসনায় বা ভাবে ও ভাষায় এই

সম্পর্ক জালাল উদ্দীন খাঁর একটা গানে চমৎকার ফুটে উঠেছে। পাটিগণিতে শূন্যের ভূমিকা দ্বিবিধ। এই দুই অপর একে অপরের বিরোধী। শূন্য একদিকে 'কিছু নয়' অন্যদিকে 'একটা কিছু'। জর্মান দার্শনিক গণিতজ্ঞ গোটলব ফ্রেগের এই কথা প্রথম বিশদ করেন। জালাল খাঁ ভাব ও অভাবের স্বভাব এভাবেই ধারণ করেছেন:

> স্বভাবে সাকার মানুষ আকার,
> অভাবেতে অবশিষ্ট থাকবে নিরঞ্জন ॥
> (খাঁ ২০০৫: ৩)

অথবা,

> শূন্য হতে শূন্য হয়ে শূন্যে বদ্ধ রই আবার
> তুমি শূন্য আমি শূন্য শূন্য আমার চারিধার ॥
> দুনিয়ার সব শূন্য কাণ্ড শূন্যময় এই ব্রহ্ম অণ্ড
> বিচার কালে শূন্যে দণ্ড শূন্যে শূন্যে এক আকার,
> এই অনন্ত মহাশূন্য ব্যাপিয়া যে আছে শূন্য
> সপ্ত শূন্য কোটির মাঝে নব শূন্যের আবিষ্কার ॥
> শূন্য যখন হইল পিতা আমি হলেম শূন্যলতা
> শূন্যেতে রহিলাম গাঁথা দশং শূন্যে অন্ধকার,
> জন্ম হইতে লক্ষ শূন্য মোটামুটি কোটি শূন্য
> দিলাম সদায় শূন্যে শূন্য শূন্য রইল উদর আমার ॥
> শূন্যেরে আজ মান্য করে ভিন্ন হইলাম পরস্পরে
> শূন্যে আমার শূন্য হরে শূন্য করল প্রেম ভাণ্ডার,
> পুণ্যের ঘরে শূন্য দিয়া জালাল উদ্দীন আছে বইয়া
> শূন্যে শূন্য মিশাইয়া দিতে পারলেই হয় যে তরা ॥
> (খাঁ ২০০৫: ২৪২)

দোহাই

১. জালাল উদ্দীন খাঁ, *জালালগীতিকা সমগ্র*, যতীন সরকার সম্পাদিত (ঢাকা: নন্দিতা, ২০০৫)।

২. সনজীদা খাতুন, *তোমারি ঝরনাতলার নির্জনে* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪)।

৩. গোলাম মোরশেদ খান, 'এপারে যার বসতবাড়ি', *প্রথম আলো*, ২৪ এপ্রিল (ঢাকা, ২০০৪)।

৪. সুধীর চক্রবর্তী, *জনপদাবলি* (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমী, ২০০১)।

৫. যতীন সরকার, 'ভূমিকা', জালাল উদ্দীন খাঁ, *জালালগীতিকা সমগ্র*, যতীন সরকার সম্পাদিত (ঢাকা: নন্দিতা, ২০০৫)।
৬. Gottlob Frege, *The Foundation of Arithmetic* (Oxford: Basic Blackwell, 1953).

....

উৎস

প্রথম আলো ঃ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৫

১৫

রাষ্ট্র ও বাসনা

আহমদ ছফার 'বিষাদ-সিন্ধু'

> অনাহত চক্র মধ্যে প্রেমের অঙ্কুর
> রূপ রস বাক্য যোগে সৃজিল প্রচুর।
> —সৈয়দ আলাওল, *পদ্মাবতী*

বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেছে অথচ এই সংগ্রামের অভিজ্ঞতা তিরিশ বছরেও কোন মহৎ সাহিত্যের জন্ম দেয় নাই। এই ধরনের নালিশ সর্বৈব ভিত্তিহীন এমন কথা বলার সাহস আমার নাই। সাহিত্যের উন্নতি এবং সমাজের নৈতিক প্রগতি সমার্থক নয়। অন্তত দার্শনিক রুসো তা মনে করতেন। (রুসো ১৯৯২) তবু সবিনয়ে বলব, এমন নালিশ যাঁরা করেন তাঁরা খুব সম্ভব আহমদ ছফার উপন্যাস *অলাতচক্র* পড়ে দেখার অবকাশ পান নাই। আকারে ছোট এই উপন্যাস—আমার ধারণা—প্রকারে বড় সাহিত্যের লক্ষণাক্রান্ত। এই প্রস্তাবের সমর্থনে কিছু আলামত এই নিবন্ধে পেশ করব।

১

অলাতচক্র উপন্যাসের মূল বয়ানকার দানিয়েল একস্থলে স্বগত উচ্চারণ করেন:

> বড় ভাগ্যহীন এই বাঙালি মুসলমান জাতটা। আবহমান কাল থেকে তারা ভয়ঙ্করভাবে নির্যাতিত এবং নিষ্পেষিত। সেই হিন্দু আমল, বৌদ্ধ আমল, এমনকি মুসলিম আমলেও তারা ছিল একেবারে ইতিহাসের তলায়। এই সংখ্যাগুরু মানবমণ্ডলি কখনো প্রাণশক্তির জোরে সামনের দিকের নির্মোক ফাটিয়ে এগিয়ে আসতে পারেনি। যুগের পর যুগ গেছে,

> তাদের বুকের উপর দিয়ে ইতিহাসের চাকা ঘরঘর শব্দ তুলে চলে গেছে। কিন্তু তাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। (ছফা ২০০০: ৮৭-৮৮)

অলাতচক্র উপন্যাসের মূল সমস্যা—আমার বিবেচনায়—মানুষের বাসনার বিয়োগ। মানুষ কী চায়? ফরাসি দার্শনিক জাক লাকাঁ বলেছেন: মানুষ জানে না সে কী চায়। প্রথমে অপরের বাসনাকেই সে নিজের বাসনা মনে করে। মায়ের বাসনাই শিশুর বাসনা। এই ক্রমে নিজের বাসনা বিয়োগ করে পরের বাসনাকেই মানুষ নিজের বাসনা জ্ঞান করে। এখানে আমরা 'অপর' ও 'পর' ভেদ করছি। অপরের জায়গায় যদি 'মা' শব্দটি এবং পরের জায়গায় 'বাবা' লবজটি বসাই কোন অন্যায় নাই। মা ও বাবার বাসনার জালে ধরা পড়ে শিশু। দানিয়েল বলেন:

> বাঙালি মুসলমানরাই প্রথম পাকিস্তান চেয়েছিল। পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান সীমান্ত প্রদেশ কোথায় লোকে পাকিস্তানের কথা বলত। জিন্নাহ সাহেব বাংলার সমর্থন এবং আবেগের উপর নির্ভর করেই তো অপর প্রদেশগুলোকে নিজের কব্জায় এনেছিলেন। যে বাঙালি মুসলমানদের অকুণ্ঠ আগ্রহদানে পাকিস্তান সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল, সেই পাকিস্তানই তিরিশ বছর তাদের বুকের উপর বসে তাদের ধর্ষণ করেছে। একটা জাতি এতবড় একটা ভুল করতে পারে? কোথায় জানি একটা গড়বড়, একটা গোঁজামিল আছে। আমরা সকলে সেই গোঁজামিলই ব্যক্তিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে অদ্যাবধি বহন করে চলেছি। (ছফা ২০০০: ৮৮)

দানিয়েলের যুক্তি:

> পাকিস্তানের গণপরিষদে তো পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাংলা ভাষার দাবিটি তো তাঁরা সমর্থন করতে পারতেন। হলেনই বা মুসলিম লীগার। তবু তাঁরা কি এদেশের মানুষ ছিলেন না? তাঁদের সাতপুরুষ বাংলার জল হাওয়াতে জীবন ধারণ করেন নি? তবু কেন বাংলাভাষার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের ছাত্র তরুণদের প্রাণ দিতে হল? পূর্বপুরুষদের ভুল এবং ইতিহাসের তামাদি শোধ করার জন্য কি এই জাতিটির জন্ম হয়েছে? (ছফা ২০০০: ৮৮)

দানিয়েলের কথামৃত অনুসারে বাঙালি মুসলমান একটা 'জাত'। একালের রাষ্ট্রবিজ্ঞান যাকে 'জাতি' বলে বাঙালি মুসলমান কি সেই বস্তু? এতদিন সে মায়ের বাসনায় মুসলমান। এখন সে কি বাবার বাসনায় বাঙালি হবে? কী এই বাবার পরিচয়? এই বাবাও কি অত্যাচারী এবং অজাচারী? ইতিহাস ও বাসনার এই দুর্বোধ্য যোগাযোগ আহমদ ছফা তৈরি করার চেষ্টা করেছেন এই আধুনিক রূপকথার ভিতর।

ধরা যাক একটি ছোট্ট ঘটনার কথা। দানিয়েল জানাচ্ছেন:

> কিছুদিন আগে রেজোয়ানদের আস্তানায় কুমিল্লা থেকে মজিদ বলে আরেকটি ছেলে আসে। রেজোয়ানরা থাকত বিপন স্ট্রিটে। মজিদ আর রেজোয়ান দুজনেই কুমিল্লার

> কান্দিরপাড় এলাকার একই পাড়ার ছেলে। মজিদ কলকাতা এসে সকলের কাছে রটিয়ে দেয় যে রেজোয়ানের যে বোনটি উইমেন্স কলেজের প্রিন্সিপাল সে একজন পাকিস্তানি মেজরকে বিয়ে করে ফেলেছে। এই সংবাদটা পাওয়ার পর রেজোয়ান দু দিন ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকে। কারো সঙ্গে একদম কথাবার্তা বলেনি। অনেক চেষ্টা করেও কেউ তাকে কিছু খাওয়াতে পারেনি। অবশেষে রাত্রিবেলা ঘুমের ঔষধ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। (ছফা ২০০০: ৮৫)

তার মাথার কাছে পাওয়া গেল একটি চিরকুট। তাতে লিখে রেখেছে, বড় আপা, যাকে আমি বিশ্বাস করতাম সবচেয়ে বেশি, সে একজন পাকিস্তানি মেজরের স্ত্রী হিসাবে তারই সঙ্গে একই বিছানায় ঘুমাচ্ছে, এ কথা আমি চিন্তা করতে পারি না। দেশে থাকলে বড় আপা এবং মেজরকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিতাম। এখন আমি ভারতে। সুতরাং সে উপায় নাই। (ছফা ২০০০: ৮৫–৮৬)

দানিয়েল ধরে নিচ্ছেন: বাংলাদেশের যুদ্ধটা না লাগলে হয়তো ছেলেটাকে এমন অকালে মরতে হত না। ছেলেটা মরতে বাধ্য হয়েছে কী কারণে তার বিশ্লেষণ দানিয়েলের কাজ নয়। ছেলেটার জগতে সাকার (imaginary) ও আকার (symbolic) একাকার হয়ে আছে, আলাদা হয় নাই। সাকার থেকে আকার আলাদা না করা হলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে একালের মনবিভাজন (psychoanalysis) শাস্ত্রের ভাষায় তাকে সাইকোসিস বলে। আর আলাদা হলে যে পরিস্থিতি তার নাম নিউরোসিস। রেজোয়ানের বাসনা আকার পায় নাই কিন্তু দানিয়েলের বাসনা পেয়েছে। তাই আমরা দানিয়েলের বয়ানে রেজোয়ানের দাফন-কাফনের কাহিনী পড়ছি।[১] অলাতচক্র উপন্যাসের কাহিনী এই বাসনারই বিয়োগ কাহিনী।

২

ব্যাবিলনে নির্বাসিত এয়াহুদি জাতির মধ্যে দানিয়েল নামে একজন ধুরন্ধর (intellectual) ছিলেন। ১৯৭১ সালে কলকাতায় উপনীত বাঙালি মুসলমানদের মধ্যেও একজন বুদ্ধিজীবী আছেন যাঁর নাম দানিয়েল। তাঁর জবানিতেই অলাতচক্র চলেছে। দানিয়েল বললেন:

> অস্বীকার করার উপায় নেই, বাংলাদেশে একটি মুক্তিযুদ্ধ চলছে এবং এই যুদ্ধের কারণেই কলকাতা মহানগরীর নাভিশ্বাস উঠেছে। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধের জন্য সাজ সাজ রব উঠছে। আমি সেই বিরাট কর্মকাণ্ডের একটা ছিটকে-পড়া অংশ। (ছফা ২০০৮: ৬৬)

তাঁর কথা হচ্ছে পশ্চিমা বাঙালি ধুরন্ধর সত্যব্রতবাবুর সঙ্গে। সত্যব্রত ব্রত করেছেন সত্য বলবেনই:

> আমরা আশা করেছিলাম, আপনারা অন্যরকমের একটা ঘটনা ঘটাবেন। মার্চ মাসের প্রাথমিক দিনগুলোতে পশ্চিম-বাংলার হাজার হাজার ছেলে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে বাংলাদেশে গিয়ে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। আপনারা যুদ্ধের সমস্ত মাঠটা পাকিস্তানি সৈন্যদের ছেড়ে দিয়ে একেবারে চূড়ান্ত নাজুক অবস্থায় ইন্দিরা সরকারের অতিথি হয়ে ভারতে চলে এলেন, এটা আমরা আশা করিনি। (ছফা ২০০৮: ৬৬)

সত্যব্রত বললেন:

> আপনাদের দেশ এবং জনগণের ভাগ্য এখন আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মধ্যে আটকা পড়ে গেছে। দুনিয়ার সমস্ত দেশ চাইবে আপনাদের উপলক্ষ করে দাবার নিজের চালটি দিতে। মাঝখানে আপনারা চিঁড়ে-চ্যাপটা হয়ে যাবেন। আমার মনে হয় কী জানেন, আপনাদের ঐ শেখ মুজিব মানুষটি হাড়ে হাড়ে সুবিধেবাদী অথবা আস্ত একটা বোকারাম। কী সুবর্ণ সুযোগই না আপনাদের হাতে ছিল। (ছফা ২০০৮: ৬৬)

দানিয়েল শব্দটি হিব্রু। *কিতাবুল মোকাদ্দস* অনুসারে এর অর্থ 'আল্লাহ আমার বিচারক'। (সোসাইটি ২০০০: ১২৪৭) বাঙালি মুসলমানও ভাবে-দুঃখে কিছুটা এয়াহুদি লক্ষণাপন্ন। দানিয়েল কবুল করেন সত্যব্রতবাবুর কথাটা সর্বৈব মিথ্যা নয়:

> উনিশ শ' আটচল্লিশ থেকে সত্তর পর্যন্ত এই জাতি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। আর চূড়ান্ত মুহূর্তটিতে আমাদের সবাইকে দেশ ও গ্রাম ছেড়ে ভারতে চলে আসতে হয়েছে। আমাদের হাতে সময় ছিল, সুযোগ ছিল। কোলাহল আর চীৎকার করেই আমরা সে সুযোগ এবং সময়ের অপব্যবহার করেছি। পাকিস্তানের কর্তাদের আমরা আমাদের বোকা বানাতে সুযোগ দিয়েছি। তারা সৈন্য এনে ক্যান্টনমেন্টগুলো ভরিয়ে ফেলেছে এবং সুযোগ বুঝে পাকিস্তানি সৈন্য আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। আমরা আমাদের যুদ্ধটাকে কাঁধে বয়ে নিয়ে ভারতে চলে এসেছি। হয়ত যুদ্ধ একদিন শেষ হবে, তারপর কী হবে? আমাদের যুদ্ধটা ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মন বলছে পাকিস্তান হারবে, হারতে বাধ্য। কিন্তু আমরা কী পাব? ইতিহাসের যে গোঁজামিল আমরা বংশপরম্পরা রক্তধারার মধ্য দিয়ে বহন করে চলেছি তার কি কোন সমাধান হবে? কে জানে কী আছে ভবিষ্যতে। (ছফা ২০০৮: ৮৪)

আখ্যানের একেবারে গোড়ায় দেখা যায় ধুরন্ধর দানিয়েল হাসপাতাল যাচ্ছেন। কলকাতার পিজি হাসপাতালে বাংলাদেশের একজন তরুণী ভর্তি হয়েছেন। দানিয়েল যাচ্ছেন তাঁর খোঁজে। তরুণীর নাম তায়েবা। বয়স সাতাশ। তাঁর পরিবারের অন্তঃপুর পর্যন্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত ও কমিউনিস্ট পার্টির দৌড়। তাঁর হয়েছে কঠিন বিমার। ভাল হওয়ার আশা নাই। দানিয়েল কলকাতার ভাষায় কথা বলা রপ্ত করলেও রোগের নাম রপ্তানি করেন 'লিউক্যামিয়া', 'লিয়কেমিয়া' বলতে পারেন না।

তায়েবাকে হাসপাতালে তুলেছেন যিনি তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি বটেন— ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী সাহিত্যপত্র *পরিচয়* সম্পাদক সাহিত্যিক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অসুস্থ তায়েবাকে খাওয়াবে বলে দানিয়েল যাঁর কাছে একটু ভাত আর ছোট মাছের আবদার করতে যাবেন কাল সকালে, ঘুম থেকে উঠে, সেই প্রাতঃস্মরণীয়ের নাম কাকাবাবু, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, প্রকাশ 'কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ'। স্বভাবতই জিজ্ঞাসা জাগে কে এই তরুণী তায়েবা? দানিয়েলের ভাষ্য মোতাবেক:

> তায়েবা ১৯৬৯ সালের গণ আন্দোলনের সময় আসাদ হত্যার দিনে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পত্র-পত্রিকায় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। সবগুলো কাগজে পুরো পৃষ্ঠা ছবি ছাপা হয়েছিল। আজ সে কলকাতার পিজি হাসপাতালে নিঃশব্দে মৃত্যুর প্রহর গুণছে আর অলীক রওশন আরার ভাবমূর্তি জনমনে অক্ষয় আসন দখল করিয়াছে। হায়রে তায়েবা তোমার জন্য অশ্রু। হায়রে বাংলাদেশ তোমার বেদনা। ...যার অস্তিত্ব কস্মিনকালেও ছিল না, সেই রওশন আরার ভাবমূর্তি আকাশপ্রমাণ উঁচু হয়ে উঠেছে। আর তায়েবা, একসময়ে যে বাংলাদেশে সংগ্রামের উষ্ণ নিঃশ্বাস হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল আজ কলকাতার হাসপাতালে সকলের অগোচরে মারা যাচ্ছে। (ছফা ২০০৮: ১৩৩)

তায়েবাকে বাংলাদেশের নিশান বানিয়েছেন আহমদ ছফা। তার পবিত্রতার তুলনা পরিষ্কার করার খাতিরে ১৯৭১ সালে সৃষ্ট কল্পকন্যা রওশন আরার কথাও পেড়েছেন তিনি।

দানিয়েলের দুঃখ কল্পকন্যা রওশন আরার জন্ম প্রক্রিয়ায় তার নিজেরও একটা ছোটখাট ভূমিকা আছে। আগরতলার সাংবাদিক বিকচ চৌধুরীর বিপুল কল্পনাশক্তির ঔরসে রওশনের জন্ম। বিকচবাবু পয়লা খবরটার খসড়া এভাবে লিখেছিলেন: ফুলজান নামের এক যুবতী বুকে মাইন বেঁধে পাকিস্তানি সৈন্যের একটা আস্ত ট্যাঙ্ক উড়িয়ে দিয়েছে। দানিয়েল আপত্তি তুললেন:

> ধর নাম নির্বাচনের বিষয়টি। তুমি বলেছ ফুলজান। এই নামটি একেবারেই চলতে পারে না। বাঙালি মুসলমানের নাম সম্পর্কে তোমার ধারণা নেই। তাই ফুলজান শব্দটি তোমার কলমের মুখে উঠে এসেছে। বাংলাদেশে ফুলজান যাদের নাম, তারা বড়জোর হাঁড়ি-পাতিল ঘষে, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ট্যাঙ্কের তলায় আত্মাহুতি দিতে পারে না। সুতরাং একটা যুতসই নাম দাও, যাতে শুনলে মানুষের মনে একটা সম্ভ্রমের ভাব জাগবে। রওশন আরা নামটি মন্দ কী! বঙ্কিম এই নামটি বেছে নিয়েছিলেন। নামের তো একটি মাহাত্ম্য আছেই। রওশন আরা নাম যে মেয়ের, সে যেমন হৃদয়াবেগের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জয়সিংহের ভালবাসতে পারে; তেমনি দেশজননীর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ট্যাঙ্কের তলায় আত্মাহুতিও দিতে পারে। নামটা মনে ধরেছিল বিকচের। তারপর গল্পের নিয়মেই বাকি ব্যাপারগুলো বেরিয়ে এসেছিল। তার বাড়ি নাটোর। তার বাবা পুলিশ অফিসার। সে ইডেনে পড়ত এবং শেখ মুজিবের আত্মীয়া ইত্যাদি। (ছফা ২০০৮: ১৩২-৩৩)

নিজের সৃষ্টির জয়জয়কারে হতবাক দানিয়েল ও বিকচ। রওশন আরার বাড়ি নাটোর। তার বাবা পুলিশ অফিসার। সে ইডেনে পড়ত এবং শেখ মুজিবের আত্মীয়া। দানিয়েল জানেন না কী করতে কী হয়ে গেল। আকাশবাণীর দেবদুলালবাবুর কল্যাণে রওশন আরার পরিচিতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। রওশন আরার আত্মীয়স্বজন রেডিওতে সাজানো সাক্ষাৎকার দিতে আরম্ভ করেছে। দানিয়েলের দায়বোধ এই রকম:

> যুদ্ধের প্রথম বলিই তো সত্য। কিন্তু আমি বা বিকচ ইচ্ছা করলেই রওশন আরাকে আবার নিরস্তিত্ব করতে পারি না। আমরা যদি হলপ করেও বলি, না ঘটনাটি সত্য নয়, রওশন আরা বলতে কেউ নেই, সবটাই আমাদের কল্পনা, লোকজন আমাদের পাকিস্তানি স্পাই আখ্যা দিয়ে ফাঁসিতে ঝোলাবার জন্য ছুটে আসবে। (ছফা ২০০০: ১৪৩)

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিয়োগকাহিনী তায়েবার ভাগে আর এ যুদ্ধের তামাশার গল্পটি রওশন আরার। তায়েবা বাংলাদেশের নিশানা বা রূপান্তর। অন্তত দানিয়েল এ দৃষ্টিতে দেখছেন:

> একটি নারী দিনে দিনে নীরবে নিভৃতে কলকাতার পিজি হাসপাতালে একটি কেবিনে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আমার জানতাম সে মারা যাবেই। মারা যাবার জন্যই সে কলকাতা এসেছে। যুদ্ধ দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে। আমি ধরে নিয়েছিলাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবী, আর তায়েবাকে এখানে রেখে যেতে হবে। তায়েবা অত্যন্ত শান্তভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছিল। (ছফা ২০০০: ১৪৪)

দেখা গেল, তায়েবা আর বাংলাদেশ একার্থবোধক নয়। তায়েবা বাংলাদেশের একাংশ মাত্র অথবা নামান্তর। দানিয়েল জানাচ্ছেন:

> ডিসেম্বরের চার তারিখ ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ঐ দিন সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত গোটা কলকাতা শহরে বিমান হামলার ভয়ে কোন আলো জ্বলেনি। সেই ব্ল্যাক আউটের রাতে তায়েবার কাছে কোন ডাক্তার আসতে পারেনি। কোন আত্মীয়স্বজন পাশে ছিল না। ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের কারণে যে অন্ধকার কলকাতা শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই অন্ধকারের মধ্যে তায়েবা আত্মবিসর্জন করল। (ছফা ২০০০: ১৪৪)

৩

তায়েবার এই অসুখ ও মৃত্যুর জন্য কেউ কি দায়ী? অসুখ তো অসুখই। মৃত্যু তো মৃত্যুই। সকলেই একদিন জন্ম নিয়েছে এবং সকলেরই একদিন মৃত্যু হবে। জন্ম ও

মৃত্যু, ব্যাধি ও জরা নিরাকার বা শুদ্ধ ঘটনা। দানিয়েল এয়াহুদি পয়গম্বর। তার কাউকে না কাউকে দায়ী করতেই হবে। এই দায় দুই রকমের হতে পারে—সাকার ও আকার হতে পারে এই দুই দায়ের দুই নাম। রেজোয়ানের আত্মহত্যার জন্য দানিয়েল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে দায়ী করেছিলেন। 'বাংলাদেশের যুদ্ধটা না লাগলে হয়তো ছেলেটাকে এমন অকালে মরতে হত না।' (ছফা ২০০০: ৮৭) এই ধরনের দায়কে আমি বলি দায়ের আকার বা নিশানা মাত্র। আর ধরনের দায়কে এর সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলা যেতে পারে সাকার বা দায়ের মূর্তি। তায়েবার মৃত্যুর জন্য দানিয়েল দায়ের এই দুই মূর্তি হাজির করেন একই সঙ্গে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন পায়ে হেঁটে কলকাতা মহানগরীতে গিয়ে হাজির হতে হল এবং বাঙালি মুসলমানের জাতীয় যুদ্ধ কেন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের একটা ছিটকে পড়া অংশে হয়ে উঠতে বাধ্য হল? দানিয়েলের এই দুই প্রশ্নের রূপক বটে তায়েবার অসুখ ও মৃত্যু। তায়েবার মতন প্রাণবন্ত টগবগে তরুণীকে কেন কলকাতার পিজি হাসপাতালে উঠতে হল? আর শেষ পর্যন্ত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট অন্ধকারের মধ্যে আত্মীয়-বান্ধববর্জিত রাতে তাকেও কেন আত্মবিসর্জন দিতে হল? এই দুই প্রশ্নকে এক দেহে লীন করেছেন আহমদ ছফা। এই ঘটনাকেই আমি শনাক্ত করি মহৎ সাহিত্যের আলামত হিসাবে। অতএব দানিয়েল উবাচ:

> আমরা আমাদের যুদ্ধটাকে কাঁধে বয়ে নিয়ে ভারতে চলে এসেছি। হয়তো যুদ্ধ একদিন শেষ হবে। তারপর কী হবে? আমাদের যুদ্ধটা ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মন বলছে পাকিস্তান হারবে, হারতে বাধ্য। কিন্তু আমরা কী পাব? ইতিহাসের যে গোঁজামিল আমরা বংশপরম্পরা রক্তধারার মধ্য দিয়ে বহন করে চলেছি তার কি কোন সমাধান হবে? (ছফা ২০০০: ৮৮)

ইতিহাসের এই গোঁজামিল কী বস্তু? তায়েবার পরিবারের ইতিহাস থেকে উদাহরণ দেওয়া যাক। দানিয়েল শুনেছিলেন তাদের বাবার পরিবারের কেউ বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলেন না। বর্ধমান তাঁদের স্থায়ী নিবাস হলেও হাড়ে-মাংসে, অস্থিমজ্জায় তায়েবার বাবা-চাচারা মনে করেন তাঁরা পশ্চিমদেশীয়। বাংলামুলুক তাঁদের পীরমুরিদী ব্যবসার ঘাঁটি হলেও অত্যন্ত যত্নে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁদের ভেদ চিহ্নগুলো ঘষে মেজে তকতকে ঝকঝকে করে রাখেন তাঁরা। এ ব্যাপারে উর্দু ভাষাটা তাঁদের সাহায্য করেছে সবচেয়ে বেশি। স্থানীয় মুসলিম জনগণ তাঁদের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতাকে অত্যন্ত বিচিত্র জ্ঞান করে নিয়েছে। (ছফা ২০০০: ৭৩-৭৪) তায়েবার মা চরিত্রটির মতে, ওরা কেউ বাংলাভাষায় কথাবার্তা বলে না, এমনকি বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে প্রাণ থেকে ঘৃণা করে। (ছফা ২০০১: ৭৩) দানিয়েল যখন বললেন 'একদিন আমরা জিতব' তখন তায়েবার চাচা চরিত্রটি বললেন—'জিতবেন তো বটে, তবে আপনারা নন, জিতবে হিন্দুস্থান এবং হিন্দুরা।' (ছফা ২০০০: ৭৭)

ওদিকে তায়েবার মা এসেছেন 'সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা পরিবেশ' থেকে। তাঁদের বাড়ি ছিল বোলপুরের কাছাকাছি। রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতনের একেবারে সন্নিকটে। তায়েবার মা বালিকা বয়সে পাঁচ ছ বছর শান্তি নিকেতনে পড়ালেখা করেছেন। বিয়ে হওয়ার পর শ্বশুর বাড়িতে এসে একটা প্রকাণ্ড সমস্যার মধ্যে পড়ে গেলেন। নতুন বৌ উর্দু ভাষায় কথা বলে না। (ছফা ২০০০: ৭৪) এই সময় ভারতবর্ষ দুই টুকরা হয়ে হিন্দুস্তান-পাকিস্তানে হল। নতুন বউ স্বামীকে অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বর্ধমান এবং কলকাতার সমস্ত স্থাবর সম্পত্তির দাবি ছেড়ে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুরে এসে নতুন সংসার পেতে বসলেন।

ওদিকে উর্দুজবান যে রকম তায়েবার বাবার বাড়ির লোকজনকে স্থানবাসীদের সঙ্গে মিশতে দেয় নাই, তায়েবার মার পীরিতির রবীন্দ্রনাথও তেমনি এই মোহাজের পরিবারকে পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দূরে থাকতে সমান সাহায্য করেন। দানিয়েল বলেন: 'সমাজে বাস করতেন বটে, কিন্তু একটা দূরত্ব সব সময় রক্ষা করতেন।' সে কারণে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য সব সময় হিন্দু শিক্ষক নিয়োগ করতেন। (ছফা ২০০০: ৭৪) দানিয়েল দেখতে পান:

> এই ফাঁক দিয়ে প্রগতিশীল রাজনীতি, কমিউনিস্ট পার্টি এসব একেবারে বাড়ির অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। মেয়েদের লেখাপড়া ও গানবাজনা শেখাবার বাসনায় এই মোহাজের পরিবারের দ্বিতীয় হিজরত। এবার ঢাকা শহরের পুরনো বনেদী এলাকায়। বিনিময় করে দিনাজপুরে যে ভূসম্পত্তিটুকু পেয়েছিলেন, তার একাংশ বিক্রি করে ঢাকা শহরে বাড়ি কিনলেন।

কিছুদিন পর নীল নির্মেঘ আকাশ থেকে যে বাজ এই পরিবারের মাথায় পড়বে সেই বাজের দুই নাম জাহিদুল হক ও রাশেদা খাতুন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুই দিকপাল। দানিয়েল বলছেন:

> তায়েবার মা তো জাহিদুলদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আল্লাহকে ধন্যবাদ দিলেন। এতদিন তিনি মনে মনে এমন সুরুচিসম্পন্ন কাউকে সন্ধান করছিলেন, যার উপর তাঁর অবর্তমানে মেয়েদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্তবোধ করতে পারবেন। (ছফা ২০০০: ৭৫)

এই সময় বাংলাদেশের লড়াই বেঁধে সব গোল পাকিয়ে দিল। দানিয়েল সূত্রে আওড়ান: যুদ্ধ স্রোতে ভেসে যায় ধনমান জীবন যৌবন। নিয়তি অথবা যুদ্ধের রসিকতায় রাশেদা খাতুন আর তায়েবার কনিষ্ঠা ভগিনী ডোরা পরস্পরের সতীন হয়ে দাঁড়িয়েছেন। জাহিদুল ডোরাকে বিয়ে করেছেন বলে রাশেদা খাতুন তাঁর মেয়ের টিউটর শশীকে নিয়ে শান্তিনিকেতন গেছেন নাকি রাশেদা শশীকে ভ্যানিটি-ব্যাগদানা করেছেন বিধায় জাহিদুল ডোরাকে শাদি করেছেন আমরা নিশ্চিত হতে পারছি না। দানিয়েলের কথা এক্ষেত্রে খুবই সঙ্গতিহীন। (ছফা ২০০০: ২০, ৫২, ৭৫) একের

জায়গায় একেক রকম। ওঁর মনে একেক দিন একেক কাহিনী জাগে। তিনি প্রকৃতই সাকারের জীব এখানে। আমরা শুনি স্বামী-স্ত্রীর দ্বৈত সংগ্রামে ডোরাকে বলি হতে হয়েছে। আবার ডোরা একটি নষ্ট মেয়ে এমন কথাও শুনতে হয় আমাদের। দানিয়েল এ কথাও জানাতে কসুর করেন না: 'জাহিদুল এখানে সেখানে ডোরাকে নিয়ে যে অনুষ্ঠান করায়, তাতে যে টাকাটা আসে, তার সবটা তায়েবার পেছনে খরচ করে।' (ছফা ২০০০: ১১৭) সত্যি বিচিত্র এই দেশ, ভারতবর্ষ!

৪

হজরত দানিয়েলের আপত্তিটা তাহলে ঠিক কোন জায়গায়? মুসা পয়গম্বরের বংশধরদের মতন আমাদের গল্পকথকও সভ্যতার প্রহরী। সভ্যতার নিয়ম—*টোটেম ও টাবু* গ্রন্থে ফ্রয়েড দেখিয়েছেন—আব্বাকে হত্যা করা যাবে কিন্তু আব্বার নারীকে শাদি করা যাবে না। জাহিদুল এই নিয়ম ভঙ্গ করেছেন। যুদ্ধেও দূত অবধ্য। এই কথার তাৎপর্য কী? তাৎপর্য নিয়মনীতি অলঙ্ঘনীয়। জাহিদুল তা লঙ্ঘন করেছেন। 'আপনা উদ্যান ফল' তিনি ভক্ষণ করেছেন। যুদ্ধের ফলে—দানিয়েল দেখতে পাচ্ছেন—অনেক প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষের খোলস ফেটে খান খান হয়ে পড়েছে। তাঁর ভাষায়: আমরা এতকালের ব্যাঘ্র-চর্মাবৃত ছাগলদের চেহারা আপন স্বরূপে দেখতে পাচ্ছি। (ছফা ২০০০: ৫২) খেরেস্তান কবি দান্তের দোহাই—পাপের মধ্যে প্রেমে পড়া লঘুতম—আওড়িয়ে রেহাই নাই।

দানিয়েলের ধারণা আঘাতটা সবচেয়ে বেশি লেগেছে তায়েবার। তিনি ছোট বোনটাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসতেন আর জাহিদুলকে বাবারও অধিক শ্রদ্ধা করতেন। এই অজাচারই—দানিয়েল কল্পনা করেন—তায়েবার সমস্ত বিশ্বাস সমস্ত মানসিক আশ্রয় ভেঙে খান খান করে দিয়েছে। দানিয়েল মনে করেন: ওটাই ওঁর অসুখ গুরুতর হয়ে ওঠার মূল কারণ। (ছফা ২০০০: ২১)

এই অজাচারকে আহমদ ছফা সনাক্ত করেছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মূল ব্যর্থতা হিসাবে। এই অজাচারই তাঁর চোখে হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে বেইমানি। এখানে অজাচার হয়েছে বাংলাদেশের শাসকশ্রেণীর জন্মের অনপনেয় কলঙ্ক এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের সঙ্কটের ভবিষ্যদ্বাণী। এক চরিত্রের জিহ্বা দিয়ে ছফা এই কথাটুকু বের করাতে কসুর করেন নাই:

> বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছে। শেখ পাকিস্তানের জেলে আর আমরা এখানে কলকাতার পথে পথে ভেরেন্ডা ভেজে চলছি। এই অবস্থার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী তোমার ঐ শেখ মুজিব এবং তাঁর দল আওয়ামী লীগ। শেখের মত... । (ছফা ২০০০: ৬২)

শেখ মুজিব আর জাহিদুল এই স্থলে একদেহ হয়ে যান। দানিয়েলের খেদ:

> এখানে কলকাতায় সাদা কাপড়-চোপড় পরা ভদ্রলোকদের মধ্যে স্খলন, পতন, যত রকমেই নৈতিক অধঃপতন হচ্ছে, তার সবগুলোর প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি। এখানে যত্রতত্র শুনতে পাচ্ছি, বুড়ো আধবুড়ো মানুষরা যত্রতত্র বিয়ে করে বেড়াচ্ছে। পাকিস্তানি সৈন্যদের নিষ্ঠুরতার কথা আমাদের জানা আছে। মাঝে মাঝে এই ভদ্রলোকদের তার তুলনায় কম নিষ্ঠুর মনে হয় না। (হক ২০০০: ৫২)

দানিয়েলের ব্যাপক সিদ্ধান্ত: 'তারেবা যদি সত্যি মারা যায় সে জন্য এঁরাই দায়ী। এই দায় দানিয়েলের মনের মূর্তি। কিন্তু দুনিয়ার কোন আদালতে সে মামলার বিচার হবে না।'

বাসনার দায় একা জাহিদুলেরই নয়। বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, সকলের। বাংলাবাজারের ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ জয়সিংহ ব্যানার্জিরও। জয়সিংহজি যজমানের মেয়ে সবিতাকে নিয়ে কলকাতায় রেশন তুলছেন। বলছেন মেয়েটির কোন অভিভাবক নাই। তাই তাকে পোষার দায়িত্ব তার ঘাড়ে এসে পড়েছে মাত্র। বাংলাবাজারের শ্রমিক রামুর জবানবন্দি কিন্তু অন্যরকম:

> শালা বদমাইশ বাউন, মা আর বুন দুইডা ক্যাম্পে কাঁইদা চোখ ফুলাইয়া ফেলাইছে। আর হারামজাদা মাইয়াডারে কইলকাতা টাউনে আইনা মজা মারবার লাগছে। (হক ২০০০: ৩৩)

এই বাসনার কাহিনী রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে এবং তা সকল রাষ্ট্র জানে। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের একজন মন্ত্রীকে নিয়ে এই বাসনার ট্রাজেডি একটা প্রহসন হয়ে ওঠে। কলকাতা শহরে শ্রমিকশ্রেণীর বাসনাপুর বিখ্যাত সোনাগাছি। সেখানে পুলিশের হাতে পড়ে ভদ্রলোককে কবুল করতে হল তিনি প্রবাসী সরকারের একজন মন্ত্রী বটেন। খোঁজ-খবর করে নিশ্চিন্ত হলেন অফিসার মহোদয়। বকাঝকা করলেন ভিআইপি মান্যবর মেহমানকে:

> স্যার, কেন মিছিমিছি সোনাগাছির মত খারাপ জায়গায় গিয়ে না হক ঝুট ঝামেলার মধ্যে পড়বেন আর ভারত সরকারের আতিথেয়তার নিন্দা করবেন। আগেভাগে আমাদের স্মরণ করলেই পারতেন, আমরা আপনাকে ভিআইপির উপযুক্ত জায়গায় পাঠিয়ে দিতাম। (হক ২০০০: ১৬)

বাসনা কয় প্রকার ও কী কী—এই প্রশ্ন এখন আমাদের করতেই হয়। বাসনা মানে 'বাস না'—যা বাস করে না, যা স্থির নয়। কামনা মানেও একই নিয়মে 'কাম না'। কামের সঙ্গে কামনার সম্পর্ক সামান্য (universal) নয়, বিশেষ (particular) মাত্র। অথচ দুনিয়াসুদ্ধ লোকে জানে বাসনা ও কামনা দুটি ভিন্ন

সংশ্লিষ্ট বিষয়। আমরা সে মতের পোষকতা করি না।[৫] তায়েবার বাসনা কী? দানিয়েলের কামনা কী? এই দুটি সওয়ালের জওয়াব জানার চেষ্টা করি তো এই সমস্যার একটা কিনারা হয় বলে আমরা মনে করি।

যে রাতে ডাক্তার মাইতি দানিয়েল ধুরন্ধরকে বললেন তায়েবার রোগটি সম্ভবত সারার মতন নয় এবং তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন সে কথা হলপ করে বলা যায় না, সেই রাতে দানিয়েল এক স্বপ্ন দেখেন। আমার বিবেচনায় *অলাতচক্র* উপন্যাসের নাভি এই স্বপ্নটি। তার আগে বিবেচনা করা যাক তায়েবার বাসনা। দানিয়েল বলেন:

> স্বাধীনতা অন্তঃপ্রাণ ছিল তায়েবার। আলাপ আলোচনায়, কথাবার্তায় দেখে থাকবেন, তার মনটি কী রকম কম্পাসের কাঁটার মত স্বাধীনতার দিকে হেলে থাকে। উনিশশ উনসত্তরের আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে তায়েবা নিজে থেকে উদ্যোগী হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেছিল। (ছফা ২০০০: ৫৩)

অসুস্থতার দিনে তায়েবা জানাচ্ছেন:

> সারা জীবন আমি আলেয়ার পেছনে ছুটেই কাটিয়ে গেলাম। মা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব সকলে সুখে হোক দুঃখে হোক একটা অবস্থান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু আমি তো হাওয়ার উপর ভাসছি। তারা হয়তো সুখ পাবে জীবনে, নয়তো দুঃখ পাবে, তবু সকলে নিজের নিজের জীবনটি যাপন করবে। কিন্তু আমার কী হবে, আমি কী করলাম? আমি যেন স্টেশনের ওয়েটিং রুমেই গোটা জীবনটা কাটিয়ে দিলাম। (ছফা ২০০০: ৪২)

দানিয়েলের স্বপ্নটা এই রকম:

> আমার আব্বা এসেছেন। স্কুলহোস্টেলে থাকার সময় আমি যে বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হিসেবে খেতাম, সে বাড়ির সামনের পথ আলো করে দাঁড়িয়ে আছেন। তার পরনে শান্তিপুরের চিকন পাড়ের ধুতি। গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি, গলায় ঝোলানো মক্কা শরিফ থেকে আনা ফুলকাটা চাদর। আর মাথায় কালো, থোবাযুক্ত চকচকে লাল সুলতানি টুপি। আমি জিগগেস করলাম, আব্বা এত সুন্দর কাপড়-চোপড় পরে আপনি কোথায় চলেছেন? আমার প্রশ্নে তিনি খুবই অবাক হয়ে গেলেন। বেটা তুমি জান না বুঝি, আজ তোমার বিয়ে। আমিও অবাক হলাম। কারণ আমি সত্যি সত্যি জানি নে। বাবা বললেন, কখনো কখনো এমন কাণ্ড ঘটে যায়। (ছফা ২০০৮: ৫৪)

এই স্বপ্ন একেবারে ফ্রয়েডের ব্যাকরণ অনুসারে ব্যাখ্যেয়। ছেলে জানে না তার বিয়ে আজ, বাবা জানেন। বাবার বাসনাই আজ ছেলের বাসনা। মানুষের বাসনা মাত্রেই অপরের বাসনা। এখানে বাবাই সেই অপর। আর পরকে বাংলায় আমরা কত সহজেই না বলি 'পরি'। 'উপরি' শব্দের মতন 'অপরি'। তারপর 'পরি'। এই কাণ্ড মাঝে মাঝে নয়, হামেশাই ঘটে। তায়েবাও কি বলছে না একই কথা?

> ধরুন কোন কারণে আরো একবার যদি আমি জন্মগ্রহণ করি, তাহলে নিতান্ত সাধারণ মেয়ে হয়েই জন্মাব। পরম নিষ্ঠাসহকারে নিজের জীবনটাই যাপন করব। ঢোলা জামা পরা আঁতেলদের বড় বড় কথায়, একটুও কান দেব না। আমি পেটুকের মত বাঁচব। খাব, পরব, সংসার করব—আমার ছেলেপুলে হবে, সংসার হবে, স্বামী থাকবে। সেই সংসারের গণ্ডির মধ্যেই আমি নিজেকে আটকে রাখব। কখনো বাইরে পা বাড়াব না। (ছফা ২০০৮: ৪৪)

দানিয়েলের স্বপ্নের পরের অংশ আরো স্বরব্যঞ্জনময়:

> আমি বললাম, আব্বাজান, আমার ঈদের চাপকান কই। অন্তত একখানা শাল এ উপলক্ষে আপনি তো আমাকে দেবেন। আব্বা সস্নেহে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, ব্যাটা সাদা ধুতি পরো। আমি বিয়ের সময় সাদা ধুতি পরেই বিয়ে করেছিলাম। তোমার ভাইকেও ধুতি পরিয়ে বিয়ে দিয়েছি। তিনি আমার হাতে একখানা ধুতি সমর্পণ করলেন। আমি বললাম, আব্বা আমি যে ধুতি পরতে জানিনে। ব্যাটা বেহুদা বকো না। পরিয়ে দেওয়ার মানুষের কি অভাব! যাও আঙ্গামে ওঠ। আমি বললাম, এ শুভ দিনে আপনি অন্তত একখানা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করবেন না? আব্বা বললেন, ব্যাটা মুরুব্বিদের সঙ্গে বেয়াদবি করা তোমার মজ্জাগত অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখছি। যাও তাঞ্জামে ওঠ। তারপর তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কোথাও তাঁকে দেখলাম না। (ছফা ২০০৮: ৫৪)

এ কেমন আব্বা? নিরাকার (real) জগতে সাদা মানে সাদাই। আকার জগতে শাদা মানে হয় লালের, নয় কালর বিপরীত। চিন দেশে সাদা শোক পালনের চিহ্ন। মুসলমান সমাজে কাফনের। যুদ্ধক্ষেত্রে সাদা শান্তির। সাকার বা দ্বৈতের জগতে সাদা প্রেমের ছবিও হতে পারে। দানিয়েলের স্বপ্নে সাদা বাসনার নয়, অবাসনার, অবসানের, মৃত্যুর নিশানা। বাবার সুন্দর কাপড়-চোপড়ের সঙ্গে ছেলের সাদা ধুতির বৈপরীত্যই জানিয়ে দেয়, এ জগৎ আকার জগৎ, নিশানার দুনিয়া। (ভান পেল্ট ২০০০: ৪৯) এই বৈপরীত্য বাসনা ও অবাসনার, রতি ও বিরতির—একই প্রাণের দু রকম উৎসারণের। রূপের ও রূপান্তরের। ফ্রয়েডের ব্যাখ্যা অনুসারে মানুষ স্বপ্ন দেখে বাসনার চাপ এবং বাসনার পরপারের চাপ—উভয় কারণে।

দানিয়েল বয়ান করছেন, দেখলেন চারজন মানুষ তাকেই একটা খাটিয়ায় করে তাদের গ্রামের পথ দিয়ে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে:

> তাদের কাউকে আমি চিনিনে। লোকগুলো আমার খাটিয়া বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় সুর করে বলছে, বল মোমিন আল্লা বল। তাদের কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে রাস্তার লোকেরাও বলছে, আল্লা বল। আমি মনে মনে বললাম, এ কেমন ধারা বিয়ে গো! বাজি পোড়ে না, বাজনা বাজে না। অমনি পায়ের দিকে বহনকারী দুজন লোক কথা কয়ে উঠল। এই লাশটা পাথরের মত ভারি। একে আমরা বয়ে নিয়ে যেতে পারব না। মাথার দিকের

বাহক দু'জন বলল, না না চল। আর তো অল্প পথ। তোমরা যাও আমরা পারব না। তারা কাঁধ থেকে কাত করে আমাকে রাস্তার উপর ফেলে দিল। আমি ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেলাম। তন্দ্রা টুটে গেল। হাঁটুতে প্রচণ্ড চোট লেগেছে। চোখ মেলে চাইলাম, আমি ফ্লোরের উপর শুয়ে আছি। আর শরীরে সত্যি সত্যি ব্যথা পেয়েছি। (ভূঞা ২০০৮: ৫৪-৫৫)

৫

ব্যাবিলনের বাদশাহ বখতেনাসার প্রকাশ নবুখদনিৎসর (Nebuchandnezzar) একদিন একটা বিরাট মূর্তি স্বপ্নে দেখলেন। মূর্তিটা বিরাট, অতিশয় তেজোবিশিষ্ট আর তার চেহারা ভয়ঙ্কর। সেই মূর্তির মাথাটা খাঁটি সোনার, বুক ও হাত রূপার এবং পেট ও রান ব্রোঞ্জের তৈরি। তার পা লোহার এবং পায়ের পাতা কিছুটা লোহা ও কিছুটা মাটি দিয়ে তৈরি ছিল। বাদশাহ যখন তাকিয়ে ছিলেন, তখন দেখলেন একটা পাথর কেটে নেওয়া হল। কিন্তু তা মানুষের হাতে কাটা হয় নাই। সেই পাথরটা লোহা ও মাটি মেশানো পায়ে আঘাত করে পা চুরমার করে ফেলল। তখন লোহা, মাটি, ব্রোঞ্জ, রূপা ও সোনা টুকরা টুকরা হয়ে ভেঙ্গে পড়ল এবং গরমকালে খামারের মেঝেতে পড়ে থাকা তুষের মত হয়ে গেল। বাতাস তা এমন করে উড়িয়ে নিয়ে গেল যে তার আর কোন চিহ্নই রইল না। যে পাথরটা মূর্তিকে আঘাত করেছিল, সেটা বিরাট পাহাড় হয়ে গিয়ে সমস্ত দুনিয়া দখল করে ফেলল। (সোসাইটি ২০০০: ১২৫০-৫১)

হজরত দানিয়েল আলায়হেস্সালাম এই স্বপ্নের অর্থ ব্যাখ্যা করলেন। তার আগে ব্যাবিলনের কোন গুণিন, ভূতের ওঝা, জাদুকর কিংবা গণক এর অর্থ উদ্ধার করতে পারেন নাই। দানিয়েল বললেন: হে মহারাজ, আপনি বাদশাহদের বাদশাহ। বেহেশতের আল্লাহ আপনাকে রাজ্য, ক্ষমতা, শক্তি ও সম্মান দান করেছেন। আপনার হাতে তিনি মানুষ, পশু আর পাখিদের দিয়েছেন। তারা যেখানেই বাস করুক না কেন, তিনি তাদের সকলকে আপনার অধীন করেছেন। আপনিই সেই সোনার মাথা।

আপনার রাজ্যের পর যে রাজ্য উঠবে, সেটা আপনার রাজ্যের মত মহান হবে না। তারপর তৃতীয় আর একটা রাজ্য উঠবে, সেটা সেই ব্রোঞ্জের পেট ও রান। আর গোটা দুনিয়া সেই রাজ্যের অধীন হবে। শেষে লোহার মত শক্ত চতুর্থ একটা রাজ্য উঠবে। লোহা যেমন সবকিছু ভেঙ্গে চুরমার করে তেমনি সেই রাজ্য অন্য সব রাজ্যকে ভেঙ্গে চুরমার করবে। আপনি স্বপ্নে সেই পায়ের পাতা ও পায়ের আঙ্গুলগুলোর কিছু অংশ মাটি ও কিছু অংশ লোহা দিয়ে তৈরি দেখেছিলেন তা আসলে একটা ভাগ করা রাজ্য। তবে আপনি যেমন মাটির সঙ্গে লোহা মেশানো

দেখেছেন, তেমনি সেই রাজ্যেও লোহার মত কিছু শক্তি থাকবে। পায়ের পাতা ও আঙ্গুল যেমন মেশানো ছিল তেমনি সেই রাজ্যের কিছু অংশ হবে শক্তিশালী ও কিছু অংশ দুর্বল। লোহার সঙ্গে মাটি মেশানোর অর্থ রাজ্যের লোকরা হবে মেশানো এবং লোহা যেমন মাটির সঙ্গে মেশে না, তেমনি তারাও এক হয়ে থাকবে না। ঐ সব বাদশাহর সময় বেহেশতের আল্লাহ এমন একটা রাজ্য স্থাপন করবেন, যেটা কখনো ধ্বংস হবে না কিংবা অন্য লোকের হাতে যাবে না। সেই রাজ্য ঐ সব রাজ্য চুরমার করে শেষ করে দেবে, কিন্তু সেই রাজ্য চিরকাল থাকবে। এটা হল সেই পাহাড় থেকে কেটে নেওয়া পাথর যেটা মানুষের হাতে কাটা হয়নি। পাথরটা লোহা, ব্রোঞ্জ, মাটি, রুপা ও সোনাকে টুকরা টুকরা করে ভেঙ্গে ফেলেছিল। ভবিষ্যতে যা ঘটবে, তা এইভাবে আল্লাহ তা'লা মহারাজকে দেখিয়ে দিয়েছেন। (সোসাইটি ২০০০: ১২৫১)

দানিয়েল পয়গম্বরের স্বপ্নের সঙ্গে আহমদ ছফার দানিয়েল চরিত্রের অনেক খাতির দেখা যায়। দানিয়েলের বন্ধু অর্চনাদেবী। তাঁর এক দূর সম্পর্কীয় দাদা এসেছেন ফ্রান্স থেকে। তিনি এক সময় অনুশীলন দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তারপর নেতাজি সুভাষ বোসের সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি বললেন:

> পরিস্থিতি যে-রকম দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তান ভেঙে পড়বেই, ভেঙে পড়তে বাধ্য। [বাংলাদেশে] একটি ভাষাভিত্তিক জাতীয় রাষ্ট্র জন্ম নিতে যাচ্ছে। এ কথা যদি বলি আশা করি অন্যায় হবে না। বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। তারপর ভারতকে একই সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। আঞ্চলিক, জাতিগত, ধর্ম এবং ভাষাগত বিচ্ছিন্নতার দাবি মেটাতে গিয়ে ভারতবর্ষের কর্তাব্যক্তিদের হিমসিম খেতে হবে। এমনকি ভারতের ঐক্যও বিপন্ন হতে পারে। (ছফা : ৯৮)

প্রমোদবাবু নামের এই জ্ঞানীলোকের যুক্তিও অভিন্ন। তিনি বললেন:

> রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে সামান্য অধিকার আমার আছে, তা দিয়েই বলতে পারি ভারতবর্ষের ব্যাপারে একজাতিতত্ত্ব এবং দ্বিজাতিতত্ত্ব কোনটাই খাটে না। আসলে ভারতবর্ষ বহুজাতি এবং বহুভাষার একটি মহাদেশ। উনিশ শ' সাতচল্লিশে ধর্মের প্রশ্নটি মুখ্য হয়ে অন্য সব প্রশ্ন ধামাচাপা দিয়েছিল। আরো একটা কথা, নানা অনগ্রসর পশ্চাদপদ জাতি এবং অঞ্চলের পশ্চাদপদ জনগণ তাদের প্রকৃত দাবি তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছিল বলেই আপাত-সমাধান হিসেবে ভারত-পাকিস্তান রাষ্ট্র দুটির জন্ম হয়েছিল। (ছফা : ৯৮)

৬

এই প্রবন্ধের অল্প পরিসরে আমার কথাটি আপাতত ফুরাল। ১৯৯৫ সালে খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস অলাতচক্র বিষয়ে যে মন্তব্য করেছিলেন, তার একটা জবাব না দিলে আমার মনের অশান্তিটা যাবে না। ইলিয়াস বলেছিলেন:

> অনেক সম্ভাবনা নিয়েও অলাতচক্র কোন উপন্যাসের খসড়ার একটি অংশ বলেই গণ্য হয়, বড়মাপের একটি শিল্পকর্মের মর্যাদা পায় না। (ইলিয়াস ১৯৯৫: ৯)

ইলিয়াসের এই বক্তব্যের কোন ভিত্তি আমি খুঁজে পাই নাই। তিনি লিখেছেন:

> ওঙ্কার-এ যেখানে একেকজন ব্যক্তিকে ছফা উত্তীর্ণ করেন বহু মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিতে, ক্রোধের কাছে আত্মসমর্পণ করে অলাতচক্র উপন্যাসে সেখানে একেকজনের টুকরা অংশগুলোকে ছুঁড়ে দিয়ে শিল্পী হিসাবে নিজের মাপটিকেই কি তিনি খাট করে ফেলেন না? (ইলিয়াস ১৯৯৫: ৯)

আমার বরং মনে হয় ইলিয়াস নিজেই বিক্ষুব্ধ। মীর মশাররফ হোসেনের *বিষাদ-সিন্ধুর* সঙ্গে যদি তিনি আহমদ ছফার অলাতচক্র উপন্যাসের তুলনা দিতেন, একটা যোগ্য কাজ করতেন। মীর যেখানে রাষ্ট্রের ভূমিতে মানুষের বাসনার ট্রাজেডি লিখেছেন, আহমদ ছফা সেখানে মানুষের বাসনার জমিতে রাষ্ট্রের গড়ন ও চলন ব্যাখ্যা করেছেন। মীরের যুগ ও জগৎ আর ছফার যুগ ও জগৎ আলাদা—এ কথা মানি। কিন্তু মীরের পর একমাত্র নজরুলকে বাদ দিলে আহমদ ছফাই সম্ভবত সবচেয়ে মহান বাঙালি মুসলমান লেখক।

বোধিনী

১. Thus, to take nihilism seriously is to commit suicide, to cease completely to act and—consequently—to live. But the *radical* skeptic does not interest Hegel, because, by definition he disappears by committing suicide, he ceases to be, and consequently he ceases to be a human being, an agent of historical evolution. Only the Nihilist who *remainsalive*is interesting. (Kojève 1969: 54)

২. সচরাচর ফ্রয়েডের মতবাদ বলে বাসনার যে অর্থ প্রচার করা হয় আমরা তা যথার্থ মনে করি না। আমাদের ব্যাখ্যার ভিত্তি ফরাসি মনোবিশ্লেষক পণ্ডিত জাক লাকাঁর রচনাবলি। (লাকাঁ ২০০৬)

দোহাই

১. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, 'ভূমিকা', *আহমদ ছফার পাঁচটি উপন্যাস* (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৯৫)।

২. আহমদ ছফা, *আহমদ ছফা রচনাবলি*, নূরুল আনোয়ার সম্পাদিত, ৩য় খণ্ড (ঢাকা: খান ব্রাদার্স, ২০০৮)।

৩. --------, *অলাতচক্র* (ঢাকা: শ্রীপ্রকাশ, ২০০০)।

৪. বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, *কিতাবুল মোকাদ্দস* (ঢাকা: বি.বি.এস., ২০০০)।

৫. Alexandre Kojève, *Introduction to the Reading of Hegel: Lectures on the Phenomenology of Spirit*, Raymond Queneau, ed., J. H. Nichols, Jr., trans., Allan Bloom, ed. (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1969).

৬. Jacques Lacan, *Écrits: The First Complete Edition in English*, Bruce Fink, trans. (New York: W. W. Norton, 2006).

৭. Tamise Van Pelt, *The Other Side of Desire: Lacan's Theory of the Registers* (Albany, NY: State University of New York Press, 2000).

৮. Jean-Jacques Rousseau, 'Discourse on the Sciences and Arts (First Discourse) and Polemics', in *Collected Writings of Rousseau*, R. D. Masters and C. Kelly, eds., vol. 2 (Hanover: University Press of New England, 1992).

....

উৎস
যুগান্তর ॥ ২৭ জুলাই ২০০১
বেহাত বিপ্লব ১৯৭১ ॥ ঢাকা ২০০৭

১৬

বাসনার নারীভাব

আহমদ ছফার 'গাভী বিত্তান্ত'

> O sage mir, wie geht es zu,
> Gibt weisse Milch die röte ku.
>
> *এ কি আজব কাণ্ড, ওলো*
> *রাঙা গাইয়ের দুধ কেমনে ধলা হলো?*

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত 'মহেশ' গল্পটি এক সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা শ্রেণীর পাঠ্যতালিকায় উঠেছিল। এক সময় কি এক অজ্ঞাত কারণে গল্পটিকে তালিকা থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৩৬ সালের ৩১ জুলাই ঢাকার বিখ্যাত মুসলিম সাহিত্য সমাজের দশম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ দেওয়ার সময় ঘটনাটির উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র বলেন:

> বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নিজের কোনো যোগ নেই, ভাবলাম এমনিই হয়ত নিয়ম। কিছুদিন থাকে, আবার যায়। কিন্তু বহুদিন পরে এক সাহিত্যিক বন্ধুর মুখে কথায় কথায় তার আসল কারণ শুনতে পেলাম। আমার গল্পটিতে নাকি গো হত্যা আছে। অহো! হিন্দু বালকের বুকে যে শূল বিদ্ধ হবে! বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বহু টাকা মাইনের কর্তামশায় এ অনাচার সইবেন কী করে? তাই মহেশের স্থানে শুভাগমন হয়েছে তাঁর স্বরচিত গল্প 'প্রেমের ঠাকুরে'র। (চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৬: ১৪৬)

আহমদ ছফার ভাগ্য শরৎচন্দ্রের সমান মন্দ হয় নাই। তাঁর উপন্যাস *গাভী বিত্তান্ত*তে গো হত্যা আছে। কিন্তু যাঁদের বুকে শূল বিদ্ধ হয়েছে তাঁরা 'হিন্দু বালক' নয়। এঁদের একজনের নাম সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। আহমদ ছফা স্মারকগ্রন্থে প্রকাশিত এক ইংরেজি নিবন্ধে তিনি জাহির করতে রাজি হয়েছেন—*গাভী বিত্তান্ত* বইটি তাঁর বুকেও শূল বিদ্ধ করেছে। মনজুর লিখেছেন:

> আহমদ ছফার *গাভী বিত্তান্ত* একটা তামাশামাত্র। বইটা পড়ে আমি সত্যি সত্যি প্রাণে ব্যথা পেয়েছি। এই রকম একটা লেখা লিখতে তিনি কী আশ্চর্য কারণে আপন সময় ও শক্তি খরচ করলেন সে শুধু তিনিই বলবার পারেন। (ইসলাম ২০০৩: ২৯৬)

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম যদি বিশদ যুক্তিবিস্তার করতেন আমরা নিশ্চয়ই উপকৃত হতাম। কিন্তু তা তিনি করেন নাই। *গাভী বিত্তান্ত* আহমদ ছফার দাবি অনুসারে—'এই দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ে লেখা একমাত্র উপন্যাস।' ছফা আরো দাবি করেছেন এই রচনাটি 'বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্পণে দেশ সমাজ এবং জাতিকে নিরীক্ষণের মহামূল্য প্রমাণ'ও বটে। আহমদ ছফার এই দাবির সঙ্গে সকলেই একমত হবেন এমন আশা করা হয়তো সঙ্গত নয়। আমার দাবিও সেটা নয়। আমি অন্য একটা কথা তুলতে চাই এখানে।

আমার দাবি, সমসাময়িক দেশ সমাজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমালোচনার মধ্যেই এই উপন্যাসের আবেদন সীমিত নাই। মানুষের বাসনার শেষ নাই বা বাসনা মাত্রই অপূরণীয়—এই সত্যের সচিত্র সংস্করণ আহমদ ছফা *গাভী বিত্তান্ত* নামে প্রচার করেছেন।

বাসনার অপূরণ-সম্ভবতা থেকে যেই হৃদয়বিদারক নাট্যের উদ্ভব হয় এখানে তার কিছু প্রমাণ তিনি হাজির করেছেন। ছফার বয়ানে বাসনা হাজির হয়েছে 'নারী' আকারে। এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র নুরুন্নাহার বানু। পারস্য ভাষায় বানু শব্দের অর্থ নারী, নির্বিশেষ নারী—এই কথা খেয়াল করলে আমার ইশারা বুঝাতে সহায় হয়। আহমদ ছফার *গাভী বিত্তান্ত* তাই যুগপৎ নারীর ও বাসনার ট্রাজেডি আকারে হাজির হয়েছে। কিভাবে, তা আমি সংক্ষেপে নিবেদন করব। নারীবিদ্বেষ এর হাসির ছটা মাত্র, ভিতরে তার বাসনার বলি আর শূন্যতার গ্রহণ।

তার আগে মনে পড়ছে কয়েকটি আপত্তির কথা। আমাদের এই মহান লেখকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে: তাঁর লেখা নারীবিদ্বেষপূর্ণ। যেমন 'আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা' নামে আমরা যখন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করি তখন উপস্থিত সভ্যদের চার জন একটি প্রতিবাদমূলক পত্রে জানান, 'তাঁর শত গুণ থাকা সত্ত্বেও তিনি নারীবিদ্বেষী হিসেবে প্রতিভাত, তাঁর সাহিত্যে নারীর উপস্থাপন সমস্যাজনক।' (খালেদা গয়রহ ২০০৩: ৬৪) আমাদের এই চার জন শ্রদ্ধাভাজন পত্রকার *গাভী বিত্তান্ত* বইটির কথা তোলেন নাই। তবে তোলা অসম্ভব ছিল না। আমার বক্তব্য বলার সময় আমি আমার এই বন্ধুদের আপত্তির কথাও মনে রাখব।

উল্লেখ্য, হয়তো অপ্রাসঙ্গিক নয়, সমকালীন ইংরেজি সাহিত্য বিশারদ গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকও মুখরোচক আলোচনায় আমাকে কয়েক বছর আগে নিউইয়র্ক শহরে বলেন: আহমদ ছফার এই লেখাটি ভারি নারীবিদ্বেষী বা মিসোজিনিস্ট (misogynist)। সবিনয়ে বলতে চাই: গায়ত্রীদেবীর এই দাবি যতটুকু সত্য, শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্প হিন্দুবিদ্বেষী দাবিটাও ততটাই সত্যমাত্র। তার বেশি নয়।

আগে শরৎচন্দ্রের কথায় আসি। ১৯৩৬ সালের বক্তৃতায় শরৎচন্দ্র নিজ গল্পের একটি সংক্ষিপ্ত বয়ান পেশ করেন। আগে আমরা সেটি শুনি:

> একটি হিন্দুপ্রধান, হিন্দু-জমিদারশাসিত ক্ষুদ্র গ্রামে গরিব চাষী গফুরের বাড়ি। বেচারার থাকার মধ্যে ছিল বহুজীর্ণ, বহুছিদ্রযুক্ত একখানি খড়ের ঘর। গফুর দশেকের মেয়ে আমিনা আর একটি ষাঁড়। গফুর ভালোবেসে তার নাম দিয়েছিল মহেশ। বাকি খাজনার দায়ে ছোট গাঁয়ের ততোধিক ছোট জমিদার যখন তার ক্ষেতের ধান খড় আটক করলে তখন সে কেঁদে বললে, 'হুজুর! আমার ধান তুমি নাও। বাপ-বেটিতে ভিক্ষে করে খাবো, কিন্তু খড় কটি দাও,—নইলে এ দুর্দিনে মহেশকে আমার বাঁচাবো কী করে?' কিন্তু রোদন তার অরণ্যে রোদন হল, কেউ দয়া করলে না। তারপরে শুরু হলো তার কত রকমের দুঃখ, কত রকমের উৎপীড়ন। মেয়ে জলের জন্যে বাইরে গেলে সে জীর্ণ কুটিরের খড় ছিঁড়ে নিয়ে লুকিয়ে মহেশকে খাওয়াতো, মিছে করে বলতো 'মা আমিনা, আজ আমার জ্বর হয়েছে। আমার ভাত কটি তুই মহেশকে দে।' সারাদিন নিজে অভুক্ত থাকতো। ক্ষুধার জ্বালায় মহেশ অত্যাচার করলে এই ১০ বছরের মেয়েটার কাছেও তার ভয় ও কুণ্ঠার অবধি থাকতো না। লোকে বলতো, 'গরুটাকে তুই খাওয়াতে পারিস নে গফুর, ওকে বেচে দে।' গফুর চোখের জল ফেলে আস্তে আস্তে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলতো, 'মহেশ তুই আমার ব্যাটা, আমাকে তুই সাত সন প্রতিপালন করেছিস। খেতে না পেয়ে তুই কত রোগা হয়ে গেছিস, তোকে কি আজ আমি পরের হাতে দিতে পারি বাবা!' এমনি করে দিন যখন আর কাটতে চায় না তখন একদিন অকস্মাৎ এক বিষম কাণ্ড ঘটলো। সে গ্রামে জলও সুলভ নয়। শুকনো পুকুরের নিচে গর্ত কেটে সামান্য একটুখানি পানীয়জল বহু দুঃখে মেলে। আমিনা দরিদ্র মুসলমানের মেয়ে। ছোঁয়া-ছুঁইর ভয়ে পুকুরের পাড়ে দূরে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশী মেয়েদের কাছে চেয়েচিন্তে অনেক দুঃখে, বিলম্বে তার কলসীটি পূর্ণ করে বাড়ি ফিরে এলো। এখন ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত মহেশ তাকে ফেলে দিয়ে, কলসী ভেঙে ফেলে এক নিশ্বাসে মাটি থেকে জল শুষে খেতে লাগলো। মেয়ে কেঁদে উঠলো। জ্বরগ্রস্ত, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ গফুর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো—এ দৃশ্য তার সইলো না। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যা সুমুখে পেলে-একখণ্ড কাঠ দিয়ে সবলে মহেশের মাথায় মেরে বসলো। অনশনে মৃতকল্প গরুটা বার দুই হাত পা ছুঁড়ে প্রাণ ত্যাগ করলে।
>
> প্রতিবেশীরা এসে বললে 'হিন্দুর গাঁয়ে গো-হত্যা!...
>
> (চট্টোপাধ্যায় ২০০২ [১৯৩৬])

সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু আরেকটু বয়ান করে শরৎচন্দ্র মন্তব্য করলেন: 'এই হলো গো হত্যা! এই পড়ে হিন্দুর ছেলের বুকে শেল বিঁধবে!' জমিদারবাবু প্রায়শ্চিত্তের দাবি তুলেছেন। গফুর সেই রাতেই গাঁ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। শরৎচন্দ্রের বয়ানে আছে:

> আমিনা জল খাবার পাত্র এবং বাবার ভাত খাবার পিতলের থালাটি সঙ্গে নিতেছিল কিন্তু বাবা বারণ করে বললে ওসব থাক মা, ওতে আমার মহেশের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

আহমদ ছফার বয়ান শুরু হয় যাদের আমরা সাক্ষীগোপাল বলি সেই রকম এক গোবেচারা অধ্যাপকের উপাচার্য পদে নিয়োগপ্রাপ্তির ঘটনা দিয়ে। ভদ্রলোকের নাম ছফা রেখেছেন মিয়া মুহাম্মদ আবু জুনায়েদ। তাঁর মধ্যে ভয় কিংবা করুণাগুণের এমন বিশেষ জটিলা নাই যে তাকে ট্রাজেডির নায়ক বলা যায়। কিন্তু বাসনা আছে। উপাচার্য পদে নিযুক্ত হবেন এমন আশা তাঁর ছিল না, কিন্তু ঘটনাচক্র যখন সেই মহান পদে তাঁকে বসিয়ে দিল তখন তাঁর পরম বাসনা দেখা দিল। তিনি একটি গরু পুষবেন। এক বিদেশি রাষ্ট্রদূতের প্রশ্নের উত্তরে উপাচার্য মহোদয় একদিন ইংরেজিতে যাহা বলেছিলেন তাহার বাংলা তর্জমা অনেকটা এ রকম:

> হিন্দুরা গরু পূজা করে, আমরা গরুর গোশত খাই—দুটোই সাচ্চা বাত। তবে আমরা গরু ভালবাসি—এ কথাও সত্য।
>
> 'Your Excellency is perfectly right Hindus do worship cow and we people eat beaf. But it is also true we love cow very much.' (ছফা ২০০৩: ৩১৭)

এই গরু পোষার বাসনা উপাচার্য আবু জুনায়েদ সাহেবকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকাদার শেখ তবারক আলীর তবারক—ওরফে প্রসাদ—গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। তবারক আলী সাহেবের টাকায় গরু কেনা হয়, গোশালাটাও তিনিই বানিয়ে দেন। উপাচার্যের কন্যা এবং স্ত্রীকেও বিবিধ রতন উপহার দেওয়া হয় তার তরফে। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে ওঠে শেখ তবারকের উপহার অথবা উপচার্যের গাভী। এই গাভী সম্পর্কে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপকের মন্তব্য:

> শোন বৎস আমাদের শাস্ত্রে গাভীকে মাতার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। যে পাষণ্ড গাভীর মধ্যে মাতৃমূর্তি দর্শন করিতে না পারে, তাহাকে জন্ম জন্মান্তর তীর্যক যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এই হইল গিয়া তোমার শাস্ত্রের বিধান। তথাপি তোমার এই চতুষ্পদের তন্বাটিকে দেখিয়া আমার মনে ভিন্ন ধরনের জল্পনা শুরু হইয়াছে। সংস্কৃত কাব্যে এক ধরনের সুন্দরী রমণীকে হস্তিনী রমণী বলিয়া মহাকবিগণ শনাক্ত করিয়া গিয়াছেন। তোমার গাভী দর্শন করিয়া আমার কী কারণে হস্তিনী নায়িকার কথা মনে হইতেছে বলিতে পারি না। মহাকাব্যের যুগে যেই ধরনের গাভীকে কামধেনু বলা হইত তোমার গাভীটি সেই জাতের। ইহাকে যত্ন করিয়া রাখিবে। (ছফা ২০০৩: ২৯১-৯২)

মহাকাব্যের যুগ থেকে তুলে আনা কামধেনুকে আহমদ ছফা উপন্যাসের যুগের কামনার ধন বানিয়ে ছেড়েছেন। বাংলাদেশের শাসক জাতির বৈদেশিক ইন্দ্রিয়পরায়ণতার চিহ্ন হিসাবে হাজির করেছেন তিনি এই গাভীটিকে। গরুটির নাম তরণী রাখা হয়েছে। তবে গরুটির জাত নির্ণয় সহজ নয়।

> ...এই প্রজাতির গরু বাংলাদেশে এই একটিই আছে এবং গরুটির মা-বাবা উভয়েই শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ভুক্ত। বাবা অস্ট্রেলিয়ান, মা সুইডিশ। ...গরুটি যে একবার দেখবে

> প্রথম দর্শনেই বুঝে যাবে এটা ভিন্ন জাতের গরু। বাংলাদেশের গরুসম্প্রদায়ের আত্মীয়স্বজন কেউ নয় এই চতুষ্পদের বেটি। তারপরেও জাতীয়তার বিচারে তরুণীকে বাংলাদেশী বলতে হবে, কারণ তার জন্মস্থান বাংলাদেশ। (২০০৩: ২৭২)

তরুণীকে যদি উপন্যাসের নায়িকা বলায় কারো আপত্তি থাকে, তবে উপাচার্যের স্ত্রী নূরুন্নাহার বানু সেই পদটিতে সহজেই নিযুক্তি পেতে পারেন। এই গাভীকে কেন্দ্র করে উপাচার্যের সঙ্গে তার স্ত্রীর মনোমালিন্য দেখা দেয়। এই মনোমালিন্যেরই এক পর্যায়ে নূরুন্নাহার বানু বিষ প্রয়োগ করে ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা গাভীটিকে হত্যা করেন। এই হচ্ছে *গাভী বিত্তান্ত* উপন্যাসের গো-হত্যা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবের ঘরে এই হত্যা স্থূল আকারে বিদ্ধ হয়েছে।

২

নূরুন্নাহার বানু একটি ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা গাভীকে বিষ দিয়ে কেন মারলেন? কী তার বাসনা? এর ব্যাখ্যা এক নয়, অনেক। বিষ প্রয়োগের ঠিক পূর্বমুহূর্তে তাঁর একে একে মনে পড়তে লাগল অনেক কাহিনী। স্বামী পর হয়ে গেছে এই গাভিন গরুর জন্য। নূরুন্নাহারের অচেতন গুজব আকারে ভাসে। অচেতন কোন গোপন সত্য নয়, যা প্রকাশ্যে গোপন তাহাকেই অচেতন বলে। উপাচার্য সাহেব একটা নতুন জাতের গরু সংগ্রহ করেছেন। ছাত্রীনিবাসে সংবাদটা 'আজগুবি গুজব' আকারে হাজির হল (সূত্রধর বলছেন) এভাবে:

> এটাকে ঠিক গরু বলা যাবে কি না সে ব্যাপারেও বিতর্ক আছে। গরুটির গর্ভধারিণী হলো সুন্দরবনের একটা শিঙাল মাদি হরিণ এবং বাবা অস্ট্রেলিয়ান ষাঁড়। মাদি হরিণের গর্ভে এবং অস্ট্রেলিয়ান ষাঁড়ের ঔরসে উপাচার্য সাহেবের গরুটি পয়দা হয়েছে। গরুটির আকার প্রকার গরুর মতো। গায়ের রঙ, চোখের দৃষ্টি, স্বভাবের চঞ্চলতা সবটা হরিণের মতো। গরুটি এই অল্প সময়ের মধ্যে উপাচার্য সাহেবের কলিজার টুকরো হয়ে দাঁড়িয়েছে। (ছফা ২০০৩: ২৯৭)

গুজবের আর একটি রূপ চালু হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী এবং মহিলা মহলে:

> একটা জিন কিংবা পরীর সঙ্গে উপাচার্য আবু জুনায়েদের গভীর ভালোবাসা হয়েছে। এই পরীটাই দিনের বেলা সুন্দর একটা গরুর বেশ ধরে গোয়াল ঘরে শুয়ে থাকে। রাত গভীর হলে অনিন্দ্যসুন্দর একটা মেয়ে মানুষ হয়ে আবু জুনায়েদের সঙ্গে রঙ-ঢঙ মতো কিছু করে। আবু জুনায়েদ রাতে ঘরে থাকেন না। পরী কন্যার সঙ্গেই গোটা রাত আশনাই

> করে কাটিয়ে দেন। এখন আবু জুনায়েদের সঙ্গে তার বড় পত্নী নুরুন্নাহার বানুর কোনো সম্পর্ক নেই। স্বামী স্ত্রীতে কথা বলা পর্যন্ত বন্ধ। (ছফা ২০০৩: ২৯৭-৯৮)

বিষয়টি কি সম্পূর্ণ নুরুন্নাহারের মনগড়া? সূত্রধর বলছেন, না। স্ত্রীর সঙ্গে তুচ্ছ বিষয় থেকে মহৎ বিষয় সব নিয়েই এখন উপাচার্যের কলহ। লোকে যাকে দাম্পত্য কলহ বলে এই বস্তু হয়তো তা-ই। উপাচার্য পদ পাওয়ার পর কোন এক অজ্ঞাত মুহূর্তে, দিনে দিনে আবু জুনায়েদের পারিবারিক জীবনটা একটা নরককুণ্ড হয়ে উঠল। যেন এর বিপরীতে একটা বেহেশতের সন্ধান তিনি পেলেন গরুর আকারে। সূত্রধর এই বেহেশতের নাম দিয়েছেন 'আরেকটা গোপন জীবন'।

> মনে মনে আবু জুনায়েদ গরুটার কাছে ঋণী অনুভব করেন। গরুটা সময়মতো তাঁর গোয়ালে এসেছিল বলেই আবু জুনায়েদের কাছে জীবন অনেকখানি সহনীয় হয়ে উঠেছে। তিনি রাতের বেলা ঘুমোতে যাবার আগে চিন্তা করেন সকালে ঘুম থেকে উঠে গরুটার মুখ দেখবেন। অফিসে যাওয়ার সময় ভাবেন, ফিরে এসে গরুটাকে দেখতে পাবেন। এমনি করে গরুকে কেন্দ্র করে তার গোটা জীবনের মধ্যে একটা চোরা আবর্ত সৃষ্টি হলো। (ছফা ২০০৩: ২৭৫)

একদিন রাতে উপাচার্য গাভী দর্শনে গেছেন। হঠাৎ তার চোখ গাভীর ওলানের দিকে যায়। হঠাৎ করে ওলানটা ধরে দেখবার ইচ্ছা তাঁকে পেয়ে বসল! এ ইচ্ছা তার আগেও জেগেছিল দিনে। রাতের স্বাধীনতায় সেই ইচ্ছার জয় হল।

> ওলানটা রক্তিম বর্ণের। এই তুলতুলে মাংসপিণ্ড স্পর্শ করামাত্রই তার স্মৃতিতে ভেসে উঠল, আজ থেকে অনেকদিন আগে, যখন তার সবে গোঁফ গজিয়েছে, শিশ্নের মধ্যে বীর্যসঞ্চার হয়েছে, এক দূর সম্পর্কীয়া মামী আবু জুনায়েদকে দিয়ে তাঁর বিশাল বিশাল স্তন মর্দন করিয়েছিলেন। আবু জুনায়েদের মনে সেই পুলক, সেই অনুভূতি জেগে উঠল। আবু জুনায়েদের মনে হলো তরণীর এই রক্তিম ওলান, এই স্ফীত বাঁটগুলোর মধ্য দিয়ে চরাচরের নারীসত্তা প্রাণ পেয়ে উঠেছে। (ছফা ২০০৩: ২৭৮)

অচেতনের এই চেতন চেহারা দেখার পর নুরুন্নাহার বানুর সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। সেই রাতেই তিনি ঠিক করে ফেলেছেন আবু জুনায়েদের শখের গরুটাকে সময় এবং সুযোগ এলে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবেন। নুরুন্নাহার হতে চেয়েছিলেন আবু জুনায়েদের বাসনা। তার সেই স্থান দখল করেছে নিরীহ গাভী। যখন লোকজন থাকে না নুরুন্নাহার তখন লুকিয়ে চুরিয়ে গরুটাকে দেখে আসেন।

> গরুটাকে অনেকটা সতীনের মতো ধরে নিয়ে গোয়াল ঘর থেকে ঝাড়ু কুড়িয়ে নিয়ে কয়েক ঘা বসিয়ে দেন। (ছফা ২০০৩: ২৭৯)

নুরুন্নাহারের বাসনা নানা জায়গায় গিয়ে ফিরে আসে। তবারক আলীর স্ত্রী বানুর মেয়ে দীলুকে যেই বেনারসিটা উপহার দিয়েছেন, সেই কাপড়টার প্রতি নুরুন্নাহার

বানুর ভীষণ লোভ। যখন তখন সেই শাড়িটাই পরে বসেন। তবারক আলীর সুদর্শন জামাই আবেদ হোসেনকে নূরুন্নাহার বানু পছন্দ করেন। 'কারণ শুধু তাঁর চেহারা নয়, স্বভাব চরিত্র কথাবার্তা সব সুন্দর। মাঝে মাঝে আবেদকে নূরুন্নাহার বানুর ছোটো ভাইটির মতো আদর করতে ইচ্ছে হয়।' (ছফা ২০০৩: ২৭৯)

একদিন বানু দেখতে পেলেন গোয়াল ঘরের ভিতর আবেদ হোসেন দীলুর স্তন টিপে টিপে আদর করছেন। আর দীলু তার গলা জড়িয়ে ধরে খিলখিল করে হাসছে। তবারক আলীর স্পর্শে পাপ ছাড়া আর কিছুই জন্মাতে পারে না—তার এই উপলব্ধি হল।

> নূরুন্নাহার বানুর ইচ্ছে হলো এক্ষুনি যদি তিনি তবারক আলীর দেয়া সবকিছু ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারেন, তাহলে বাঁচার একটা উপায় হয়তো খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু শাড়ি গয়না ওসব তিনি ছুঁড়ে ফেলে দেবেন কোথায়? কাজের লোকজনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারেন। কাজের বেটির গায়ে জড়োয়া গয়না কি মানায়! তার চেয়ে নূরুন্নাহার বানুর কাছেই থাকুক। নারী হৃদয় বড় বেশি সোনার বশীভূত। (ছফা ২০০৩: ২৮১)

৩

আমাদের ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয় নামক প্রতিষ্ঠানে যেই কাজ হয় তাকে সচরাচর 'গবেষণা' বলা হয়। আমরা খেয়ালই করি না, গবেষণা কথাটি একটি রূপক। আমাদের ইতিহাসের এক পাতায় লেখা আছে, একদা রাখাল হারিয়ে যাওয়া গরু খুঁজে বেড়াত। গরু কথাটির উৎপত্তিতেই আছে যে ঘুর ঘুর করে, গমিত হয়, সে-ই গরু। গরু খোঁজার আবেগকে এই কালে জ্ঞান খোঁজার বাসনার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে বলেই আমরা গবেষণা শব্দটি পেলাম।

শব্দটি বেশ। গো এষণার রূপান্তর গবেষণা, কিন্তু এর একটা নামান্তরও আছে। তার নাম গো বাসনা। একলা ভারতবর্ষের নয়, দুনিয়ার আর দশ জাতির ইতিহাস-পুরাণেও সেই কথা লেখা আছে। আমাদের গবেষণা কী করে গো বাসনা হল তার কাহিনী এই নামান্তরে পাওয়া যাবে। এষণা ও বাসনার উচ্চারণ ভেদ সামান্য, কিন্তু তার অর্থভেদ অসামান্য। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় আকাশে গবেষণার জায়গায় গো বাসনা চলছে—হয়তো *গাভী বিত্তান্ত* কাহিনীর এটাই কহতব্য। সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বা তাঁর মতন মহান বিচারকরা সম্ভবত এখানেই প্রাণের আঘাতটি গ্রহণ করেছেন।

উপাচার্যের গাভীটি যেই দিন নিহত হলেন, সেই দিন তিনি একটা স্বপ্ন দেখলেন।

> শেখ তবারক আলী তাকে হাত ধরে গরুর মৃতদেহটার কাছে নিয়ে গেলেন। গরুটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছেন, কী জামাই মিয়া আপনাকে কি আমি সঠিক পথ দেখাইনি। (ছফা ২০০৩: ৩২০)

এই স্বপ্নের অর্থ পরিষ্কার হল খানিক পর। তার ভাগ্য খুলে গেল এক টেলিফোনে। শিক্ষামন্ত্রীর কাছে তিনি জানতে পারলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একান্নটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে বক্তৃতা দিতে হবে। বক্তৃতাপিছু তাঁকে ৪ হাজার ডলার সম্মানী দেওয়া হবে। হিসাব কষে তিনি দেখলেন বিরাশি লক্ষ বাংলা টাকা। স্বপ্নের তাৎপর্য তাঁর কাছে জলের মতন পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি ইচ্ছা করলে পাঁচশ একর, এক হাজার একর মনের মতন জমি পছন্দ করে কিনতে পারবেন।

আবু জুনায়েদের বাসনা আল্লাহ সৎ পথেই পূরণ করেছেন। কিন্তু আবু জুনায়েদ এখনো জানেন না কে তার বাসনার গাভীটি হত্যা করেছে। খবরটা নুরুন্নাহারকেই দিতে হল: খুনটা তিনিই করেছেন। তবে টাকাটা আবু জুনায়েদকেই খরচ করতে হবে। প্রেমিকা-গাভীর কবরের উপর তাজমহল বানাতে ৮২ লাখ টাকা লাগবে।

উপাচার্যের বাসনাকে খুন করেছেন তাঁর না-বাসনা। নর ও নারীর মধ্যে ভালবাসার যেই কাহিনী আমরা প্রতিদিন শুনে থাকি—আহমদ ছফা এখানে তার অসম্ভব ভাব হাজির করেছেন। নর ও নারীর ভিতর কোন সম্পর্ক হওয়ার আগে একটা শর্ত পূরণ করতে হয়। সেই শর্ত অতীব সরল। নরকে নর আর নারীকে নারী হতে হয়। কিন্তু নর ও নারী বলে দুটি আলাদা ভাব, স্বতন্ত্র আকার নাই। যা নর নয়, তা-ই নারী—সংজ্ঞাটা এভাবেই দেওয়া হয়। নারী কী বস্তু তা কখনোই বলা হয় না। নরের পাঁজর জ্বালিয়ে নারী বানানোর পুরাণকাহিনী সম্পূর্ণ নিরর্থক নয়। নর ও নারীর মধ্যে ভেদ করার চিহ্ন একটা। এক অঙ্গুলি হেলনে যেমন চন্দ্র দ্বিখণ্ড, দায়ের এক কোপে যেমন শসা দ্বিখণ্ড, তেমনি এক চিহ্নে নারী ও নর দ্বিখণ্ডিত। যেই কোপে নর ও নারীকে দুই টুকরা করা হয় সেই কোপের নাম 'পুরুষ'। ইংরেজিতে কহে ফ্যালাস (phallus)।

নর হাতে চায় 'পুরুষ' বা ক্ষমতার দণ্ড। নারী চায় খোদ সেই পুরুষ হয়ে উঠতে। নর ও নারীর মধ্যে এই কারণেই কোনদিন মিত্রভাব সম্ভব নয়। প্রভু যেই দেশে পুরুষ, সেই দেশে নর ও নারী দুই খণ্ডই পুরুষের বান্দা। নর মনে করে সে পুরুষের মালিক। অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে পুরুষই তার মালিক। অন্যদিকে নারী মনে করে সে পুরুষ হবে। এখানে পুরুষ মানে খোদ বাসনার চিহ্ন। কপাল এই যে পুরুষ এখানে নারী হয়ে ওঠে। আমার লেখার এটুকু যাঁদের হেঁয়ালি মনে হবে তাঁদের একটা পরামর্শ দিই: নর অর্থে 'ম্যান (man), নারী অর্থে ওম্যান (woman) এবং পুরুষ অর্থে 'ফ্যালাস' পড়বেন। একটু সহজ লাগবে। নারী ও নর উভয়কে আমি বান্দা বা সাবজেক্ট (subject) বলছি। আর বন্দেগি বলতে আমি সাবজেকটিভিটি (subjectivity) বা সেক্সুয়ালিটি (sexuality) দুইটাকেই বুঝব। বাসনা ও বন্দেগি বিষয়ে আমি আর এক জায়গায় 'আগাপাতলা' লিখেছি। (খান ২০০৩)

আহমদ ছফার গাভী বিত্তান্ত-তে বান্দা আবু জুনায়েদ ক্ষমতা বা পুরুষের 'মালিক' হন। কিন্তু পরক্ষণেই বান্দা টের পান ক্ষমতাই তার মালিক। বান্দার

পুরুষপদ (phallus/ signifier of desire) বাসনা একটা গাভী বা নারী আকারে হাজির হয়।

ঐদিকে বান্দা নুরুন্নাহার বানু যখন নিজ বন্দেগি (subjectivity) জাহির করতে যান—নিজেই হতে চান পুরুষ বা বাসনার চিহ্ন—তখন দেখেন সেই চিহ্ন আর তিনি নন, অন্য কেউ, তিনি সরে গেছেন সেই পদ থেকে। নরের বন্দেগি যেখানে পুরুষপদ আকারে প্রকাশ পায়, সেইখানে নারীর বন্দেগিও পুরুষপদ আকারে হাজির হয়। যেই দেশে পুরুষ প্রভু সেই দেশে নারীর বন্দেগি মানে দাঁড়ায় পরচর্চা—পুরুষ হওয়ার বাসনা।

আহমদ ছফার *গাভী বিত্তান্ত* উপন্যাসে নারীর বন্দেগি এই বিরোধ আকারে প্রকাশ পেয়েছে। বাসনার চিহ্নকে পুরুষ বলা হয়, কিন্তু পুরুষ খোদ বাসনা নয়। চিহ্ন বা পদের সঙ্গে খোদ বা পদার্থের এই বিরোধ নিবারণের কোন উপায় নাই। পুরুষ যেখানে চিহ্ন, বাসনা সেখানে খোদ। বাসনার এই ভাবকেই আমরা বলি নারীভাব। পুরুষ না হলে বাসনা হয় না। সেই অর্থে পুরুষই বাসনার স্রষ্টা। কিন্তু পুরুষ একই সঙ্গে নিজেও নিজের স্রষ্টা। বাসনার স্রষ্টা হয়েও পুরুষ বাসনার নাগাল পায় না। বাসনা অধরা, নিরাকার, পরাধীন। পুরুষেরই অপর নাম তাই হয় 'পর' বা অতিশয়ে 'পরম'।

*গাভী বিত্তান্ত*কে যাঁরা নারীবিদ্বেষী বলেছেন তাঁদের বলি, বিষয়টা নিয়ে আরো ভেবে দেখুন। শেক্সপিয়র যতটা নারীবিদ্বেষী আহমদ ছফা ততটা নন এই উপন্যাসে। এই তুলনা সোফোক্লেসের 'আন্তিগোনে' পর্যন্ত টানা যেতে পারে। কিন্তু আমি এখানে সেই টানাপোড়েনে যাব না। সেই কথাও আমি আমার কোন কোন প্রবন্ধে লিখেছি। (খান ২০০৩)

বাসনার অপর নাম যদি মানুষ হয় তো ইচ্ছা হয় আহমদ ছফাকে আমরা মানববিদ্বেষীও বলতে পারি। বাসনার ট্রাজেডি মানুষেরই ট্রাজেডি, ট্রাজেডি লেখককে যারা মানববিদ্বেষী বলেন তাঁরা হয়তো সত্য কথাই বলেন।

দোহাই

১. খালেদা খাতুন গয়রহ, ''আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা' এবং লিঙ্গীয় সম্পর্ক নিয়ে অধিপতির অবনাজান। চিঠি', *রাষ্ট্রসভা পত্রমালা*, ২য় সংখ্যা (ঢাকা, ২০০২)।

২. সলিমুল্লাহ খান, 'বাসনার নীতিভাব: ফ্রয়েড ও লাকাঁ', গোবিন্দ চন্দ্র দেব দর্শন কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাকা, ২৭ জুলাই ২০০৩): অলিখিত বক্তৃতা।

৩. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'দশম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ' (১৯৩৬), হাবিব রহমান সম্পাদিত, *মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এর বার্ষিক অধিবেশন: সভাপতিদের অভিভাষণ* (ঢাকা, ২০০২)।

৪. আহমদ ছফা, *রচনাবলী–৪* (ঢাকা, ২০০৩)।
৫. অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *পৌরাণিকা*, ১ম খণ্ড (কলকাতা, ১৯৮৫)।
৬. Syed Manzoorul Islam, 'Death in the Afternoon: The Passing Away of Ahmed Sofa', মোরশেদ শফিউল হাসান ও সোহরাব হাসান সম্পাদিত, *আহমদ ছফা স্মারকগ্রন্থ* (ঢাকা, ২০০৩)।
৭. M. Stutley and J. Stutley, *A Dictionary of Hinduism: Its Mythology, Folklore and Development, 1500 B.C.–A.D. 1500* (London, 1977).

....

উৎস
ভোরের কাগজ ১ জুলাই ২০০৪

১৭

আবুল হাসানের অজ্ঞান

পরম করুণাময় এই অধমকে দিয়ে 'কাজী নজরুলের অজ্ঞান' নামে এক নিবন্ধ লিখিয়ে নিয়েছেন। (খান ২০০৩) এই নিবন্ধপাঠে অনেক বন্ধু লেখককে দরজার কাছ থেকে বিদায়ও জানিয়েছেন। সেই বন্ধুদের বন্ধ দরজায় করাঘাতের উপায়স্বরূপ আজ 'আবুল হাসানের অজ্ঞান' লেখা স্থির করলাম। যাঁরা আবুল হাসানের অনুরাগী এতে তাঁদের কত মুনাফা হবে জানি না, তবে আমরা যারা ফ্রয়েডের ভক্ত তাঁরা লাভবান হব বলেই আশা করি।

'অজ্ঞান' বলতে ফ্রয়েড কী বুঝিয়েছিলেন তা অনুমান করতে যাঁদের কষ্ট হয়, আবুল হাসানের 'আবুল হাসান' কবিতাটি পড়লে সেই কষ্ট খানিক লাঘব হবে—এটুকু ভরসা আমার আছে।

বাংলা সাহিত্যে, বঙ্কিমচন্দ্রের নকল করে বলা চলে, শোচনীয় ঘটনার অভাব নাই। মহান কবি শামসুর রাহমান লিখিত *আবুল হাসান রচনা সমগ্র* গ্রন্থের 'ভূমিকা' জিনিসটিও এই শোচনীয়ের তালিকায় উঠেছে। কবির জীবনী জানলেই কবিতার ভালমন্দ বোঝা যায়—এই সরল বিশ্বাস থেকে বাংলা সাহিত্য এখনো ছাড়া পায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন বাংলা গীতিকবিতার বাহুল্য ঘটেছে বাংলা মুলুকের খারাপ জলবায়ুর কারণে। (চট্টোপাধ্যায় ১৯৯৫: ২৫৬–৫৯)

শামসুর রাহমান মনে করেন আবুল হাসানের কবিতা এলোমেলো কারণ তাঁর জীবন এলোমেলো। (হাসান ১৯৯৪: ৭–৮) এক সময় হুমায়ুন কবিরও এমন সরল মতই প্রচার করেছিলেন। (কবির ১৯৭০) বলা বাহুল্য নয়, এই জাতীয় মতের লগে কার্ল মার্কসের মতের কোন মিল নাই। বঙ্কিমচন্দ্র সাক্ষী, এসব আবর্জনা আগুস্ত কোঁতের।

শামসুর রাহমান আরো বলেছেন: 'পৃথক পালঙ্ক' বইটির আগ পর্যন্ত আবুল হাসান পরিণত হয়ে ওঠেন নাই। আমরা নিবেদন করছি, কথাটি ঠিক নয়। *রাজা যায়*

রাজা আসে বইয়ের এক নম্বর কবিতা 'আবুল হাসান' আমাদের সাক্ষী। এই কবিতার সাহায্যে আমরা দেখাতে চাই প্রথম বই প্রকাশের সময়ই পরিণত কবি আবুল হাসান। আমাদের প্রকৃত মতলব অবশ্য সেখানে নয়।

আমাদের প্রস্তাব আগেই উল্লেখ করেছি, ফ্রয়েডের আবিষ্কৃত 'অজ্ঞান' কথাটির অর্থ নির্ণয়। এতে আবুল হাসানের কবিতা থেকে ভাল সাহায্য পাওয়া যায়। এখানেই আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকবে। ফাও হিসাবে, আবুল হাসান তরুণদের প্রিয় কেন—এই প্রশ্নেরও খানিক সুরাহা হবে। শামসুর রাহমানও আশা করি একদিন বুঝতে পারবেন আবুল হাসান তরুণদের প্রিয় নিতান্ত অসংলগ্ন এলোমেলো জীবনের কারণে নয়। তিনিই প্রিয় যিনি অজ্ঞান জ্ঞানে জ্ঞানী। আবুল হাসান কি তা-ই? আমরা দাবি করছি, প্রস্তাবটি অনেক দূর পর্যন্ত সনির্বন্ধ।

২

ফ্রয়েডের আগ পর্যন্ত লোকে 'অজ্ঞান' বলতে জ্ঞানের অভাব বুঝত। এখন আমরা 'অজ্ঞান' বলতে বুঝি এক ধরনের জ্ঞান। এই ধরনের জ্ঞানের নাম ধরুন অ-এর জ্ঞান। এখানে 'অ'-কে অভাবের ইঙ্গিত হিসাবে গ্রহণ করলে আরো ভাল হয়।

অ-এর জ্ঞানকে সংক্ষেপে অজ্ঞান বলা যায়। সজ্ঞানের মতন অজ্ঞানেরও বিধি আছে। ফ্রয়েডের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার জাক লাঁকা এই বিধি পুনরাবিষ্কার করেছেন। লাকাঁর ভাষায়, অজ্ঞান ভাষার বিধি অনুসারেই গড়া হয়। অজ্ঞান ও ভাষা এই দুই কথা প্রায় একই অর্থে বলা চলে। ভাষার গড়ন বুঝলে অজ্ঞানের গড়নও বোঝা হয়। অন্তত দাঁড়ায়। জাক লাকাঁর প্রস্তাব এই। ফ্রয়েডের দেওয়া একটি উদাহরণের সাহায্য নিয়ে আমরা বিষয়টি পরিষ্কারের চেষ্টা করব।

উনিশ শতকের শেষ দিকের কোন একদিন একজন অপরিচিত সঙ্গী সমভিব্যহারে তিনি ডালমাশিয়ার রাগুসা নামক স্থান থেকে হেরজেগোবিনার অজ্ঞাতনামা কোন এক স্থানে যাচ্ছিলেন। ইতালিতে কোথা থেকে কোথায় যাওয়া যায় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। আলোচনার এক পর্যায়ে সঙ্গী ভদ্রলোকটিকে ফ্রয়েড জিজ্ঞেস করেন তিনি কোনদিন অর্ভিয়েতো নামক জায়গায় গেছেন কি না আর সেখানে অমুকের আঁকা বিখ্যাত ফ্রেসকোগুলো দেখেছেন কি না। অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও ফ্রয়েড শিল্পীর নামটি স্মরণ করতে পারলেন না। পরে এক সময় সঠিক নামটি যখন অন্য কেউ উচ্চারণ করল তখন ফ্রয়েড ঠাহর করতে পারলেন শিল্পীর নাম সিনোরেল্লি (Signorelli)।

অর্ভিয়েতো শহরের ক্যাথিড্রালে আঁকা 'চার শেষ কথা'—মানে মৃত্যু, শেষ বিচার, দোজখ ও বেহেশত—নামক ফ্রেসকো চিত্রের রূপকারের নাম সিনোরেল্লি।

সেই নামটি কিছুতেই ফ্রয়েডের মনে পড়ছিল না। পরিবর্তে কেবল মনে আসছিল অন্য দুটি নাম—একটি বত্তিচেল্লি (Botticelli), আরেকটি বলত্রাফিও (Boltraffio)। ফ্রয়েড কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই জানেন শেষের নাম দুটি সঠিক নয়। ফ্রয়েড এই ঘটনার বিশ্লেষণ করেছেন। চুলচেরা বিচার বলে বাংলায় একটা কথা আছে। কথিত আছে, সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধও চুলচেরা বিচার পছন্দ করতেন না। আমাদের বিশ্বাস ফ্রয়েডের বিচারে স্বয়ং বুদ্ধও রাগ করবেন না।

সিনোরেল্লি সম্পর্কে ইতঃপূর্বে ফ্রয়েড বিশদ জানতেন না। শুধু জানা ছিল তিনি মিলান ঘরানার শিল্পী। তবে যেই দুটি নাম বারবার ফ্রয়েডের মনে আসছিল সেই বত্তিচেল্লি কিংবা বলত্রাফিওর চেয়ে প্রকৃত নামটি তাঁর বেশি জানা ছিল—এই কথাও বলা যাবে না। তবে কেন এমন হল? এই রকম ঘটনা হরহামেশা ঘটে। ঘটে সকলের অভিজ্ঞতায়। এখানে কী বিশেষ আছে?

ফ্রয়েড বিচারে বসলেন। দেখলেন যেই মুহূর্তে তিনি নামটি মনে আনতে পারছিলেন না, তার আগ মুহূর্তে তারা দুজন অন্য একটি বিষয় নিয়ে আলাপ করছিলেন। অর্ভিয়েতোর প্রসঙ্গ তোলার আগে তারা দুজন আলাপ করছিলেন বসনিয়া এবং হেরজেগোবিনায় যেই সব তুর্কি মুসলমান বসবাস করেন তাদের কিছু আচার ও সংস্কার নিয়ে। ফ্রয়েড শুনেছিলেন বসনিয়া হেরজেগোবিনার তুর্কি মুসলমানরা খুবই ভাগ্যবাদী এবং ডাক্তারের উপর তাদের অগাধ বিশ্বাস। ফ্রয়েডকে এই কথা বলেছিলেন তাঁর একজন চিকিৎসক বন্ধু। সেই কথা তিনি হেরজেগোবিনা পথের সঙ্গীকে শোনাচ্ছিলেন।

ফ্রয়েড শুনেছিলেন ডাক্তার যখন কোন রোগীকে জবাব দিয়ে দেন, তখন তারা বলেন: 'হের (সাহেব), আমরা আর কী বলব? ওকে যদি বাঁচানো যেত তো, আমরা বিশ্বাস করি, আপনি ওকে অবশ্যই বাঁচাতেন।' এই বাক্য কয়টার ভিতর—ফ্রয়েড খেয়াল করলেন—'বসনিয়া', 'হেরজেগোবিনা' এবং 'হের' এই তিনটি শব্দ ও পদ (নাম) হাজির। এই পদগুলোর সঙ্গে সিনোরেল্লি এবং বত্তিচেল্লি-বলত্রাফিও জুটির কি যেন একটা সমিতি আছে।

ফ্রয়েড অনুমান করেন বসনিয়ার তুর্কি জনগণের আচার বিষয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে তাঁর মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়। অথচ আলোচনা তারপরও গড়ায়। পরে ফ্রয়েডের মনে পড়ে তিনি আরো একটি ঘটনা নিয়ে আলাপ করতে চাইছিলেন। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপ অসমীচীন মনে হওয়ায় সেই প্রসঙ্গ চেপে যান। প্রথম প্রসঙ্গ অর্থাৎ মৃত্যুর কাছে হার মানার সঙ্গে দ্বিতীয় প্রসঙ্গটির সমিতি আছে। বসনিয়ার তুর্কি সমাজ—ফ্রয়েড শুনেছেন—কাম চরিতার্থ করার উপর অন্য কোন জীবনসত্য আছে বলে মানে না। ডাক্তার বন্ধু বলেছিলেন, বসনিয়ার মুসলমানরা বলে, 'হের, আপনে জানেন ঐটাই যদি ফুরায়ে গেল তো জীবনের আর কী বাকি থাকল?' কথাটি একজন অপরিচিতের সঙ্গে আলাপের উপযুক্ত কথা নয়।

শুদ্ধ কি তাই? মৃত্যুর সঙ্গে কামের সমিতি আছে। ফ্রয়েড দেখলেন সেই মুহূর্তে ওই সমিতিরও স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিলেন তিনি। ওই জায়গায় খুব সম্ভব আরো এক ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার নাম 'সরা'। ধরাকে সরা জ্ঞান করা বলতে যেই সরা বুঝি সেই সরার কথাই বলছি। এই সরা মানে যাহা সরে যায়।

কয়েক সপ্তাহ আগে ফ্রয়েড ত্রাফয় (Trafoi) নামক এক জায়গায় ছিলেন। সেখানকার এক খবর এখনো ফ্রয়েডের মনে জাগরুক। তাঁরই চিকিৎসাধীন এক রোগী সেখানে আত্মহত্যা করে। এই রোগীর রতিশক্তিতে ব্যাঘাত ঘটেছিল এবং সেই আঘাতের চিকিৎসা সফল হয় নাই। ফ্রয়েড বলেছেন, হেরজেগোবিনা যাত্রাপথে হয়তো এই ঘটনা এবং তার আশেপাশের সব কথা আমার সজ্ঞানে মনে পড়ে নাই, এ কথা আমি জানি। তবে 'বত্তিচেল্লি' আর 'বলত্রাফিও' নাম দুটির সমিতি (association) আছে বলেই হয়তো আমার অজ্ঞানে এই দুই নাম এক জায়গায় এসেছিল।

অতএব, তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, সিনোরেল্লি নাম ভুলে যাওয়া নিতান্ত দৈব নয়, মানবিক ঘটনা। তিনি ত্রাফয় নামটি মনে করতে চাইছিলেন না, অথচ স্মরণ করতে চেষ্টা করছিলেন সিনোরেল্লি নাম। ফ্রয়েডের মতে তাঁর সজ্ঞান ইচ্ছাটা পুরাপুরি সফল হয় নাই। একটা বিষয় দমন করার ইচ্ছা অন্য একটা বিষয় স্মরণ করার অক্ষমতা আকারে দেখা দিয়েছিল। যা দমন করতে চাই, তা স্মরণ করতে যদি অক্ষম হই তো বলা যেত বিষয়টি সহজ। কিন্তু ঘটনা এখানে ততটা সহজ ছিল না।

ফ্রয়েড দমন করতে চেয়েছিলেন কামের কথা। কামের সঙ্গে সমিতিবদ্ধ মৃত্যুর কথাও দমন করা তাই সঙ্গত তাঁর জন্য। বসনিয়া, হেরজেগোবিনা এবং ত্রাফয়— এই তিনটি নামের সাথে কাম ও মৃত্যুর কথা জড়িত। তিনি স্মরণ করতে চাইছিলেন শিল্পীর নাম সিনোরেল্লি। এই নাম বদলে তাঁর মনে উদিত হল অন্য দুই নাম, বত্তিচেল্লি ও বলত্রাফিও। কিভাবে ঘটল? সিনোরেল্লি নামের দুই ভাগের এক ভাগ এল্লি (*elli*) অন্য দুই নামের এক নামেও আছে। অন্যভাগ সিনোর (*signor*) এর জার্মান ভাষার অনুবাদ করলে হয় হের (*Herr*)। ফলে যেই নাম মন দমন করেছে সেই হেরজেগোবিনার অংশ হিসাবে তিনি 'সিনোর' অংশটি ভুলে গেছেন।

'সিনোরেল্লি' নামের জায়গায় কী করে 'বত্তিচেল্লি' বা 'বলত্রাফিও' নাম দুটি ভেসে এল তার রহস্য সজ্ঞানে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভাষায় পাওয়া যায়। এই ভাষার গড়নই কি অজ্ঞানের গড়ন? ফ্রয়েড দেখাচ্ছেন কাম ও মৃত্যু দমনের সঙ্গে কিন্তু ত্রাফয় দমন হল না। এই দমন না হওয়ার ফল বলত্রাফিওর শেষাংশ। সিনোর শব্দের তর্জমা 'হের' দমিত হয়েছে কিন্তু হেরজেগোবিনার সঙ্গে যুক্ত বসনিয়ার 'ব' অংশটি মনে থেকে গেছে। সেটাই বত্তিচেল্লি ও বলত্রাফিওর প্রথম অংশ রূপে হাজির হয়েছে। শব্দাংশের সঙ্গে শব্দাংশের (বা প্রকৃত প্রস্তাবে অক্ষরের) এই সমিতি দিয়ে ফ্রয়েড নিজেকে বুঝ দিলেন কেন সিনোরেল্লি নামটি তাঁর যথাসময়ে মনে পড়ে নাই। এই ঘটনার নীতিসার কী? আমরা সজ্ঞানে যা দমন করতে চাই, তাও পুরাপুরি স্মরণ

করতে পারি না। আমাদের স্মরণে অক্ষমতাও এক ধরনের সক্ষমতা বা এক জাতীয় সাফল্যই। এই 'ব্যর্থ সফলতা' বা এই 'অক্ষম সক্ষমতা'রই অপর নাম অজ্ঞানের সফলতা বা সক্ষমতা। অজ্ঞান আছে। তবে আছে অক্ষমতা বা ব্যর্থতা আকারে। (ফ্রয়েড ১৯৬৫: ১-৭)

ফ্রয়েডের এই আবিষ্কার অনুসারে জাক লাকাঁ আরো দেখিয়েছেন অজ্ঞানের থাকা না থাকা আমার বা আপনার চাওয়া না চাওয়ার ব্যাপার নয়। তবে অজ্ঞানের প্রকাশ এই থাকা না থাকার উপর নির্ভর করে। অজ্ঞানের প্রমাণ তার প্রকাশে। প্রকাশ মানে পদ। পদই পদার্থ তৈরি করেন। অজ্ঞান দেখা দেন।

৩

জাক লাকাঁ দেখিয়েছেন, কোন প্রকার অভিজ্ঞতার আগেই—আমি বা আপনি ব্যক্তি হয়ে ওঠার আগেই—আমরা ভাষার অধীন। কোন প্রকার মানব-সম্পর্কের আগেই কতক কতক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত। যেমন দিন ও রাত্রি, সকাল ও বিকাল, চাঁদ ও তারা, আকাশ ও পৃথিবী। এদের বৈপরীত্য বা পার্থক্য দেখে জীব অনুমান করে এরা আলাদা। এটাই প্রথম পদ।

লাকাঁ দেখেন: প্রকৃতি পদ যোগায়, এই পদগুলি মানব সম্পর্ক গড়ে নেয় শূন্য থেকে সম্ভব করার মাধ্যমে, সম্পর্কের রূপ ও আকৃতি পদ থেকেই আসে। (লাকাঁ ১৯৯৮: ২০)

লাকাঁ বলেন, যেই জীব চিন্তা করে, যেই জীব জানে সে এই সকলের বা এই পরমের অংশ মাত্র, তার জন্মের আগেই তার শুমারি হয়ে গেছে। যে শুমার করতে এসেছে সেও বেশুমার নয়, তারও শুমারি হয়ে আছে। সেখানে এই যে জীবশুমারি তার নামই অজ্ঞান। বিশদ করার দরকার আছে কথাটার।

কোন এক বামন বলে—আমরা তিন ভাই: পল, এর্নেস্ত ও আমি। যে বলছে সেও এই হিসাবের ভিতরে আছে। কিন্তু যে বলছে সে কে? আমি যে শুনছি সে একজন। কিন্তু পল ও এর্নেস্তের সঙ্গে যেই আমি গুনিত (শুমার) হচ্ছে সে অন্যজন—এই বোধ প্রথমে আসে না। আসে খানিক পরে। আমাদের যুগে—ভাষা বিশ্লেষণ খানিকটা এগুনোর পর—দেখা গেল আমি যে একই সঙ্গে গণক এবং গণিত এই সত্যের সঙ্গে অজ্ঞানের সমিতি আছে। 'আমি' পদের সঙ্গে 'আমি' পদার্থের যে একটা ফারাক আছে, গণনাকার 'আমি' ও আমার গণিত অপর দুই ভাইয়ের মতন তিন নম্বর ভাই 'আমি' যে আলাদা সেটা আমরা ভাষার গুণেই টের পাই। এই কালের ভাষাবিজ্ঞান সেই জ্ঞান আমাদের দিয়েছে।

ফ্রয়েডের সিনোরেল্লি কাহিনীর চেয়েও এক কাঠি গভীর এই আমি ও আমি-শুমারির গল্প। অজ্ঞানের এই উদাহরণ থেকে এক নতুন খবর আমরা পাই। সেই খবর অনুসারে যেই জীব চিন্তাশীল বা বাকশক্তিসম্পন্ন সেই জীব দ্বিধাবিভক্ত। ভাষা এই দ্বিধাবিভক্তির সাক্ষী।

আমি পদ না হলে আমি পদার্থ কিনা জানা যায় না। কিন্তু আমি পদেও আমি পদার্থ পুরাপুরি নাই। আমরা বলছি না যে আমি পদটি অপ্রকৃত বা অবাস্তব কিছু। শুদ্ধ বলছি আমি পদ আমি পদার্থের সবকিছুকে প্রকৃতিস্থ করে নাই বা বাস্তবায়িত করে নাই। এর ভিতর কিছু একটা ভূমিষ্ঠ হয় নাই। এই অভূমিষ্ঠ বস্তুর নামই অজ্ঞান। দমনকার ও উৎপীড়ক কিছু একটা যে এই এলাকায় ফেলে দেয় তাতে বিস্ময়ের কী আছে? লাকাঁ বলেন: গর্ভপাতকারীর সঙ্গে ভ্রূণঢাকা বস্তার যেই সম্পর্ক তাকেই দমন বলে। (লাকাঁ ১৯৯৮: ২৩)

ফ্রয়েড অজ্ঞান প্রথম আবিষ্কার করেন এই দমনের মধ্যেই। আরো সঠিকভাবে বলা যায়, করেন দমনে ব্যর্থতার মধ্যে। যে জন্মাতে চেয়েছিল, সে অজাত থেকে গেছে—এটা তো ব্যর্থতাই। এই ব্যর্থতারই প্রকাশ স্বপ্নে, মুদ্রাদোষে, মুখ ফসকানো কথায়, হাসি তামাশায়। এখানেই ফ্রয়েড প্রথম অজ্ঞান খুঁজে পান। জাক লাকাঁ মন্তব্য করেন অজ্ঞান খুব সাধারণ, ভালবাসা অসাধারণ জিনিস। ভালবাসা বিস্ময়কর নয়, সেই অর্থে সাধারণ, কিন্তু অজ্ঞান বিস্ময়কর, সেই অর্থে অসাধারণ। তবে ভালবাসার পাত্রপাত্রী যেই রকম অনন্য, একক বা আহাদ, অজ্ঞানের কুশীলব তেমন নয়, তারা নিত্য ও সাধারণ। অজ্ঞান বারবার পাই আর বারবার হারাই। ভালবাসা একবার পাই তো কোনদিন হারাই না।

অজ্ঞানের প্রথম জ্ঞান ভাষার মধ্যে। ভাষাই খবর দিচ্ছে, ভাষার বান্দা বা পরমের জীব (subject) দুই খণ্ড হয়ে আছে: এক খণ্ডের নাম পদ (signifier), আর খণ্ডের নাম পদার্থ (signified)। এখানে পদের জন্ম এবং পদার্থের জন্ম যুগপৎ।

পদ বিনা পদার্থ নাই। আবার পদার্থেরও কী একটা যেন পদের মধ্যে নাই—প্রকৃতিস্থ (বা বাস্তবায়িত বা জাত) নাই। যা নাই তারই নাম অভাব। এই অ-এর ভাবই বাসনা। যেই জিনিসটা হারিয়ে যায় তা অর্ভিয়েতোর গির্জাঘরের শিল্পীর নাম হারিয়ে যাওয়ার মতন নয় কি?

যা হারিয়ে যায় তা কী? জাক লাকাঁ বলেন: সিনোরেল্লি নামের যেই অংশ হারিয়ে গিয়েছিল তার অর্থ 'সিনোর', 'হের' অর্থে প্রভু বা পরম। এই মৃত্যুচিহ্নিত পৃথিবীতে পরমের অপর নাম মৃত্যু। ফ্রয়েড সেই দিন হের্জেগোভিনার পথে হের অর্থাৎ মৃত্যুকেই ভুলে বসেছিলেন। কিন্তু মৃত্যু তো হারায় না। সিনোরেল্লিও ফিরে আসে। লাকাঁ বলেন, 'এর মধ্যে কি আমরা দেখছি না সেই জিনিসের জন্ম হচ্ছে যা ফ্রয়েডকে মৃতের পুরাণে নিজেরই বাসনার বিধি আবিষ্কার করতে বাধ্য করেছে?' (লাকাঁ ১৯৯৮: ২৭)

নিৎশে বলেছিলেন, প্রভু এন্তেকাল করেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এই ঘোষণাও একই কারণে, বাসনার বিধি আবিষ্কারের প্রয়োজনে। লাকাঁর মতানুসারে, নিৎশে শুদ্ধ যতনার (castration) বিরুদ্ধে আশ্রয়লাভের জন্যই প্রভুর গুফাত পুরাণ লিখেছিলেন। প্রভু মৃত নন, তিনি অজ্ঞান মাত্র। ফ্রয়েডের যজমান যেই কারণে আত্মহত্যা করেছিলেন, নিৎশেও অনেকটা সেই কারণেই প্রভু-হত্যা করেছিলেন।

শেষ কথা, যেখানেই জীব দ্বিখণ্ডিত, পদ ও পদার্থের যেই মাঝখানটিতে ফোকর সেখানেই অজ্ঞানের আবির্ভাব। এই অজ্ঞানকেই ফ্রয়েড বাসনার বাসভূমি মনে করেন। অজ্ঞান, বাসনা ও বান্দা (বা জীব) একই ঘটনার তিন কোণ মত। এই বাসনাই আমরা দেখতে পাই আর এক জায়গায় গিয়ে হাজির হয়। বিস্মৃত সিনোর বা হের পরিস্মৃত হয় বসনিয়া বা বত্তিচেল্লি বা বলত্রাফিওর ব আকারে। অজ্ঞানের এই বিধিরই নাম নামান্তর বা মেটোনিমি (metonymy)।

বান্দা হতবাক এই ঘটনার আশ্চর্য প্রকাশে। জীবনের শেষ নাগাদ ফ্রয়েড স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন: নারী কী চায়? নারীর বাসনা কী?—এই প্রশ্নের সদুত্তর তাঁর কোনদিনই জানা হয় নাই। ফ্রয়েড প্রকৃত প্রস্তাবে স্ত্রৈণ (axorius) প্রকৃতির মানুষ ছিলেন—এ কথা জানিয়েছেন তাঁর বিজ্ঞ জীবনচরিতকার মহাশয় এর্নেস্ট জোনস। এর মূলও আছে পরম বা পিতার সঙ্গে ফ্রয়েডের সম্পর্কের অন্দরে।

৪

'আবুল হাসান' পদ ও 'আবুল হাসান' পদার্থেও ভেদ আছে। 'আবুল হাসান' কবিতা 'আবুল হাসান' সম্পর্কে লিখছেন আবুল হাসান। তমার বলাচ্ছেন আবুল হাসান, তমারিও হচ্ছে আবুল হাসানের। এই পদ—এই নাম—কোন পদার্থের? আমরা প্রথমে দেখি একটার পর একটা রূপক, রূপকের পর রূপক। একটা রূপকের পর আর একটা রূপক আসছে স্রোতের মতন। এই প্রক্রিয়ার নাম নামান্তর। এই নামান্তর বাসনারই বিধি।

> সে এক পাথর আছে কেবলি লাবণ্য ধরে, উজ্জ্বলতা ধরে আর্দ্র, মায়াবী করুণ
> এটা সেই পাথরের নাম নাকি? এটা তাই?
> এটা কি পাথর নাকি কোনো নদী? উপগ্রহ? কোনো রাজা?
> পৃথিবীর তিনভাগ জলের সমান কারো কান্না ভেজা চোখ?
> মহাকাশে ছড়ানো ছয়টি তারা? তীব্র তীক্ষ্ণ তমোহর
> কী অর্থ বহন করে এই সব মিলিত অক্ষর?
>
> (হাসান ১৯৯৪: ১৯)

এই নাম বা পদের মধ্যে বাসনা প্রকাশিত কিন্তু প্রকৃতিস্থ নয়। এর মধ্যে সিনোর, হের, প্রভু, পরম বা পিতা হারিয়ে গেছেন। পিতা অজ্ঞান, মোটেও মৃদী নন তিনি। জীবের অজ্ঞান পরম। আবুল হাসান ফ্রয়েড বা লাকাঁ পড়েছেন কি না সেই প্রশ্ন অজ্ঞানের নয়। অজ্ঞানের জীব আবুল হাসান অবলীলায় লিখেছেন নাম-রহস্য কী বিজ্ঞান!

> আমি বহুদিন একা একা প্রশ্ন করে দেখেছি নিজেকে,
> যারা খুব হৃদয়ের কাছাকাছি থাকে, যারা এঘরে ওঘরে যায়
> সময়ের সাহসী সন্তান যারা সভ্যতার সুন্দর প্রহরী
> তারা কেউ কেউ বলেছে আমাকে—
> এটা তোর জন্মদাতা জনকের জীবনের রুগ্ন রূপান্তর,
> একটি নামের মধ্যে নিজেরি বিস্তার ধরে রাখা,
> তুই যার অনিচ্ছুক দাস!
>
> (হাসান ১৯৯৪: ১৯)

আমরা কখনো জীব, কখনো বান্দা বলে যেই ভাব প্রকাশ করছি—ইংরেজি ভাষা যাকে 'সাবজেক্ট' বলতে রাজি—তা-ই কি পদ আবুল হাসানের 'অনিচ্ছুক দাস' নয়? 'আবুল হাসান' এরই অনিচ্ছুক দাস। পদার্থ পদের দাস। এই সত্য অজ্ঞানের বিধি থেকে জন্ম নেয়। কিন্তু এই নাম 'জন্মদাতা জনকের জীবনের রুগ্ন রূপান্তর' কেন? জন্মদাতা কে এই নামের? ভাষাই জনক। ভাষার জীবন কী? তার রূপান্তর অর্থ ইংরেজিতে যাকে বলে মেটাফর (metaphor) তাই নয় কি? এই রূপান্তর রুগ্ন কেন?

নিৎশে যখন প্রভুর এন্তেকাল বার্তা ঘোষণা করেন, ফ্রয়েড যখন সিনোরেল্লির এন্তেমালে ব্যর্থ হন, তখন তারা রুগ্ন রূপান্তর বা ক্যাসট্রেশনের (castration) বিরুদ্ধে বর্ম পরিধান করেছেন মাত্র। কিন্তু তাঁরাও জানেন না, পিতা অমৃত—কথার অর্থ 'পিতা মারা যান নাই' করা যাবে না, করতে হবে 'পিতা'। অ-এর মৃত, সংক্ষেপে অজ্ঞান মাত্র। আবুল হাসান ব্যাপারটা আমল করেছেন। 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' তারই সত্য স্বরূপ।

অজ্ঞানকে শেষ পর্যন্ত বোঝাপড়া করতে হয় প্রকৃতির সাথে। তাকেও হতে হয় প্রকৃতিস্থ। এইখানে প্রকৃতি অর্থে ইংরেজি রিয়েল (real) বুঝতে হবে, নেচার (nature) বা স্বভাব নয়। অজ্ঞান প্রকৃতির দরজায় টোকা দিয়ে জন্ম নেয়। দরজা কথাটা ফকির লালন শাহ যেই অর্থে ব্যবহার করেছেন আমরাও হুবহু সেই অর্থেই জারি রাখছি। এই দরজার তর্জমা ইংরেজিতে ড্রাইভ (drive), জর্মানে ট্রিয়েব (*Trieb*) এবং ফরাসিতে পুলসিওঁ (*pulsion*)। পদ ও পদার্থে, জীব ও পরমে, আমি ও তুমিতে ফাঁক আছে। তেমনি ফাঁক আছে কায়ায়—চোখে, ঠোঁটে, কানে, নাভিতে, পায়ুতে—এই ক্রমে নয়খানে। অজ্ঞান দরজাময়—এই দরজাময়তাকেই বাংলায় বলে কাম। আজকাল ইতরজন এর বিশেষ নাম যৌনতা দিয়ে এর মর্ম শেষ করেছে।

'যুবতীর বাম হাতে পাঁচটি আঙুল' কামমায়। এই আঙুলও বাসনার দরজা। দরজা অর্থ নিছক ইন্দ্রিয় নয়। দরজা সব সময়ই ভাষাবাহিত। এখানে পদের কথা উঠেছে। ইন্দ্রিয় যখন পদ হয়, তখনই তা দরজা। পদ নয় এমন পদার্থ নাই—তাই তা দরজা নয়।

অজ্ঞানের দরজাকে জাক লাকা গ্রিক পুরাণে বর্ণিত অর্ফিয়ুস কর্তৃক ইউরিদিকে হারানোর ঘটনার তুলনা করেছেন। ফিরে তাকালেই সে নাই। অজ্ঞানকে জানা মাত্রই সে হারায়। আবুল হাসানের শেষ অনুচ্ছেদ এই সত্যেরই সাক্ষী।

> হয়তো যুদ্ধের নাম, জ্যোৎস্নায় দুরন্ত চাঁদে ছুঁয়ে যাওয়া,
> নীল দীর্ঘশ্বাস কোনো মানুষের!
> সত্যিই কি মানুষের?
>
> তবে কি সে মানুষের সাথে সম্পর্কিত ছিল, কোনোদিন
> ভালবেসেছিল সেও যুবতীর বামহাতে পাঁচটি আঙুল?
> ভালবেসেছিলো ফুল, মোমবাতি, শিরস্ত্রাণ, আলোর ইশকুল?
> (হাসান ১৯৯৪: ১৯)

মানুষের নাম সত্যি মানুষের কীর্তি কি না এই প্রশ্ন অত্যন্ত নগদ, মোটেও বকেয়া বা বাকি নয়। প্রকৃতিই পদ সরবরাহ করে, মানুষ তৈরি করে তার পদার্থ। কিন্তু মানুষ কোন পদার্থের নাম? ফুল, মোমবাতি, শিরস্ত্রাণ, আলোর ইশকুল এগুলো কী? এগুলো পদ না পদার্থ? তা হলে পদের হাত থেকে পরিত্রাণ কোথায়? পরিত্রাণ বাসনার বিধিতে। ফুল থেকে মোমবাতিতে, শিরস্ত্রাণ থেকে আলোর ইশকুলে। জাক লাকাঁ কহেন: বান্দার কথা এক পদ বলে অন্য পদকে, অন্য বান্দাকে না। (লাকাঁ ১৯৯৮: ২৪৭)

মিলিত অক্ষর শুদ্ধ বহন মাত্র করে না অর্থ সৃষ্টিও করে। অতএব দাঁড়াল কী? দাঁড়াল এই। পদ থেকে পদান্তরে অভিসার ছাড়া বান্দার ত্রাণ নাই। এই সত্যে সন্দিহান যাঁরা তাঁরাই সিদ্ধার্থ গৌতমের নামে প্রচার করেছেন, বাসনার নাম নির্বাণ। আমরা এর অর্থ করি অন্য। পরমের বাসনা অনির্বাণ। বাসনা অমর, অ-এর মরা, অজ্ঞানের শহীদ। শুদ্ধ নামেই তার মুক্তি। একমাত্র নামের, পদের বা ভাষার দোহাইতেই জীব পরমের অংশ। আবুল হাসানের শেষপ্রশ্নের উত্তর এখানেই মেলে: মানুষের সঙ্গে সে নিশ্চয়ই সম্পর্কিত ছিল একদিন। ইহুদি পুরাণে আছে: আল্লাহ হযরত আদমকে প্রথমে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন। এই শিক্ষা তিনি ফেরেশতাদের দেন নাই।

নাম থাকা ভাল। কিন্তু নামে যারা খুব ভাল তাদের দশা ফ্রয়েডের মতন হয়। তারা স্ত্রৈণ, কিন্তু স্ত্রী কী ভাব তা তারা জানেন না। আবুল হাসানের অজ্ঞানেও তার ইঙ্গিত আছে। অজ্ঞানের মার—শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে হবে—শেষ রাতে।

সেই আলোচনা আজ নয়। আমার মোমবাতিও ফুরিয়ে এসেছে।

দোহাই

১. হুমায়ুন কবির, *বাঙলার কাব্য*, আহমদ ছফা সম্পাদিত (ঢাকা, ১৯৭০)।
২. সলিমুল্লাহ খান, 'কাজী নজরুলের অজ্ঞান', *যুগান্তর* (ঢাকা, ২৯ আগস্ট ২০০৩)।
৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *নির্বাচিত রচনা*, ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত (নতুন দিল্লি, ১৯৯৫)।
৪. রামমোহন রায়, *রামমোহন গ্রন্থাবলী*, ১ম–৭ম খণ্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত (কলকাতা, ১৩৮০)।
৫. আবুল হাসান, *আবুল হাসান রচনা সমগ্র* (ঢাকা, ১৯৯৪)।
৬. Sigmund Freud, *The Psychopathology of Everyday Life*, A. Tyson, trans. (New York, 1965).
৭. Jacques Lacan, *The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis: The Seminar of Jacques Lacan, Book XI*, A. Sheridan, trans. (New York, 1998).

....

উৎস
যুগান্তর ঃ ঢাকা ২০০২
কবি আবুল হাসান: মূল্যায়ন ঃ ঢাকা, ২০০৬

১৮

গোলাম সাবদার সিদ্দিকির রাজনীতি

আবদুল মান্নান সৈয়দের সঙ্গে বিচার

তোমার আমার এইটা গদামায়
জেনেছি সে কথা কারো গল্পো নয়।
—গোলাম সাবদার সিদ্দিকি

সাবদার সিদ্দিকি কবি জীবনের পয়লা কয়েক বছর 'গোলাম সাবদার সিদ্দিকি' নামে লিখতেন। এই তথ্য জানিয়েছেন তাঁর একমাত্র এবং মরণোত্তর কবিতা সংগ্রহের সম্পাদক আবদুল মান্নান সৈয়দ। (সৈয়দ ১৯৯৭: ৯)

ছাপ্পান্নটি ছোট বড় পদ্যের এই সঙ্কলনে কবিতাগুলির রচনা কি প্রকাশকাল নির্দেশের কোন চেষ্টার প্রমাণ নাই। ফলে সাবদারের প্রায় ৩০ বৎসরের কাব্য সাধনার বিকাশ বোঝা দুঃখেও সম্ভব হয় না। মহাত্মা আবদুল মান্নানের মতে 'সাবদার সিদ্দিকি' নামের 'গোলাম' অংশটি 'স্বাধীনতার পরে, এক সময়' ছেঁটে ফেলে দেন। কত পরে না জেনে এর কারণ নির্ণয় সম্ভব হয় না।

লেখক-সাধারণ নানা অছিলায় নাম বদলান। আবদুল মান্নান সৈয়দ আরেঠারে যা বলতে চেয়েছেন তার মর্ম আমরা এভাবে গ্রহণ করি। ১৯৭১ সালের যুদ্ধ সাবদার সিদ্দিকি ও তাঁর কবিতাকে যেই রকম ভিতর থেকে বদলে দিয়েছিল, তাঁর নামকেও খুব সম্ভব তেমনি দেয়। (সৈয়দ ১৯৯৭: ১১)

গোলাম ছাঁটা মানে গোলামি ছাঁটা—এমন ইঙ্গিতই কি মান্নান করছেন? সিদ্দিকির জীবনী পড়ে তিনি ওঁর নিঃসঙ্গতার উপর গুরুত্বারোপের কোশেশ করেছেন: 'সমস্তের ভেতরে একটি গহন একাকীত্ব দখল করছিলো তাঁকে।' (সৈয়দ ১৯৯৭: ১১)

সিদ্দিকির সংগৃহীত কবিতা পড়ে আমাদের মনে হয়েছে ওঁর মেজাজে ব্যক্তিগত একাকীত্বের অভিযোগ আশ্চর্য বিরল। সহজ কথায় যাকে বলে দেশ ও দশের

ভাবনা—চলতি অর্থে যাকে রাজনীতি ও সমাজচিন্তাও বলা যায়—তার উপস্থিতি প্রবল ওঁর কবিতায়। বস্তুতপক্ষে সাবদার সিদ্দিকির কবিতায় মোটেও নৈরাশ্য নাই, মধ্যম শ্রেণীর দুঃখের ফিরিস্তি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, বিলাপ-মাতম একেবারে নাই বললেও চলে।

১

সাহিত্য জীবনের অভিব্যক্তি। সুতরাং লেখকের জীবনীর মধ্যেই লেখার যাবতীয় অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় আঠার শতকের শেষ ভাগ থেকে এয়ুরোপ মহাদেশে এই মতবাদের বিকাশ হতে শুরু করে। মহাত্মা গ্যেটে প্রমুখ লেখকের হাতে এই সংস্কার প্রায় সত্যের মর্যাদায় উন্নীত হয়। নানাবিধ সমালোচনা সত্ত্বেও এই মতবাদ আজো অমৃত। আবদুল মান্নান সৈয়দের লেখাতেও এর খানিক উত্তরাধিকার দেখা যাচ্ছে। মান্নান লিখেছেন:

> কলকাতার কফি হাউজ, ঢাকার আড্ডা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ—সমস্তের মধ্যেই সাবদার সিদ্দিকি ব্যক্তিগতকে প্রবেশ করিয়েছিলেন একটি গহন ছুরির মতো। সেখানে '৫০-এর যে-কলকাতা তাঁকে জন্ম দিয়েছিলো সেই কলকাতার হাওড়া ব্রিজকে তাঁর মনে হয়েছিলো 'লোহার ব্রেসিয়ার', কলকাতাকে মনে হয়েছিলো 'সন্ন্যাসীর লিঙ্গের মতো নিস্পৃহ, উদাসীন, নিরাসক্ত।' (সৈয়দ ১৯৯৭: ১৬)

মান্নানের মনে কিন্তু প্রশ্নও জাগেনি: ব্যক্তি কী বস্তু? নিটোল, অখণ্ড, সমস্যাহীন ব্যক্তি একটি ছুরির মতন কিছু কি? যেই ব্যক্তি নিজেকে ব্যক্ত বা প্রকাশ করে সে কিভাবে তৈরি হয়? ব্যক্তির মধ্য দিয়ে আর কেউ, অন্য কিছু ব্যক্ত হচ্ছে কি না এই সন্দেহ মান্নান সৈয়দের দিগন্তেও নাই।

মহাত্মা গোটে ওঁর আত্মজীবনী—কবিতা ও সত্য—শুরু করেছেন জন্ম মুহূর্তের তিথি-নক্ষত্রাদির জ্যোতিষশাস্ত্রীয় অবস্থানের বর্ণনা দিয়ে। গোটের মতন বৈজ্ঞানিক মেজাজের কবি—যিনি নিউটনের আলোকবিদ্যার মৌলিক বিচার করার যোগ্য—জ্যোতিষীর পেশা নিয়ে ঠাট্টা করার জন্য তা করেছেন ভাবলে ঠিক হবে না। (ন্যাগেলে ১৯৮৭: ২৬)

ব্যক্তির নিখিল অটুট জীবনই তার সৃষ্টির ভাঁড়ার বলে মনে করি আমরা। কিন্তু নিজের জন্ম ও মৃত্যুর কাহিনী জানার সুযোগ কোন লেখকেরই যতদূর জানি আজ পর্যন্ত হয়নি। গোটেও ব্যতিক্রম নন। নিজের জন্মকথা অপরের মুখে শুনেই সবাই লেখেন। গোটেও বলেছেন—তিনি শুনেছেন বন্ধু বেটিনার মুখে। আর বেটিনা শুনেছেন গোটের মার মুখে। তিনিও বড় প্রতিভাশালী গল্প-বলিয়ে ছিলেন।

তিথি-নক্ষত্রের অবস্থানের মতন শিশুর জন্ম থেকে স্মৃতির বয়সে পৌঁছা অব্দি ব্যক্তির ইতিহাস—সঙ্গত কারণেই—আমরা মধ্যস্থ অপরাপর ব্যক্তি ও কাহিনীর মধ্যবর্তিতায় জানতে পাই। একইভাবে আমরা যখন ৫০ কি ৬০ বছর বয়সে ছেলেবেলা লিখি তখনো আমরা অপরের গল্প বলতে থাকি। 'আমি' শব্দে যার কথা বলা হচ্ছে সে হয়তো অন্য কেউ। 'ব্যক্তি' হয়তো 'আমি'তে নয় 'তুমি' ও 'সে'তে নিজেকে অধিক ব্যক্ত করছে। যেই লোক ভারি আহ্লাদে সারাক্ষণ আমি আমি করে বেড়াচ্ছে—নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতার অতগুলি 'আমি'র কথা মনে করুন—সে-ই হয়তো অন্য 'আমি'র ছবি বয়ে বেড়াচ্ছে।

ব্যক্তি-জীবনের শুরুর পর্বটা যেমন ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকে না তেমনি বয়োপ্রাপ্ত পর্বও ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে যায়, যদিও আমিত্বের দর্পে সে তা টের পায় না আদৌ। আসলে ব্যক্তি এক নয়, দুজনে বিভক্ত। একজনকে বলা যাক ব্যক্তি—ইংরেজি 'সাবজেক্ট' (subject) শব্দ এর অনুবাদ বটে। অন্যকে বলা যাক 'আমি'—গ্রিক 'ইগো' (ego) সংস্কৃত 'অহম্' শব্দের তর্জমা।

ফরাসি মনীষী জাক লাকাঁ ফ্রয়েডের পথ ধরে ব্যক্তির জগতকে বলেছেন সিম্বলিক অর্ডার (symbolic order)। বাংলায় বলা যাক নিশানার জগৎ। অপর দিকে 'আমি'র জগৎ, লাকাঁর মতে, ইমাজিনারি অর্ডার (imaginary order) বা ছায়ার জগৎ। ছায়ার জগৎ থেকে নিশানার জগতে শিশুর উত্তরণ ঘটে ভাষার মাধ্যমে। তাই ভাষা নিশানা জগতের উত্তম উদাহরণ। ভাষাই ব্যক্তি তৈরি করে। শুদ্ধ মানুষ হওয়ার কালে নয়, শিশুর সারা জীবনমানই এই গঠন চলতে থাকে। মানুষের মানুষ হওয়ার শেষ নাই।

জাক লাকাঁর এই আবিষ্কার দেকার্তের 'আমি ভাবি, তাই আমি' প্রস্তাবের পায়ের তলার মাটি তুলে ফেলেছে। লাকাঁর মতে, আমি 'আমি' নই, আমি অন্য। সেয়ানা অবস্থায় আমি যেই বাক্যরাশি অনর্গল উৎপাদন করে চলেছি আমাকে তাতে পাওয়া যায় না, আমার ব্যক্তিকে পাওয়া যায় অন্যের ভিতর। অন্যের কাহিনীরই অপর নাম 'আনকনসাস' (unconsious) বা অচেতন।

ফকির লালন যাকে বলেন 'অচিনদেশ' তার সাথে এর তুলনা চলে। মান্নান সৈয়দ সাবদার সিদ্দিকির ব্যক্তিগত ছুরি বলে যাকে সনাক্ত করেছেন তা লাকাঁ-কথিত ছায়ার জগৎ মাত্র। এই জগৎ অলীক জগৎ। মান্নান এই ছায়া-ছুরি ঢুকিয়ে দিয়েছেন নিশানার ভিতর। এখানে দেখা দরকার ছায়ার ভিতর নিশানা কিভাবে ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ল।

নামের মহিমা এখানে প্রাসঙ্গিক। ব্যক্তিগতের বন্দনা করতে গিয়ে মান্নান সৈয়দ খাপছাড়াভাবে দুইটা ইঙ্গিতও দিয়েছেন যাতে দেখা যায় ব্যক্তির গড়নে কিভাবে নিশানা ঢুকে পড়ে। সাবদার সিদ্দিকির কবিতায় সমকালীন জিনিসপত্র আর ক্যালিগ্রাফি দেখে মান্নান সৈয়দ ফরাসি কবি গিয়োমে আপোলিনেয়ারের কথা তুলেছেন। অন্যদিকে সাধারণভাবে ষাটের দশকের 'সময় স্বভাব' সিদ্দিকিকেও স্পর্শ

করেছিল বলে কবুল করেছেন তিনি। মান্নান বলেছেন: সাবদার সিদ্দিকি নামের 'গোলাম' অংশটি বর্জন করেন। নাম ছোট করাই যদি উদ্দেশ্য তো বর্জোর তালিকায় 'সিদ্দিকি'ও সমান প্রার্থী। তা হয় নাই। এই তুচ্ছ তথ্যের মধ্যেও আছে এক মহান কাহিনী।

বিখ্যাত হুমায়ূন আহমেদের গোড়ার দিকের এক গল্পে কথিত আছে—'কয় জেনারেশন ধনী থাকলে মানুষের চামড়া এমন মসৃণ হয়!' বাঙালি মুসলমান সমাজে বাবা-মার জেনারেশনে আমার নাম যেভাবে রাখা হয়েছে, আমি ঢাকা আসতে আসতে সেই নাম সেকেলে ঠেকে। এই দ্রুত অপসৃয়মান জগতের কাছে পাওয়া নাম নতুন জীবনের জন্য আর মানানসই থাকছে না। নাগরি হরফে বাঙালি মুসলমানের আরবি-ফারসি নাম বানানের সর্বজনগ্রাহ্য নিয়ম এখনো নাই।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রামমোহন রায়ের ব্যাকরণের বানান অনুসারে আহমদ ছফা এখনো নিজ নাম লিখছেন। বাংলায় আরবি 'সিন' অক্ষরটি এখনো 'স' এবং 'ছ' দুই হরফেই লিপান্তরিত হয়। রামমোহন 'ছ' ব্যবহারই বেহতর মনে করতেন। (রায় ১৯৭৩: ৩৭০) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়সহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'স' প্রবর্তনের পক্ষপাতী।

কিন্তু 'শামসুর রাহমান' সহোদর ভাইদের শেষ নাম 'রহমান' থেকে নিজেকে আকারযোগে আলাদা করে হলেন 'রাহমান'। এই তো বাঙালি মুসলমানের সমাজ ইতিহাস। আরবি ব্যাকরণ বাংলায় চলে না, তাই লেখকের নাম মাহমুদুজ্জামান হয় 'মাহমুদ আল জামান', একই নিয়মে বা অনিয়মে সলিমুদ্দিন হয় 'সেলিম আল দীন'। জসীমউদ্‌দীনের 'ম' এবং 'উ' আলাদা লেখার পর হয়তো একদিন 'জসীম আল দীন' লেখাও সম্ভব হবে।

মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান এক সময় 'সুমন সরকার' নামে লিখতেন। পরে তিনি 'আবিদ আজাদ' নামে স্থির হয়ে বিখ্যাত হন। এটাই বাংলাভাষী মুসলমানের সামাজিক ইতিহাস। 'সাইদুর রহমান' তনয়ের নাম 'শফিক রেহমান' হয়েছে একই কারণে। 'আবদুল মান্নান সৈয়দ'ও একসময় লিখতেন 'সৈয়দ আবদুল মান্নান' নামে।

সিদ্দিকির 'গোলাম' বর্জন যদি সত্য হয় তবে তা আমি যে কতখানি আমি নই, আয়নার ভিতর দেখা 'ছবি আমি' মাত্র, তার নবতর প্রমাণ বৈ নয়। ইংরেজের ও আমেরিকানের উপনিবেশে, বাঙালি হিন্দু ও পাঞ্জাবি মুসলমানের মায়ের মুখে আত্মপরিচয় এভাবেই দর্পণে গড়ে উঠেছিল। দর্পণ শব্দে দর্প কতখানি লুকানো, কতখানি প্রকাশ্য তা কি বলে দেওয়ার দরকার আছে?

চাষী সমাজ থেকে এলিট হওয়ার পথে রেনেসাঁস, আধুনিকতা, সংস্কৃতায়ন, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রভৃতি নানান ছত্রছায়ায় ব্যক্তির মরীচিকা দেখা দেয়। খটকা লাগে অন্য জায়গায়। সাবদার সিদ্দিকির কবিতা ছবির জগৎ ছাড়িয়ে নিশান জগতে উঠেছে। ক্ষমতাসীন এলিটের কাছে সাবদার নিজেকে একটুও সমর্পণ করেন নাই।

বর্তমান এলিট জগতের বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং আর্তনাদের অপর নাম সাবদার। তাঁর 'গোনাম' নাম বর্জন তা হলে কি স্ববিরোধিতা? স্ব বা আমি এখানে ব্যক্তি সাবদারের প্রতিদ্বন্দ্বী তাহলে?

নিশান জগৎ বলে যেখানে আমরা ঢুকি সেখানে গোলামের মতন আমাদের ছায়া জগতের অনেক কাণ্ডই চাপা পড়ে। এর মধ্যে যাঁরা মিশে যান তাঁরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বেঁচে থাকেন।

> এই ঘুমে ঘুমে বেঁচে থাকার কি দরকার?
> স্বপ্নের সাথে যুদ্ধে যুদ্ধে ক্ষতচিহ্ন বাঁচাব?
> (সিদ্দিকি ১৯৯৭: ৬৩)

কিন্তু সাবদারের মতন যাঁরা প্রশ্ন তোলেন তাঁদেরও সমস্যা আছে। সেই শৈশবকে—মায়ের সাথে দৈহিক ঐক্যকে—নাড়ি কাঁটার পর আর একবার কাঁটা হয় পিতার নামে। সমাজ রাষ্ট্র ভগবানের নামে তার ক্ষতচিহ্ন পুরো সারে না, স্বপ্নের মধ্যে ফিরে আসে।

ফ্রয়েড স্বপ্নকে বলেছেন এক কিসিমের আলামত (symptom)। বিদ্যমান জগতের 'ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম' স্বর্গত্যাগের সময় কিছুই ছিল না। স্বর্গ ছবির জগৎ। ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম সব নিশান জগতের বাসিন্দা। কিন্তু ঈশ্বর শব্দ উচ্চারণ মাত্রই ছবির জগৎ শেষ, স্বর্গত্যাগের আদেশ জারি হয়ে গেছে। স্বর্গে ঈশ্বর নাই। ঈশ্বর আছেন ভাষায়।

> স্বর্গ ত্যাগের সময় কি কি ছিল মনে আছে?
> ধর্ম-অর্থ মোক্ষ-কাম
> ছিল না কিছুই
> কেবল নিষ্ঠুর ঈশ্বর-বৃক্ষ-মাটি তুমি আমি।
> (সিদ্দিকি ১৯৯৭: ৩৮)

২

বিপ্লবী ও সুররিয়ালিস্ট কবি পাবলো নেরুদার দিকে সাবদারের টান ছিল, বিপ্লবের ও স্বপ্নের প্রতি ওঁর মুগ্ধতা ছিল। এই কথা উল্লেখ করার পর মান্নান সৈয়দ বেহুদা সিদ্ধান্ত করলেন: 'তবে সাবদার কখনোই শ্লোগানধর্মী বা ইজম-তাড়িত কবি ছিলেন না—বরং নিষ্ঠ ছিলেন কবিতার আঙ্গিকের প্রতি।' (সৈয়দ ১৯৯৭: ১৪–১৫)

আঙ্গিক-নিষ্ঠার সাথে ইজম-তাড়নার কোন বিরোধ নাই। অথচ মান্নান সৈয়দ এই রকম বিরোধকে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়েছেন। বিপ্লবী ও সুররিয়ালিস্ট পাবলো নেরুদার

কথা বাদ দিন, সুররিয়ালিজমের 'পোপ' নামে খ্যাত আঁদ্রে ব্রতোঁর সম্যক পরিচয় না জানার প্রমাণ হিসাবেও মান্নানের এই উক্তিকে গ্রহণ করা যায়। (ব্রতোঁ ১৯৯৩)

সাবদার সিদ্দিকির ভিতর ব্যক্তির বিভাজন এবং ছায়ার জগতের সাথে নিশান জগতের সম্পর্ক ও বিরোধ মান্নানের চিন্তাশক্তির সীমানায় উঁকিও দেয় নাই বলেই তিনি সাবদারের কবিতার রাজনৈতিক চরিত্র বুঝতে সম্পূর্ণ অসফল হয়েছেন। প্রভাবশালী সমালোচক হিসাবে মান্নান সৈয়দ কোন কোন তরুণ লেখককে এখনো অনুপ্রাণিত করেন। সিদ্দিকি-অনুরাগী পাঠক-পাঠিকাদের লেখা পড়ে আমাদের এই ধারণা আরো পোক্ত হয়েছে।

মান্নান সৈয়দ খানিক নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নাকচ করে আর এক জায়গায় আবার স্বীকার করেছেন: সাবদার সিদ্দিকি কিছুটা দ্রোহের কবিও বটেন। এর দায় কার? মান্নানের মতে ষাটের দশকের। মান্নান সৈয়দ লিখেছেন: 'বাংলাদেশের কবিতায় ষাটের দশক একটি দ্রোহের দশক। এই দ্রোহ ছিলো কবিতার বিষয় ও বিন্যাস দু দিক থেকেই।' (সৈয়দ ১৯৯৭: ১৬)

সাবদারের জীবন সারাংশ মান্নান সৈয়দ পেশ করেন এভাবে:

> জন্মেছিলেন কলকাতায়, সাতক্ষীরায় কেটেছে কৈশোর ও প্রথম যৌবন, সাহিত্যিক বিকাশ ঢাকা-র কেন্দ্রিকতায়; সংসার পাতেননি, এমনকি কোনো নারীর সঙ্গে লিপ্ততার কথাও শোনা যায়নি কখনো; গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে কোনো স্থায়ী জীবিকা অবলম্বন করেননি—না চাকরি, না ব্যবসা; কবিতা বা ক্যালিগ্রাফি রচনা করেছেন অনেক, কিন্তু দু'একটি নিউজপ্রিন্ট-নীলচে পুস্তিকা বাদে কোনো পুরু মলাটের শক্ত বাঁধাইয়ের বই পর্যন্ত বেরোয়নি; কোনো রাজনৈতিক দলের ধামা ধরেননি, কোনো কবিসংঘের সদস্য হননি, ধার ধারেননি কোনো ইজমের: স্বতন্ত্র স্বাধীন স্বতস্ফূর্ত এক জীবন যাপন করে গেছেন, স্বতস্ফূর্ত স্বাধীন স্বতন্ত্র এক কবিতাধারা উৎসারণ করে গেছেন। (সৈয়দ ১৯৯৭: ৯)

সাবদার সিদ্দিকির জীবন ও কবিতাকে মান্নান সৈয়দ যে পরস্পরের আয়না জ্ঞান করেন তার নিদর্শন 'স্বতন্ত্র', 'স্বাধীন', 'স্বতস্ফূর্ত'—এই তিন গুণপদের বিন্যাসক্রম নজর করলেই পাওয়া যায়। সাবদারের জীবন সৈয়দকে যতটা টেনেছে, কবিতা যদি তার সিকিটাও টানত তো সাবদার সিদ্দিকির স্বতন্ত্র কবিতার অন্য এক পরিচয় ফুটে উঠত।

আমাদের সিদ্ধান্ত: সাবদার সিদ্দিকি পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত রাজনীতির কবি। ইজম-তাড়িত নন, ইজম-তাড়ুয়া কবি সাবদার সিদ্দিকি। তিনি স্লোগানও লিখেছেন ঢের। স্বর্গত্যাগের পর থেকেই গোলাম সাবদার সিদ্দিকি নিশান জগতের (the Symbolic Order) কবি।

নিশান জগতে সাবদারের প্রবেশ কলকাতার হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভিতর। এর পরিণতিতেই তাঁর বাংলাদেশে আসা। অথচ তাঁর এই বেদনাকে, এই যন্ত্রণাকে 'খানিকটা হলেও, স্বরচিত ও স্বযাচিত' বলে মান্নান সৈয়দ শুদ্ধ অন্যায়ই

করেন নি, ইতিহাস বিষয়ে নিজের ক্ষমাহীন অজ্ঞতার প্রমাণও পেশ করেছেন। একমাত্র মান্নান সৈয়দের মতন সৃষ্টিছাড়া কল্পনা-প্রতিভাবানের পক্ষেই সম্ভব এহেন আত্মম্ভরিতা। (সৈয়দ ১৯৯৭: ১৬)

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মতন ঘটনাকে সচরাচর রাজনীতির অঙ্গ বলেই গণ্য করার রেওয়াজ। ১৯৫০ সনে যেই শিশুর জন্মচিৎকার দাঙ্গামথিত কলকাতা শহরের বিবেকের মতন বাতাসে ধ্বনিত হয়েছিল, সেই চিৎকারকে মান্নান কি খানিক স্বরচিত বলবেনই?

> কলকাতায় তোমার মনে নেই? মনে নেই?
> পঞ্চাশের কলকাতা?
> দাঙ্গামথিত শহরের বাতাসে ধ্বনিত
> বিবেকের মতো তোমার, আমার জন্মচিৎকার?
> কিংবা '৬৪ দাঙ্গামথিত শহরের
> নগ্নভগ্ন মৌলালীর উলঙ্গ দরগাহ
> (সিদ্দিকি ১৯৯৭: ১৭)

অথবা

> রাজপথে নিঃসঙ্গ সুনীল ভগ্ন শঙ্খের
> নিঃশব্দে নিনাদ?
> ...
> তখন কলকাতা
> জব চার্ণকের নয়
> রবীন্দ্রনাথের নয়
> তখন কলকাতা মানে আগুন
> তখন কলকাতা মানে আমি
> (সিদ্দিকি ১৯৯৭: ১৭–১৮)

অথবা

> মধ্যরাতে দাঙ্গার মাতাল চীৎকারে
> নিঃসঙ্গ প্রদীপের মতো
> কেঁপে ওঠা আমার কিশোর কলকাতা।
> (সিদ্দিকি ১৯৯৭: ১৭)

'কলকাতা/আমি এক তরুণ মহাপুরুষ' নামধারী পদ্যটির শুরু কলকাতা শহরে পাতাল রেল চালুর খবর থেকে:

তোমার ভূগর্ভে প্রবাহিত হবে লৌহশব্দ নদী
তোমার পাষাণবুকে, সংযোজিত লৌহ-হৃদপিণ্ডে
ধ্বনিত স্পন্দিত হবে যন্ত্রের জয়গান
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ১৭)

স্মৃতির সেই ঘরটা ঘুমিয়ে ছিল, পাষাণপুরীর রাজকন্যার মতন জেগে উঠেছে সে।

কলকাতা, তুমি তাই সুড়ঙ্গগামী আজ
লজ্জায় লুকাতে চাও তোমার কংকাল মুখ
লক্ষ লক্ষ সতীর ভস্মাচ্ছাদিত
তুমি এক ভণ্ড কাপালিক কলকাতা।
প্রত্যহ বিধৌত তুমি তাই গঙ্গাজলে
তুমি আজ মুখ লুকাতে চাও কোন মুখে?
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ১৮)

কবির জীবনী থেকে তাঁর রচনা বাদ দেওয়ার পর যা বাকি থাকে, আমাদের ধারণা, মান্নান সৈয়দ তারই চর্চা করেছেন। আগেই বলেছি মান্নান সাবদারের কবিতাকে ব্যক্তিগতের গহন একাকীত্বে নামিয়ে দিয়েছেন এবং নিজের এই অলীক পাঠের লগে যেই সব অক্ষর মেলে না তাদের গা করেন নাই তিনি।

এই থোকাটির কথাই না হয় ধরুন।

হাওড়া ব্রীজ যেন লোহার ব্রেসিয়ার তোমার
কলকাতা, যন্ত্রের সমান বয়সী তুমি
কলকাতা, তোমার ইতিহাস
বাইবেলের পিছনে গাদাবন্দুক
বাংলা গদ্যের সমান বয়সী
আমার কিশোর কলকাতা
সন্ন্যাসীর লিঙ্গের মত নিস্পৃহ তুমি আজ।
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ১৯)

মান্নান সৈয়দ উল্লেখ করেছেন উপরের কবিতার এক নম্বর ও সাত নম্বর লাইনভুক্ত দুইটি পদ 'লোহার ব্রেসিয়ার' আর 'সন্ন্যাসীর লিঙ্গের মত নিস্পৃহ' নাকি গোলাম সাবদার সিদ্দিকির 'ব্যক্তিগত' কথা মাত্র। আসলে এই রায় মান্নান সৈয়দেরই ব্যক্তিগত বাঁধিগৎ বা ধরতাই বুলি ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু 'বাইবেলের পেছনে গাদাবন্দুক' এই পদবন্ধের কী ব্যাখ্যা তিনি দেবেন? ইতিহাস বিষয়ে কথা না বলার বা না জানার ভান করে যিনি সাহিত্য সমালোচনায় কোমর বেঁধে নেমেছেন তাঁর সম্পর্কে এটুকু বলাও হয়তো সময়ের অপচয়।

কলকাতা একদিকে যন্ত্রের সমান বয়সী, অন্যদিকে সমান বয়সী বাংলা গদ্যের। কলকাতা কলোনি শহর, তিনশ বছর তার উমর পূর্ণ হল ১৯৯০ সনে। আজ বাংলা ভাষায় বড়লোকের সাহিত্য রাজত্ব করে। এই সাহিত্যের ঔরস কলকাতায়। কলকাতা মরে যায় বলে কি তুলকালাম কাণ্ডই না ঘটালেন দিল্লির সাবেক রাজপুত্র রাজিব গান্ধি। কিন্তু কী অপরাধ কলকাতার?

ইংরেজ জাতি যখন সরকারি দরকারে পয়লা বাংলা প্রদেশের পূর্বাংশ ও আসাম কলকাতা থেকে আলাদা করেন, তখন কলকাতার বাঙালি হিন্দু এলিট রাস্তায় নেমেছিলেন রাখি-বন্ধনের সুতা হাতে। তারা ঠেলায় পড়ে ভালবেসেছিলেন সোনার আঁশের পূর্ব বাংলাকে। 'আমার সোনার বাংলা' গানখানি রচিত হয়েছিল সেই আবেগেই।

১৯২৬ সন থেকে ১৯৪৬ সন পর্যন্ত থেকে থেকেই যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দিল সেই দাঙ্গায় রাখি-বন্ধন কেটে গেল? হাতে উঠে এল সুতার বদলে কিরিচ। নিজের কলজে ত্রিশূলে গেঁথে তারাই কি হত্যা করেন নি রাজপথে, পঞ্চাশের মধ্যরাতে, মৌলালির দরগায়, চৌষট্টির বাতাসে? এ কথাই জিজ্ঞাসা করেছেন গোলাম সাবদার সিদ্দিকি। অথচ মান্নান সৈয়দ তার অর্থ বুঝতে না পেরে তাঁকে বলেছেন 'ব্যক্তিগতের ছুরি'।

এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে নজরুল ইসলামের মন্তব্য: 'মনে হল, পশুর ন্যাজ খসছে আর মানুষের গজাচ্ছে!' ১৯২৬ সনে নজরুল লিখেছিলেন:

> মানুষ আজ পশুতে পরিণত হয়েছে, তাদের চিরন্তন আত্মীয়তা ভুলেছে। পশুর ন্যাজ গজিয়েছে ওদের মাথার উপর, ওদের সারা মুখে। ওরা মারছে লুঙ্গিকে, মারছে নেঙ্গোটিকে; মারছে টিকিকে, দাড়িকে। বাইরের চিহ্ন নিয়ে এই মূর্খদের মারামারির কি অবসান নেই! (ইসলাম ১৪০৩: ৮৮৪)

দেশভাগের মূল্য কলকাতাকে দুইভাবে দিতে হয়েছে। দিল্লির লাড্ডু খেয়ে পস্তাতে হয়েছে জব চার্নকের শহরকে। পূর্বদেশের জমিদারি হারিয়ে বসতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলকাতাকে। আর আজ হুগলি পারের চটকলে কাউয়া হাগছে। বাংলা গদ্যের দিগন্তর সঙ্কট দেখা দিয়েছে। নকশালবাড়ির লাল আগুনের পর কলকাতার গদ্য ও পদ্য এখন হ্যামলেটের মতন দ্বন্দ্বে: কলকাতা, না, না-কলকাতা?

> তোমার যাদুঘরে সংরক্ষিত মমির মতো
> বড়ই নিঃসঙ্গ আমি আজ।
> (সিদ্দিকি ১৯৯৭: ১৮)

> অথচ পার্ক স্ট্রীটের কাঁটাতারে আবদ্ধ
> তোমার পাথর গান্ধী

ধাবমান অশ্বারোহী সুভাষ
বিবেকানন্দের গৈরিক নাগরিক কলকাতা
আজকাল কেমন আছ?
নাবার মন্ত্রী তোমার মনুমেন্ট
কলকাতা ওহঃ ওহঃ কলকাতা
চেক! চেক! তুমি চেক
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ১৮)

কলকাতার পতনে—সাবদার বলেন—'আমিও কেঁদেছি'। কলকাতা ক্রমশ ছোট কেরানির শহর হয়ে যাচ্ছে। 'ইয়ং বেঙ্গলের হুররে হাহহা' এখন 'কৃষ্ণের বাঁশির মতো হাতে পাইপ গান' নিয়ে ঘুরছে, তার পকেটে 'পেটো'। কিন্তু শেষ নাই কলকাতার।

কলকাতা তুমি বেঁচে গেছ
ডেলি প্যাসেঞ্জারের মুষ্টিবদ্ধ হাতে
রেলের বগীতে অথবা ট্রামে
কিংবা নির্জন গ্রামে
কেরানীর রুটির আর আলুভাজির ভাঁজে
তুমি বেঁচে আছ, বেঁচে গেছ।
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ১৮–১৯)

৩

জাপানী কাপড়ে ঢাকা
হে আমার ঢাকা
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ২৮)

সাবদার সিদ্দিকি আপাদমস্তক রাজনীতির কবি। আমাদের এই সিদ্ধান্তের পক্ষে আরেক নজির আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত সংগ্রহের দীর্ঘতম পদ্য 'খসড়া কবিতা'। (সিদ্দিকি ১৯৯৭: ৬১–৬৪)

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ওফাতের পর ফরহাদ মজহার একটি স্মরণীয় কবিতা লিখেছিলেন ১৯৯৭ সালে। বাংলা ভাষার আচঞ্চল ব্রাহ্মণ সাহিত্যে ওটিই 'খসড়া কবিতা'র নিকটতম তুলনা। কী লিখেছেন সাবদার?

মেড ইন জাপান সভ্যতা
দ্রুততম টয়োটার পিছে দ্রুতগামী মিটসুবিশি
পিছনে ফক্সওয়াগন আর ফোর্ড ডিজেল ট্রানজিট
ভিলাই ইস্পাত ভেজি

ঠা ঠা কুট বৈশাহাসি টা টা ট্রাক।
নিয়ন্ত্রিত অন্ধকার শীতাতপে টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী কম্প!
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ৬১)

অর্থশাস্ত্রের শিক্ষকরা এই বস্তুরই নাম রেখেছেন 'নতুন ঔপনিবেশিকতা'। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য গরিব দেশের বাজারে শিল্পোন্নত দেশের প্রস্তুত পণ্য বিক্রয় করা, তার মগজধোলাই করে রাখা। উপরের ছয় লাইনে সাবদার যেই সারমর্ম লিখেছেন তা একদিকে ছবির মতন অন্যদিকে নিশানের চেয়েও ভারি নিশান। নবীন ঔপনিবেশিকতার নতুন নাম 'মেডিন জাপান সভ্যতা'।

নয়া জমানার উপনিবেশবাদের স্বভাব এই রকম। আজ বাংলাদেশে ফ্রি মার্কেটের উকিলগণ যেই অর্থনীতির প্রবর্তন করেছেন তাতে শিল্প-কারখানার পথ সঙ্কীর্ণ—আমদানি ব্যবসার পথ বড়। দেশের গরিব দশা অকারণ নয়। এর পিছনে ঔপনিবেশিক যুগের অবদান আছে। নতুন যুগটাও সেই স্মৃতির অধিক হয়ে ওঠে নাইঃ

তুমি কি জান না যুবক
বিভক্ত স্বদেশে শস্যের চতুর্ভুজ তোমার
বিমান বন্দরে বানের মেনহফ
নৌ বন্দরে বমি করে বিদেশী খাবার জাহাজ
রুটির বদলে কিনে নেয় জলমাটি তোমার সবার।
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ৬১)

আবদুল মান্নান সৈয়দ, তদীয় সাহিত্য পরিবার ও পেশাদার অর্থনীতিবিদ পণ্ডিতদের এই পদ্য—বাংলা ব্যাখ্যাসহ—দৈনিক দুই চামচ সেবা।

অমীমাংসিত দারিদ্রসীমার
ফারেনহাইট ওঠানামা যাবতীয় রক্তচাপ সমুদ্রসীমা
তুমি কি জান না
এইসব সামাজিক-সামরিক লজিক ম্যাজিক।
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ৬১)

বাইবেলের পিছনে গাদাবন্দুক যেমন কলকাতার ইতিহাসের চুম্বক, তেমনি আজ 'নিউট্রন মানে না দেশ মহাদেশ':

তোমার হাতে দাঁতে লেগে আছে
সবুজ মাংস শস্য কণা।
ঝকমকে টিনজাত সভ্যতা এই উপজাতীয় দামামা
এ্যালুমিনিয়ামে মিগ কিংবা বোমা
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ৬২)

ইংরেজের বাংলা জয়ের পিছনে বাংলার ভগবান সমাজের দান কম নয়। মোগল সাম্রাজ্যের মনসবদার মির জাফর আলি খাঁ, মারোয়ারি সওদাগর জগৎশেঠ পরিবার আর বাঙালি জমিদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে বাদ দিয়ে একা সাবিতজঙ্গ নামে পরিচিত ইংরেজ সেনাপতি কর্নেল ক্লাইভ হয়তো কলকাতার 'আলিনগর' নামটি বদলাতে পারতেন না। (রায় ১৯৯৪) এখানেই গাদাবন্দুকের ভূমিকা।

ঔপনিবেশিক শোষণের সহায়ক নব্য রাজপুরুষগণ এখন কী হালে আছেন?

> নার্থডে কেক আলোকোজ্জ্বল দ্বীপপুঞ্জরাজি
> সুখাদ্য সামরিক আমলা টেবিলে
> ক্ষুধার্ত জনতা রুটি দিয়ে বানিয়ে চাঁদের রঙিন ঘুড়ি
> বেসবল খেলছে চর্বিছায়াপিণ্ডরা
> হাসছে খেলছে খলখল।
> ...
> ঘুরছে বনবন রাজনীতি হুইল চেয়ার
> মসলিন রক্ত কবরীর অন্তরায় সম্প্রদায়
> আমলা সংস্কৃতি, ভোজবাজি বারোভাজা
> মিশ্র অর্থনীতি
> রঙিন টিভি টিউবে কূট করমর্দন দোলায়
>
> (সিদ্দিকি ১৯৯৭: ৬২)

এই ভদ্রলোকেরাই এখন 'সুশীল সমাজ' নামক অশ্লীল শব্দের কারবার চালু করেছেন। এঁরাই ক্ষুদ্রঋণের প্রেরিত পুরুষ। এঁরাই প্রযুক্তির নামে শুল্কহীন বন্দরে কুমির আমদানির ইন্ডেন্টার। এই বাজার সরকার, ওরফে মুৎসুদ্দি, ওরফে কমপ্রাদোর শ্রেণীর উদ্দেশেই সাবদার বলেছেন:

> সামরিক ও বেসামরিক প্রযুক্তি উৎকর্ষ করতে পারে
> তোমাকে উৎফুল্ল উদভ্রান্ত যুগপৎ বিশ্ববিজ্ঞানের
> অভ্রান্ত অবদান ভেবে সহাস্য স্বস্তি পাও
> হয়তো তুমি।
>
> (সিদ্দিকি ১৯৯৭: ৬২)

দুনিয়া জুড়ে এখন পুঁজির বিজয় দিবস। পুঁজির ধর্ম নিজেকে বড় থেকে আরো বড় করা। পুঁজির এই আত্মস্ফীতিপরায়ণতা প্রেমের ছদ্মবেশে মাত্র কামের মতন। কামেরও বিশেষ নাই, পুঁজিরও তাই:

> তোমার মূল্যমান জীবনের চেয়েও চঞ্চল পেট্রল-এ্যালকোহল।
> রঙিন আন্ডারওয়্যার ট্রাউজার, ছেঁড়া কাঁচুলি

রাবারের পাহাড় ছেড়া ব্রেসিয়ার
সুগন্ধি পাউডার?
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ৬১)

পুঁজির এই প্রবণতা উপনিবেশে এসে তার ঘরের মুখোশ শত্রুর কেল্লার মতন ছুঁয়ে ফেলে দেয়। সাবদার সিদ্দিকির ধারণা পুঁজিওয়ালারা 'পিকাসোর চেয়ে ক্ষিপ্র আঙুল পকেটমার এখানে'।

উড়ন্ত সমার পেট্রোডলার
লালরক্ত কালোবাজারে
রঙিন ব্রার মধ্যে ব্লেডের গোপন।
ছেয়ে থাকা সর্বত্র বিদ্যুৎ বৃক্ষলতা
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ৬১)

পুঁজির ধর্ম মুনাফা বৃদ্ধি। মুনাফার প্রয়োজনে কাজ সৃষ্টি। অনুন্নত তথা পরাধীন দেশে এই মুনাফার প্রতিযোগিতা আরো বেআব্রু রূপ ধারণ করে। গণদারিদ্র্য ও গণবেকারত্বের দেশে আন্তর্জাতিক অর্থাৎ বৈদেশিক পুঁজির পরামর্শ শিল্প-কারখানার পথ গ্রহণ নয়, জন্ম-নিয়ন্ত্রণ:

আকাশ আড়াল করা
জন্মনিয়ন্ত্রণের পিচ্ছিল বিজ্ঞাপন মিছিল
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ৬২)

আধুনিক ধনতন্ত্র বিমূর্ত ফ্রি মার্কেট নয়। এর 'খেলার প্রতিভা' আছে। আছে, ইংরেজিতে যাকে বলে, 'রুলস অব দি গেইম'। কিন্তু প্রতিভা তো খেলা মাত্র নয়:

রেফারীর পাশপকেটে ভীষণ এখানে
হলুদ লাল কার্ড হিব্রু হুইসল গড়ায় গোল
স্টেডিয়ামে ঘড়ির চেয়ে চঞ্চল বল।
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ৬২)

হুইসলের বিশেষণ 'হিব্রু' কেন? ধনতন্ত্রের ইতিহাসে সাবদারের যথেষ্ট পড়ালেখা বলেই মনে হয়।

বাংলাদেশে ধনতন্ত্রের বর্তমান ছবি সাবদার ছোট ছোট ডাক টিকিটের মতন আঁকেন। চিংড়ির ঘেরকে বলেন 'জলের খামার' অথবা 'মাছের ভ্রাম্যমাণ যৌথ যৌন সংগঠন'। তাঁর চোখে কৃষি 'দোয়াশ জমিতে কৃষকের ঘামসেচ প্রকল্প'।

উপশহর পেরিয়ে কয়েক কিলোমিটার পেট্রোকেমিকেল
দ্রুতনিঃশেষিত কার্বন মনো অক্সাইড...

... রাতার নিয়ন্ত্রিত আকাশ সীমায়
ইউরো পাউন্ডে বুলেট প্রুফ কাঁচ...
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ৬৪)

৪

নতুন ঔপনিবেশিক যুগে পুঁজির সেবায়েত কারিগর ও ইঞ্জিনিয়ারদের করুণাময়ের মতন জিজ্ঞেস করেন কবি:

... বাবুই বাসার নিচে আলোপোকা
অন্ধকার, এবং তার উপরে
আবার অন্ধকার
কত সেন্টিমিটার সৌর অন্ধকার জ্বালাতে পারে এই বুনসেন বার্নার?
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ৬৩)

এঁদের বিদায় কবির আস্থায়:

বিজ্ঞান পৃথিবীর ধূলিপরমাণু নুড়ি নক্ষত্র কণা
এখনো কিছুই জানে না জান না সৌর বুড়ো টেকনোক্র্যাটিক
ক্লিক প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর রকেট বৈজ্ঞানিক।
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ৬৪)

মধ্যম শ্রেণীর নিশান দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কী প্রচণ্ড উপহাস তাঁকে!

তুই কি জানিস না চন্দন
নতজানু জানতে চায় এরা
কমপিউটর কাছে
ঈশ্বর নেই কিংবা আছে
প্রথম দিনের সূর্য নিরুত্তর
কমপিউটর
দেয় না এদের উত্তর।
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ৩৬)

মধ্যম শ্রেণীর লেখক কবিদের কর্মকাণ্ডকে সাবদার চিহ্নিত করেছেন 'চঞ্চল কিছু কিলবিল শব্দের কুটিল কুটিত্ত শিল্প' বলে। অথচ এই চরিত্রচিত্রণ সাবদারের কবিতার উপর আরোপ করে আবদুল মান্নান সৈয়দ ক্ষমাহীন অনিষ্ঠার প্রমাণ রেখে গেলেন। অন্তত দুই জায়গায় মান্নান—এক জায়গায় ভুল উদ্ধৃতিসহ—সাবদারের চপেটাঘাত

সাবদারের গালেই বসিয়ে দেন। (সৈয়দ ১৯৯৭: ৯, ১৬; ১৬ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতিটি বিকৃত বা ভুল)

মধ্যম শ্রেণীর কবিরা কী করছেন এই ক্রান্তিকালে?

যাত্রাপথ থেকে মুছে যাচ্ছে নদী
কেউ লিখছে না
... ...

মগজ দ্রুত কাগজ হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ৩৫)

শুধু হাই তুলে তুড়ি মেরে
হামাগুড়ি কাটিয়ে দিচ্ছে কাল
লৌহসংস্কৃতির ক্রীতদাসেরা
শৃঙ্খলিত এরা মাংসে মজ্জায়
মুখোশজীবী এক নির্বাক সম্প্রদায়
রাষ্ট্রীয় পরিবহনে প্রত্যহ ফিরে যায়
নির্ধারিত সিমেন্ট কৌটায়, মমি শয্যায়।
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ৩৭)

এই জাতের কবিরা যেই ভাষায় লেখেন সেই ভাষার নাম রেখেছেন সাবদার 'মোমবাতি ভাষা'। মোমবাতির আলোয় মেনিমুখো যেই কবিতা লিখল:

দিবালোকে সে কবিতা কটা লোকে
পাঠোদ্ধার পারে
মোমবাতি ভাষা কজন বুঝতে পারে
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ৪৩)

এদের উদ্দেশ্যেই সাবদার বলেন: 'এখনো তুষার যুগে তোমরা এখনো সবাই।'

জাক লাকাঁ মানুষের স্বার্থ বা ইগো বা অহংকে বলেছেন ব্যক্তির 'দর্পণ পর্যায়' (the Mirror Stage)। শিশু ব্যক্তি হওয়ার পথে—ছয় থেকে আঠার মাস বয়সের মধ্যে—'আমি' বলতে শেখে। এই বয়সে আয়নায় নিজের পুরা শরীর একত্রে নড়তে চড়তে দেখে নিজেকে চিনতে শেখে। মায়ের মধ্যে নিজেকে চেনাও একই চরিত্রের কাজ। এই পর্যায়ে শিশু মা'র কাছ থেকে আলাদা হয় নাই।

এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মধ্যে আবার বাবার আবির্ভাব শিশুকে জানিয়ে দেয় জগৎ ত্রিপাক্ষিক। মায়ের কাছ থেকে আলাদা হয়ে তাকে নতুন সম্পর্ক মেনে নিতে হয়। এই মেনে নেওয়ার পর্যায়টাই শিশুর মানুষ হওয়ার—সমাজ, নীতি, আইন ও ধর্ম গ্রহণের—কাল। দর্পণের পর্যায়ে শিশুর যেই সংজ্ঞা তা আয়নার মতনই ভঙ্গুর,

তা তখনো জগতের, নিঠুর ঈশ্বরের বিধানের ভিতর স্থাপিত নয়। সেটা শুদ্ধ মায়ের জগৎ, পিতৃনামের পরাক্রম তখনো তার অজানা।

এই পর্যায় থেকে পরের পর্যায়ে যাওয়ার পথটা ক্ষতচিহ্নময়—ট্রমাটিক (traumatic)। গ্রিক ট্রমা (trauma) শব্দের অর্থও ক্ষতচিহ্ন। সাবদারের কথা আমরা আগেই তুলে দিয়েছি: 'স্বপ্নের সঙ্গে যুদ্ধে যুদ্ধে ক্ষতচিহ্ন বাঁচার?'

শিশু যখন নিশান জগতে বা বিধানের বিশ্বে প্রবেশ করে তখনো কিন্তু ছায়ার জগৎ বিরাজমান, শুদ্ধ তার ঠিকানা বদল ঘটে। যেই জায়গায় গিয়ে সে আশ্রয় নেয় তার নামই অচেতন। সেই অচেতন মগজের কোষে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় ব্যক্তির বাইরে, অন্যের লগে সম্পর্কের ভুবনে। কিছু কিছু লোক আছে যারা ছায়ার জগৎ থেকে কিছুতেই ছাড়া পান না। নিশান জগতে উত্তরণ ছাড়া গতি নাই। মুক্তির পথ নিশানের ছোঁয়া এড়িয়ে নয়, তাকে জেনেই। বাংলা কবিতার নির্বাক সম্প্রদায় এখনো আয়না পর্যায়ে, মানে মানস পরিক্রমের আত্মপ্রতারক স্তরে। তাই সাবদার বলেন:

> এখনো দর্পণের দরজা ভেঙে বেরিয়ে
> এলো না স্থিরচিত্র টুকরো টুকরো ভাঙল না
> মানুষের ভগ্নাংশ দিয়ে কেউ
> বানিয়ে দিল না পাখি।
> (সিদ্দিকি ১৯৯৭: ৪৩)

৫

> আলো জ্বালতে এসে ভুলে
> আগুন ফেলেছি জ্বেলে
> (সিদ্দিকি ১৯৯৭: ৫২)

নির্বাক এক মুখোশজীবী সম্প্রদায়ের দেশকে সাবদার—একই সাথে দৃষ্টিহীন জগতের রূপকে—বলেছেন 'বিনোদিনী চক্ষু হাসপাতাল'। তাই তাঁর যাত্রা নিরুদ্দেশ, 'অন্য অজ্ঞাতবাসে':

> বিনোদিনী চক্ষু হাসপাতাল ছেড়ে অন্য কোন
> মানসনিবাসে চলে যাব আর নয়
> রেটিনায় রক্তক্ষরণ...
> (সিদ্দিকি ১৯৯৭: ৪৩)

এই জগৎ সাবদারের খুব প্রিয় কিছু নয়:

এই অমানবিক পারমাণবিক সভ্যতা শুধু জানে
জন্য ট্রাফিক আর শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ২৭)

সাবদার জানেন সাম্রাজ্যবাদ এক অদৃশ্য কাঠামো। কিন্তু তার লক্ষণ দৃশ্যময়।

ট্রাফিক দ্বীপপুঞ্জ থেকে
সমস্ত শহরকে শাসায়
ইশারায় থামায়, থামিয়ে দেয়
অতিকায় কচ্ছপের মতো ট্যাংক
সমস্ত নাগরিক যানবাহন
চন্দ্রতরী, সর্বশেষে নৌবহর
জাতিপুঞ্জের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত
অতিকায় কালোগাড়ী আর
রেড ক্রসের ধূসর গোয়ার ট্রাক।
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ২১)

জর্মান ভাষার ভিৎস্ (*Witz*) শব্দটিকে এক সময় ইংরেজিতে তর্জমা হত উইট (*Wit*) বা ফরাসিতে এস্প্রি (*esprit*) দিয়ে। আজকাল ইংরেজিতে এর তর্জমা, যেমন ফ্রয়েডের রচনাবলির অনুমোদিত অনুবাদে, জোক (Joke) দিয়ে। এই দু ক্ষেত্রেই যুক্তি বা বিজ্ঞান-কাহিনীর সাথে এর একটু ভেদ আছে। (নাগেলে ১৯৮৭: ২৮) সংস্কৃত 'বেদ' এই কথারই পূর্বপুরুষ—মনে রাখলে এই অর্থের পথ কতটুকু দীর্ঘ তা বোঝা সহজ হয়। উইটের মধ্যে কিছু জোক, কিছু প্রজ্ঞা আছে। কিন্তু ফ্রয়েডের মতে ঠাট্টার আসল ভূমিকা নিষিদ্ধ বস্তুর বস্ত্রহরণ এবং যুগপৎ আচ্ছাদন। ঠাট্টার নাম 'বদমাশ যার জিব দুমুখো এবং সে একই সাথে দুই মনিবের দাস'। (ফ্রয়েড ১৯৬০: ১৫৫)

সাবদারের উইট, বুদ্ধিদীপ্ত ভাঁড়ামো, এই উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে নিপুণ। তাঁর 'একজন পুলিশ একটি রাষ্ট্র', 'কাক ও সাম্রাজ্যবাদ মূলত জ্ঞাতিভাই' বা 'জাতিসংঘের বদলে একটি কম্পিউটার যথেষ্ট' ইত্যাকার শব্দ-বাক্য এর উদাহরণ। সাবদার যখন লেখেন:

একজন গেরিলা ও সন্ন্যাসীর
মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নেই
যেহেতু উভয়েই
মূলত ভ্রাম্যমাণ।
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ২০)

তখন চে গেভারার গেরিলা যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কেই জানি না, সাবদারের বিবৃতিও পেয়ে যাই। পাখি সাবদারের কাছে একদিকে পূর্ণ মানুষের প্রতীক, মানুষের

ভগ্নাংশ নিয়ে তৈরি। অন্যদিকে গেরিলা ও সন্ন্যাসীর জাতি। এই নির্বাক মুখোশজীবীর দলে ক্লান্ত সাবদার 'পতাকাসর্বস্ব ব্যবহারিক ফলিত রাজনীতি' করবেন না। আবদুল মান্নান সৈয়দ একাধিকবার ইঙ্গিত করেছেন সাবদার কোন রাজনৈতিক দলের ধামা ধরেন নি। সভা হননি কাব্যসংঘের। এবং সঙ্গত কারণেই। তিনি চান পাখিদের দল করতে:

তার চেয়ে চলে যাও পাখিদের প্রসূতিসদনে ডিমের উষ্ণ
খড়মৃত্তিকায় শিক্ষা নিতে শার যাও
কিভাবে করবে লংঘন
সমুদ্র আকাশ কিংবা তোমার সাহস সীমা
লাথি মেরে পাহাড়ে যায় কিভাবে পাখিরা জানে রাজনীতি
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ৬৩)

তাঁর স্বপ্ন এই রকম:

দেখবি তুই একদিন, সেদিন
কয়েকটা লাল-নীল-হলুদ উজ্জ্বল উচ্ছল শার্ট
হৈ হৈ হররে হল্লায়
এঁকে দেবে রাজপথে কোলাজ ব্লাডগ্রুপ
জেব্রাক্রসিং, উজ্জ্বল বোতল বন্দী উচ্ছল তরুণ
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ৪৭)

তাঁর স্বপ্ন বিস্ফোরণের:

টাটকা সবজীর বদলে হেঁটে হেঁটে
গ্রাম থেকে আসবে দুর্ভিক্ষ, গোলাপ বাগান জুড়ে
ক্রমশ সমস্ত কুমারী বেণী আঁকাবাঁকা
ট্রেঞ্চ উঠবে গড়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বদলে
বাজবে দশদিকে বিস্ফোরিত সাইরেন।
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ৪৭)

এই তাঁর কর্মসূচি:

ঘুম ভাঙিয়ে দেব সমস্ত ঘুমন্ত অগ্নিগিরির পোড়ার
পুড়বে স্বপ্নের নীলাভ ছায়াছবি দ্যুতি
জলবিদ্যুৎ প্রকল্প দুই নিয়ন্ত্রণ
শীতাতপ-জল-যান ও মূল্যমান, শহর উপশহর...
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ৪৭)

পোড়াব পাণ্ডুলিপি
কুয়াশাতুষার রাতে পুড়বে কবিতারা একদিন
এইবার আমার তুই দেখি নিস
এইসব ফুলের দোকান।
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ৪৭)

কবিতার উপর সাবদার শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস হারান নাই। হারালে এমন পংক্তি লিখতে পারতেন কি?

জীবনের ঝকঝকে আগুন থেকে ঝলসে বেরিয়ে আসে
কবিতা ইতিহাস।

কিংবা:

রুটি মাটি থেকে জন্ম নেয় কবিতা ইতিহাস...।
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ৬০)

আবদুল মান্নান সৈয়দ বর্ণিত ব্যক্তিগতের মধ্যে নিম্ন-মধ্যম শ্রেণীর আর্তচিৎকার থাকা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তার দেখা মেলে না সাবদার সিদ্দিকির কবিতায়। সাবদার সিদ্দিকি এক অমর আশাবাদী:

পাতার তাঁবুর নিচে সবুজ যেখানে
ইস্পাত কোথাও না কোথাও মাটি।
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ৪৪)

ডাক দিয়ে যায়
আয় ওরে আয় আয়
আয় নারী
আয় বিপ্লবের ব্রহ্মচারী।
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ৩৪)

সাবদার সিদ্দিকি কী রকম কবি ছিলেন? এই প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই তোলা যায়। বর্তমান দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদকে সাবদারও জানেন 'অমানবিক পারমাণবিক সভ্যতা' জ্ঞানে। কিন্তু তিনি জিজ্ঞাস করেন ধনতন্ত্রের বৈমাত্রেয় কুলের কী অবস্থা?

ক্রুদ্ধ ভাইরাস ছড়ায় হাওয়ায় আবহাওয়ায়
এশিয়ায় আফ্রিকায়
ওড়ায় ক্রুদ্ধ পতাকা তার ক্রুদ্ধ ভাইরাস
সাইপ্রাস থেকে এঙ্গোলায়

বন্দুকনির্গত ক্রুদ্ধ ভাইরাস
যুদ্ধ আর রেডক্রসের পতাকা ওড়ায়।
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ২২)

দেশলাই ছাড়া কোন বাক-বাক্তি সম্পত্তি নেই
তুলে নিই চাই
কলম কিংবা কারবাইন
রুটির বদলে বারুদ কিংবা কৃষ্ণঘর্মাক্ত কলম বন্ধুম।
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ৫২)

কমরেড হাঁটেন। সঙ্গে একদিকে 'মাইল স্টোন হাঁটতে থাকল এক পা দুপা'। (সিদ্দিকি ১৯৭৭: ৫৩) আর অন্যদিকে:

ম্যাচ বক্সহীন শহরের ক্রুদ্ধ যুবক
দড়ির আগুনে জ্বেলে নেয় সর্বশেষ সিগ্রেট তার।
দোতালা বাস থেকে ছাই ঝাড়ে
ছুড়ে মারে দগ্ধ সিগ্রেট
বিদগ্ধ শহরের বুকে।
গ্রামের সরল কৃষাণ তখন শস্যের
সবুজ জায়নামাজে নত
অবনত শস্যের সবুজে মিশে
গেরিলার মতো।
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ২৩)

এই আগুন কিন্তু বেশি ছড়িয়ে যায় নাই। 'এছাড়া এরকম আবহাওয়ায় দেশলাই নাও জ্বলতে পারে'। তবে সে, আগুন নিভে গিয়েছে তাও বলা যায় না।

একদা তুমি বলেছিলে,
লাল সূর্যটাকে পিটিয়ে পিটিয়ে হাতুড়ি
কাস্তে বানাবে, লোহা পিটিয়ে সোনা
গাধা পিটিয়ে ঘোড়া।

তোমার কথা ছিল
এক রাখাল করাল কালের বাঁশি
বাজাতে বাজাতে হেঁটে যাবে সোনালক্ষ্মী ধান কাঁথায়, কোথায়?
(সিদ্দিকি ১৯৯৭: ৫৫)

গোলাম সাবদার সিদ্দিকি কেন তাঁর নামের 'গোলাম' অংশটি কেটে সাবদার সিদ্দিকি হলেন আমরা এতক্ষণেও তার মর্মোদ্ধার করতে পারলাম না। আবদুল মান্নান সৈয়দ যতই বেকুবের মতন আস্ফালন করুন গোলাম সাবদার জানেন:

অথচ কোমরে ছিলো তাঁর
নদীর মত বাঁকা উজ্জ্বল এক তীক্ষ্ণ তলোয়ার।

গোলাম সাবদার সিদ্দিকির কবিতায় রাজনীতি আছে এবং সেই রাজনীতি কিছুটা বিপ্লবমুখী, এটুকু আশা করি প্রমাণিত হয়েছে। পাঠিকা কি বলবেন না মান্নান সৈয়দের মতলবকে সন্দেহ করা যায়? অধিক কি লিখব? 'সাবদার সিদ্দিকির রাজনীতি' বিষয়ে অধিক লিখলে আবদুল মান্নান সৈয়দের অনর্থক গৌরব হয়।

দোহাই

১. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-রচনাবলী*, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, নতুন সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৪০৩)।
২. রজতকান্ত রায়, *পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ* (কলকাতা: আনন্দ, ১৯৯৪)।
৩. রামমোহন রায়, 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ', *রামমোহন রচনাবলী*, অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত (কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩)।
৪. (গোলাম) সাবদার সিদ্দিকি, *সাবদার সিদ্দিকি কবিতাসংগ্রহ*, আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত (ঢাকা: ঘাস ফুল নদী, ১৯৯৭)।
৫. আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'ভূমিকা', সাবদার সিদ্দিকি, *সাবদার সিদ্দিকি কবিতাসংগ্রহ*, আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত (ঢাকা: ঘাস ফুল নদী, ১৯৯৭)।
৬. Andre Bréton, *Conversations: The Autobiography of Surrealism* (New York, 1993).
৭. Sigmund Freud, *Jokes and their Relation to the Unconscious*, James Stratchey, trans. (New York: W. W. Norton, 1960).
৮. Jacques Lacan, *Écrits: A Selection*, A. Sheridan, trans. (New York: W. W. Norton, 1977).
৯. Rainer Nägele, *Reading After Freud* (New York: Columbia University Press, 1987).

....

উৎস
আকার ইকার। নতুন ইয়র্ক ১৯৯৮

১৯

মহাত্মা সাদ কামালীর কালিমা

... তিনি পৃথক, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অবশিষ্টবাদী। সকলের মতো করে লেখেন না তিনি এবং এভাবেই আলাদা হয়ে গেছেন সৃষ্টিশীলতার প্রশ্নে।

সাদ কামালী প্রসঙ্গে এই কথামৃত লিখেছিলেন কবির আহমেদ পৌষ ১৪০২ সনে। এখনো লিখে চলেছেন সাদ কামালী। প্রার্থনা করি তিনি দীর্ঘজীবী হোন। আমার এই প্রার্থনার গল্প যতটা প্রবন্ধ, কামালীর প্রবন্ধও ততটাই গল্প।

একটা কথা পরিষ্কার। লোকের মনে রং ধরাবার জন্য সাদ গল্প লেখকের ব্রত গ্রহণ করেন নাই। তাঁর গল্পে শান্তি নাই। পড়েও পাওয়া যায় না। ঘুম পাড়ানো তো পরচর্চা। আরো একটা কথা: গল্প লেখকের ব্রত নিয়ে মানুষের মনে প্রশ্ন জাগাবেন— সাদ আপাতত মনে হয় সেই দায়িত্বও মাথা পেতে লন নাই। তাই সাদ কামালীর গল্প সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখাও সহজ নয়। বিনিময়ে আপাতত গল্পই লিখব।

কামালীর সাথে আমার যদিও কথা হয়েছে কয়েকবার (তাঁর হাতের রান্নাও খাওয়া হয়েছে), তবু তাঁকে আমি বিশেষ বুঝেছি দাবি করতে পারব না। আমার বরাবরই মনে হয়েছে তিনি 'আলাদা হয়ে গেছেন'। তাঁর গল্পও পড়ি নাই। বেশি আলাদা হলে পড়া যায় না। চিনা ভাষাতেও অনেক গল্প লেখা হয়েছে বলে শুনি। কিন্তু পড়া হয় নাই। সাদ কামালীর গল্প যদি মিশরের পুরানা ভাষায় লেখা হত তাঁর নাম কি শুনতাম? না বোধ হয়। এখনো আশা করি কামালীর লেখা ইংরেজিতে ছাপা হবে—পড়ব একদিন। সেই দিন তাঁর মহত্ত্বের পরিমাপ হবে। আল্লাহ আমাদের প্রার্থনা কবুল করুন। আমিন।

নোবেল পুরস্কারের যাঁরা লালসা করেন তাঁরা কারা? কী তাঁদের সমাজ পরিচয়? সাদ কামালী নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য শিশু নন। মনে হয় তিনিও ব্রাকের দুগ্ধ চুখেছেন।

ব্র্যাক মানে বাংলাদেশে গ্রামীণ প্রগতি কমিটি (Bangladesh Rural Advancement Committee)। বাতিজ্বালানির অবতার। হয়তো সাদ কামালীও গোপনে গোপনে নিকিলিনের মতন এই বিশ্বাস পোষেন যে এই পথে বাতি জ্বেলে পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে। কথাটা ব্যাখ্যা করি।

সাদের সর্বশেষ গ্রন্থ আগুনের গ্রহণ। এই গ্রন্থের শেষ গল্প 'সংস্কার মোচন'। এক ভদ্রলোক—সাদ কল্পনা করেছেন তার পেশা ব্র্যাক অফিসের পিয়ন—সদ্য প্রসূতি বউয়ের দুধ খেয়েছেন। অর্থাৎ দুগ্ধ পান করেছেন। সংস্কারের চাপে বউ সেই খবর প্রতিবেশীর বউকে বলে দিয়েছেন। ফলে গ্রামে সালিশ বসেছে। ইমাম সাহেব রায় দিয়েছেন:

> কোনো স্ত্রীলোকের স্তনা পান (করিলে) সেই স্ত্রী মাতৃস্থানীয়া হইয়া পড়ে। তা জেনে বা না জেনে যেভাবেই পান করুক না কেন। শরিয়তের বিধান বড়ই কঠোর।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ব্র্যাক কী বস্তু? সাদও বলেন নাই। এই স্থলে হয়তো আমার ভয়ই সত্য হল। সাদের বন্ধুরা বলেন তিনি আলাদা। কিন্তু আমার মনে হয় তিনি অর্থাৎ মহাত্মা সাদ কামালী যথেষ্ট আলাদা নহেন। অন্তত এখানে নহেন। সংক্ষেপে এ-ই আমার প্রতিপাদ্য।

আমার প্রশ্ন—বউয়ের দুধ খাওয়ার জন্য ব্র্যাক অফিসের পিয়ন কেন নির্বাচিত হলেন? কামালীর 'অচেতন' কোথায়? ব্র্যাকে?

জাম গাছের মোটা ডালের সাথে দড়িতে লটকে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল রুহুল। কিন্তু পারে নাই। 'গ্রামের মানুষ দেখতে পায়, জাম গাছের গোড়ায় ফাতিমা রুহুলকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে।' লেখা বাহুল্য ভদ্রলোকের নাম রুহুল, বউয়ের নাম ফাতিমা।

নায়িকার নাম ফাতিমা কেন? মা মা উচ্চারণ খা খা করে বলেই? এই নাম কালিমা হলেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু সাদ ফাতিমা নামই বেছে নিয়েছেন। কারণ তিনি লড়াইটা ঘোষণা করেছেন বাঙালি মুসলমান সমাজের বিরুদ্ধে। এই কৌশল অভিনব নয়। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় ব্রিটিশ লেখক সালমান রুশদি এই বিদ্যায় সাদের পূর্বগামী।

সমাজ বন্ধনের গোড়ার কথা: অগম্যা ও গম্যার সীমা নির্ধারণ। মহাত্মা সাদ কামালী সমাজ বন্ধনের এই গোড়ার কথা—ওরফে শরিয়তের বিধান—পরীক্ষা করার চেষ্টা অন্যান্য গল্পেও করেছেন। মহাত্মা ফ্রয়েডের আবিষ্কারও এই রকমই। মানুষ ও জন্তু-জানোয়ার জাতির মধ্যে প্রভেদ কোথায়? এই আইনে। আইন যার মোচন করে না—তা মৃত্যুও বরণ করে না। বেঁচে থাকে অন্য চেহারায়। তার নামই সভ্যতা বা উপসর্গ সংগ্রহ।

সভ্যতার ভিত্তি কোথায়? এই গম্যাগম্যার নিয়মে। ফ্রয়েডের আবিষ্কার বোঝার জন্য ইতিহাসের আদিতে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। আমাদের প্রতিদিনের ইতিতেই

তার রূপ দেখা যায়। গ্রামের মানুষ দেখতে পায়, জাম গাছের গোড়ায়। এই জন্য আমার গল্পের নাম মহাত্মা সাদ কামালীর কালিমা। এই গল্পের অপর নাম হতে পারত ফ্রয়েডের আবিষ্কার অথবা ব্র্যাক। পারত। কিন্তু হয় নাই।

....

উৎস
মঙ্গলসন্ধ্যা ঃ ফেব্রুয়ারি ২০০২

২০

সিমন দো বুভোয়ার: নারী মুখ পুরুষ মুখোশ

আজি হইতে অন্যূন ষাটি বর্ষ পূর্বে ফরাসি মনীষী সিমন দো বুভোয়ার তাঁহার লেখা *দ্বিতীয় প্রকৃতি (Le deuxième sexe)* বহি প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাংলায় কেহ কেহ ইহার তর্জমা করিয়াছেন *দ্বিতীয় লিঙ্গ* নামে। কেহ কেহ করিয়াছেন *স্ত্রীলিঙ্গ*। ফলেই পরিচয় বৃক্ষেল। এইসব অনুবাদ ইতর হইয়াছে, বিশেষ হয় নাই।

যদি কেহ অনুবাদ করিতেন 'দ্বিতীয় জাতি' তবে অনুবাদ বিশেষ হইত না, সামান্যই হইত। এক ভাষা হইতে অপর ভাষায় পার হইবার সময় এই রকম দুর্ঘটনা আকছার ঘটিয়া থাকে। কিন্তু আমার আশঙ্কা এই দুর্ঘটনারও হক আছে, ইহা নিছক নহে।

ফরাসিদেশে এই কেতাব প্রচারের পর—ওয়াকেবহাল মহল জানেন—বিশেষ নিন্দার তুফান ছুটিয়াছিল। অনেকে খোঁজ করিয়াছিলেন লেখক (না লেখিকা বলিব?) কতবার গর্ভনাশ করিয়াছেন। ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক নামক জনৈক পুরুষ লেখক *আধুনিক যুগ (Les temps modernes)* পত্রিকার সঙ্গে জড়িত আরেকজন লেখকের কাছে লিখিয়াছিলেন, 'তোমার মুরুব্বির (মানে শ্রীমতি বুভোয়ার) কয়টা স্ত্রী-অঙ্গ আছে সে খবর আমার আর অজানা নাই'।

আমাদের দেশের মহান পুরুষ আহমদ ছফার মুখে এই বর্তমান খুদে লেখকও বহুবার শুনিয়াছেন এহেন প্রশ্ন। আহমদ ছফা প্রায়ই বলিতেন, 'মেয়েরা কী চাহে? তাহারা কি কাঁদিয়াও দুইটি স্ত্রী-অঙ্গ পাইবে?' এই তথ্যটি আমি সত্যের খাতিরেই উল্লেখ করিতেছি মাত্র।

আজি ষাটি বর্ষ পরে ফরাসিদেশে তথা এয়ুরোপের অন্দরে কী হইয়াছে তাহার খবর আমার বিশেষ জানা নাই। তবে সাবেক মোগল সুবাহ বাংলার অবস্থার হেরফের সামান্যই হইয়াছে। এখনো লোকের ধারণা 'নারীবাদ' মানে মেয়েরা আরেকটা স্ত্রী-

অঙ্গ প্রার্থনা করিতেছেন কিংবা একটা পুরুষাঙ্গ পাইবার ইচ্ছা করিতেছেন ইতি আদি। এই অবস্থায় *দ্বিতীয় প্রকৃতি* কেতাবের তর্জমা 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' হইবে ইহাতে আশ্চর্যের কি!

নর্মান মেইলার নামক জনৈক মার্কিন (পুরুষ) লেখক জানাইয়া দিয়াছেন ইংরেজি ১৯৮৩ সালের আগে তিনি সিমন দ্য বুভোয়ার লিখিত *দ্বিতীয় প্রকৃতি* বইটি খুলিয়াও দেখেন নাই। তো ঐ বৎসর খুলিবার কারণ? মেইলার সাহেব অনেক নারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাদের একজন ঐ বৎসর নাগাদ তাঁহাকে তালাক দিয়াছিলেন। তিনি শ্রীমতি বুভোয়ার বই পড়িয়াই এহেন কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মেইলার সাহেবের ধারণা। তাই তিনি দেখিতে চাহেন কী আছে ঐ কেতাবে?

জনৈক ভারতীয় পুরুষ—নাম কৌশিক বসু, আত্মপরিচয় অনুযায়ী অর্থনীতি বিশারদ—লিখিয়াছেন তাঁহার স্ত্রী পতিব্রতা। তিনি বুভোয়ার বই পড়িয়াছেন অথচ তাঁহাকে তালাক দেন নাই। কি আশ্চর্য! ইহা ১৯৯৪ সনের কথা।

এই রকম আরো পুরুষ আছেন—নারীও থাকিতে পারেন—যাঁহারা মনে করেন বুভোয়ার বহি পড়িলে সংসারের শান্তি নষ্ট হয়। বসু মহাশয় যখন শান্তিতেই আছেন তাই তাঁহার ধারণা বুভোয়ার বিদ্রোহে ভেজাল আছে। তিনি তাঁহাকে (পুরুষের) দালাল বলিয়াও গালি দিয়াছেন। এই পুরুষ লোকটির ধারণা বুভোয়ার বইগুলো সার্ত্রই লিখিয়া দিয়াছেন। অন্তত সার্ত্রের ভাবধারা ধরিয়া এইগুলি লেখা হইয়াছে। অথচ পরক্ষণেই তিনি কবুল করিয়াছেন সার্ত্রের বইপত্র তিনি বিশেষ পড়িয়া সারিতে পারেন নাই। কারণ এইগুলি দর্শনের কচকচানি (বা জারগন) বৈ নহে।

এই অবস্থায় পাঠিকা বলিবেন কি—কী করিয়া বুভোয়ার সম্পর্কে দুই কথা নির্দোষ বালকের মতন লিখি!

নারী কী চাহে? এই প্রশ্নের আগে আরো জানিতে হয় আসলে নারী কী জিনিস? কোন নারী—যেমন সিমন দো বুভোয়ার—যখন লিখিবেন 'আমি নারী' তখন সঙ্গে সঙ্গেই লোকে বলিয়া উঠিবে 'তুমি কি মানুষ নহ?' প্রশ্নকারের ধারণাই ইহাতে স্পষ্ট হইবে। বুভোয়ার কী বলিতেছেন তাহা স্পষ্ট হইবে না।

প্রশ্নকার ধরিতেছেন 'নারী' আর 'মানুষ' আলাদা জিনিস। এই কারণেই কোন নারী যখন একখানা বই লেখেন তখন তাঁহাকে 'মহিলা লেখক' বা 'লেখিকা' বলার ঝড় বহিয়া যায়। ইহাই তাঁহাকে সামান্যার্থে 'লেখক' না বলিবার উত্তম পথ। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে 'মহিলা লেখক' বলিতে আমাদের জিহ্বা অভ্যস্ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিংবা কাজী নজরুল ইসলামকে পুরুষ লেখক বলিতে আমরা বিব্রতবোধ করি। তাহাতে আমাদের ব্রত নষ্ট হয়।

কাজী নজরুল ইসলামের শেষ অসুস্থতার সময় শ্রীসজনীকান্ত দাস মহাশয় তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। শোনা যায়, নজরুল ইসলাম তাঁহাকে বলিয়াছিলেন 'সজনীদা, আমার তো কিছু হইল না?' উত্তরে সজনীবাবু বলিলেন, 'কেন, তুমি তো

মুসলমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি হইয়াছ!' কেহ যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলিতেন, 'আপনি তো ব্রাহ্মদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি হইয়াছেন' তখন আমরা যেই ভাবে হাসিয়া উঠিতাম সজনীবাবুর কথায় তাঁহার শ্রোতারা কি সেই ভাবে হাসিতে পারিতেন? এই প্রভেদের নামই 'কর্তৃত্ব'। এই যুগের ইংরেজিতে গ্রিক বংশজাত (hegemony) শব্দে এই সত্যই প্রকাশিত হইয়াছে।

নজরুল ইসলাম যদি বলিতেন, আমি 'মুসলমান লেখক' নহি, শুদ্ধ 'লেখক' তাহা হইলে আমরা বলিতাম নজরুল বুঝি তাঁহার মুসলমানিত্ব জানাইতে লজ্জা পাইতেছেন।

অথচ এক্ষণে—সত্তর বৎসর পূর্বের তুলনায়—বেশির ভাগ বাংলা পাঠিকাই হয়তো স্বীকার করিবেন নজরুল ইসলামকে শুদ্ধ 'মুসলমান লেখক' বলা কতখানি হাস্যরসের উদ্দীপক। অথচ সকলেই কবুল করিবেন নজরুল ইসলাম নিজের মুসলমান পরিচয় লইয়া লজ্জা প্রকাশ করেন নাই। তিনি সগৌরবেই বলিয়াছিলেন, 'আমি বাংলার কাব্যলক্ষ্মীর পায়ে কয়েকটি মুসলমানি জেওর ওরফে অলংকার পরাইয়াছি মাত্র।'

সিমন দো বুভোয়ারও যখন সগৌরবে বলেন, 'আমি নারী বটি' (I am a woman) তখন তিনি কিন্তু কদাচ বলেন না 'আমি মানুষ নহি'। তিনি বলেন 'শুদ্ধ মানুষলক্ষ্মীর পায়ে আমি কয়েকটি নারীর জেওর বা অলংকার যোগ করিয়াছি মাত্র।'

তথাপি প্রশ্ন উঠিয়াছে নারী লেখককে কেন এই বিড়ম্বনায় পড়িতে হইবে। ইহার উত্তরেই বুভোয়ার বলিয়াছেন নারী মানে 'স্ত্রী লিঙ্গধারী প্রাণী' মাত্র নহে—নারী মনুষ্যেরই অন্যতম দশা (situation) মাত্র। 'নারীর দশা' বা 'নারীদশা' মানে মানুষেরই দশা, মানবজাতিরই বিশেষ দশা। মনে রাখিতে হইবে নারীর দশা বলিতে 'নারীবিশেষ দৈন্যদশায় পড়িয়াছে' এমন বোঝায় না।

এই 'নারীদশা' কথাটির গোড়া মানুষের ইতিহাসেই পাওয়া যাইবে। বুভোয়ার নিজ যুগের ফরাসি তত্ত্বজ্ঞানীরা—বিশেষ জাঁ-পল সার্ত্র ও মরিস মের্লো-পঁতি 'সিদ্ধজ্ঞান' (*Erlebnis/ L'expérience vécue*) নামে যে প্রস্তাব প্রচার করিয়াছিলেন নারীদশা বুঝিতে তাহা বিশেষ সহায়ক। দশা শব্দে এই স্থলে 'জ্ঞানশুদ্ধ দশা' বোঝায়। নিছক 'প্রকৃতির দশা' বোঝায় না। এই দশা হইতে মুক্তির জন্য পহিলা যেই কাজ করিতে হইবে তাহা এই 'আমি নারী' কথাটি বলা। ইহা বলার সঙ্গে সঙ্গেই নারীদশা মোচন আরম্ভ হইল।

পুরুষ লেখকরা—এবং কোন কোন নারী লেখকও—বলেন আমরা সকলেই মানুষ, আলাদা করিয়া নারী বা পুরুষ পরিচয় দিবার দরকার কী? তাহাতে তো সাম্প্রদায়িকতার বাড়ই বাড়ে। আমি একবার এরাকে মার্কিন যুদ্ধ শুরুর সময়টায় মার্কিন দার্শনিক নোম চমস্কিকে জাতে এয়াহুদি বলিয়া লিখি। আমার কয়েক বন্ধু এই বাবদ আমাকে 'সাম্প্রদায়িক' বলিয়া নগদ গালি দিয়াছিলেন। পৃথিবীতে 'এয়াহুদি

দশা' বলিয়া একটা সত্য না থাকিলে হয়তো আমার ঐ কথা লিখিবার আবশ্যকই হইত না। ইহা 'সিদ্ধজ্ঞান' হইতে পাওয়া। কথাটা আমি পাইকারি গালি হিসাবে লিখি নাই। বাংলায় কি না বলে:

> বিয়াতির দশা বিয়াতি বোঝে আর না বোঝে বাঁঝে
> প্রজার দুঃখ প্রজায় বোঝে আর না বোঝে রাজে।

সিদ্ধজ্ঞান কথাটি অবশ্য বাংলায় এখনও প্রসিদ্ধ হয় নাই। তাই প্রসিদ্ধ ফরাসি লেখক ফ্রানৎস ফানোঁর লেখা হইতে একখানা উদাহরণ দিব। তদীয় কাল মুখ সাদা মুখোশ (*Peau noire, masques blancs*) বহিতে মহাত্মা ফানোঁ এই বয়ান পেশ করিয়াছেন।

সাদা কর্তৃত্বাধীন সমাজে কাল মানুষের দশার সহিত বুভোয়ার কথিত নারীদশার কিছুটা হইলেও মিল আছে। জন লেননের একটি বিখ্যাত গান এই রকম: 'এই দুনিয়ার কাল আদমি নারী' (Women is the nigger of the world):

> একটি কাল মানুষ দেখিয়া এক সাদা বাড়ির এক বাচ্চা বলিতেছে:
> 'দেখো, দেখো, নিগ্রো!' শুনিয়া কাল লোকটি মুখ চাপিয়া হাসে।
> বাচ্চাটি আবার বলে 'দেখো, দেখো, নিগ্রো!' তাহাতে লোকটা মজা পায়।
> আবার শোনা যায় 'দেখো, দেখো, নিগ্রো!'
> লোকটি তখনো হাসে, লুকাইবার কোন কোশেশ করে না।
> বাচ্চাটি তখন বলে, 'আম্মা, দেখ, নিগ্রোটা কেমন যেন! আমার ভয় করিতেছে!'

ভয় করিতেছে কেন? কালো লোকটা বলে, 'ওরা আমাকে দেখিয়া ভয় পাইতেছে এখন!' 'আমি অট্টহাস্যে ফাটিয়া পড়িবার সিদ্ধান্ত লই, কিন্তু হাসি আসে না আমার। হাসা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।'

যেই অবস্থায় হাসা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় তাহারই আরেক নাম নারীদশা। এই দশা—বুভোয়ার মনে করেন—চিরস্থায়ী নহে। কারণ এই দশা প্রাকৃতিক নহে। নহে নিছক জরায়ু বা স্ত্রী-অঙ্গের দশা। এই দশা ইতিহাসের ফসল। সেই অর্থে মানুষও প্রাকৃতিক প্রাণী মাত্র নহেন, সংস্কৃতি বা ইতিহাসের ফসল। যাঁহার মধ্যে মনের উদয় বা 'উত্থ' ঘটিয়াছে তাঁহাকেই মানুষ কহে।

সুতরাং প্রশ্ন হইতেছে তাঁহার দেহের কী হইল? মনের উদয় হইবার পর দেহ ও প্রাণের অন্ত হয় নাই—প্রাণ মন দেহ লইয়াই মানুষ। দেহ কি প্রাণ বাদ দিয়াও মানুষ হয় না। তবে মানুষ মানে দেহমাত্র নহেন। হইলে তিনি পশু হইতেন, শুদ্ধ পশু হইতেন। নারী মানে দেহমাত্র, শুদ্ধ দেহ—এই ধারণা মিথ্যা।

এই সত্য জানিয়াও যাঁহারা মিথ্যার সহিত আপোষ করিয়া সংসার করেন তাঁহারা হয়তো ইতিহাসকেও প্রকৃতির সহিত গুলাইয়া ফেলেন। সিমন দো বুভোয়ার এই

গুলানি পরিষ্কার করিবার কাজে হাত দিয়াছিলেন। পুরুষবাদী সমাজের অনেকেই তাই আগে খোঁজ করিয়াছেন, 'ভদ্রমহিলার কয়টি যোনি আছে, দেখি তো!' ইহা আশ্চর্যের নহে।

মানুষ যদি নিছক প্রকৃতির শিকারই হইতেন তো ইতিহাস হইতেন না। নারীর বেলায় তাহার অন্যথা হইবে কেন? নারীর মানুষ হইবার চেষ্টাও তাহা হইলে ব্যর্থ হইবে না। অনেক পুরুষ মনীষীর মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ মনীষী জিকমুন্ট ফ্রয়েড কোন এক স্থানে বলিয়াছেন—নারীর শরীর গঠনেই তাঁহার কপাল পুড়িয়াছে। দেহই নিয়তি হইয়াছে তাঁহার।

বুভোয়ার এই কথার সহিত একমত হইতে পারেন নাই। কিন্তু ইহার প্রতিবাদে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাও ভুল বোঝাবুঝির সূচনাই করিয়াছে মাত্র। তিনি বিজ্ঞানের উপর ভরসা করিয়া বলিয়াছেন নারীকে যদি গর্ভধারণ করিতে না হইত, তাহা হইলে হয়তো তাঁহার এই দশা হইত না। কাজেই বিজ্ঞান যদি কোনদিন কোন কৌশল বাহির করিতে পারে যাহাতে গর্ভধারণ কাজটি অন্যভাবে করা যাইবে তবে হয়তো এই দশা ঘুচিবে।

নারীর 'অপর' দশার কারণ তাহার দেহগঠন বা গর্ভধারণ নহে। ইহা তাঁহার অপর এক অজুহাত বা মাধ্যম মাত্র। এই সত্য বুঝিতে হইলে শ্বেতাঙ্গ সমাজে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের দশা বা বর্ণবাদ জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করা যাইতে পারে। শ্রীমতি বুভোয়ার বহি প্রকাশের তিন চারি বৎসরের মাথায় প্রকাশিত কাল মুখ সাদা মানুষ পুস্তকে ফ্রানৎস ফানো বলিয়াছিলেন—'কাল মানুষ বলিয়া কিছু নাই। অন্যত সাদা মানুষ বলিয়া যাহা আছে তাহার অধিক কালো মানুষ নাই।' (The Negro is not. Any more than the white man.)

কাল মানুষের চামড়ায় সঞ্চিত 'মেলানিন' নামক পদার্থ হইতে কাল মানুষের পরাধীনতা জন্ম লয় নাই। কাল মানুষ দেখিলে সাদা শিশু যে ভয় পায় তাহার কারণ কাল চামড়ার বা কাল মুখের কোন দ্রব্যগুণ নহে। এই গুণ ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক।

একই কায়দায় বলা চলে নারীর স্ত্রী-অঙ্গের সংখ্যা গণনায় অভ্যস্ত পুরুষ লোকটি নারীকে ভয় পান তাঁহার শরীর-গঠনের জন্য নহে। তাই সুযোগ পাইলেই তাঁহারা বলিতে ভোলেন না: 'নারী ছলনাময়ী'। ইহাতেই প্রকাশ পাইতেছে, নারীকে ষোল আনা দমন করা সম্ভব হয় নাই।

অথচ কল্পনায় যে নারীকে তিনি ভয় পাইতেছেন তিনি অলীক। অনেকটা ফ্রানৎস ফানোর পথ ধরিয়া ফ্রয়েডের ফরাসি ভাষ্যকার জাক লাকাঁও বলিয়াছেন: 'নারী বলিয়া কিছুই নাই'। ইহার নির্গলিতার্থ এই: নারী বলিয়া যে অলীক বস্তুকে পুরুষলোক ভয় পায়, তাহা আসলে যে কী বস্তু তাহা কাহারও জানা নাই।

একই সঙ্গে শার্ল্যা যেন বলিতেছেন, পুরুষ বলিয়াও কিছু নাই। যদি থাকে আছে মানুষ। তাহা হইলে নার্কা কি একই সঙ্গে কবুল করিতেছেন না, ফ্রয়েড কথিত 'দেহই নিয়তি' কথাটিও ভুল! হ্যাঁ, করিতেছেন বৈ কি!

অথচ দেহ কথাটি সম্পূর্ণ ভুলও নহে। বুভোয়ার বলিয়াছেন, 'আমার দেহকে বাদ দিয়া আমার যদি মানুষ হইতে হয় তাহা হইলে আমি মানুষ নহি'। একই কথা ফ্রানৎস ফানোঁও বলিয়াছেন: 'আমার দেহই আমাকে মানুষ করিয়াছে। তাহাকে বাদ দিব কেন?' দেহ ছাড়িয়া মন অর্থাৎ মানুষ নাই।

বুভোয়ার বলিয়াছেন: 'আমি নারী'। ফানোঁ বলিয়াছেন: 'হে আমার দেহ, আমাকে এমন মানুষ কর যে সদাসর্বদা প্রশ্নকাতর'। বুভোয়ার শব্দের অনুবাদ—কাকতালীয় হইলেও সত্য—'সুদর্শনা' বা 'প্রিয়দর্শিনী' যাহা ইচ্ছা করিতে পারি। কিংবা খাঁটি বাংলায় বলিতে পারি 'সিমন সুন্দরী'। এই সুন্দর প্রশ্নকাতর।

কে না জানে, যাহা প্রশ্নকাতর নহে তাহা কদাচ সুন্দর হয় না!

দোহাই

১. Kaushik Basu, *Of Places, Of People: Sketches from an Economist's Notebook* (New Delhi: Oxford University Press, 1994).

২. Simone de Beauvoir, *The Second Sex* [*Le deuxième sexe*, 2 vols., Paris: Gallimard, 1949], H. M. Parshley, trans. (New York: Vintage Books, 1989).

৩. ———, *The Women Destroyed* [*La femme rompue*, Paris: Gallimard, 1968], Patrick O'Brien, trans. (London: Fontana, 1987).

৪. Frantz Fanon, *Black Skin, White Masks* [*Peau noire, masques blancs*, Paris: Editions du Seuil, 1952], Charles Lam Markmann, trans. (New York: Grove, 1967).

৫. Sigmund Freud, 'Some Psychical Consequences of the Anatomical Distinction between the Sexes' [1925], in *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*, 24 vols., James Strachey, trans. and ed. (London: Hogarth Press, 1953–74), vol. 19, pp. 241–260.

৬. Maurice Merleau-Ponty, *Phenomenology of Perception* [*Phénoménologie de la perception*, Paris: Gallimard, 1945], Colin Smith, trans. (London: Routledge, 1962).

৭. Toril Moi, *What is a Woman? And Other Essays* (Oxford: Oxford University Press, 1999).
৮. Jean-Paul Sartre, *Being and Nothingness* [*L'être et le néant*, Paris: Gallimard, 1943], Hazel E. Barnes, trans. (New York: Washington Square Press, 1992).

....

উৎস
দৈনিক ইত্তেফাক ॥ ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৮

যোগ

21

Of Structure as an Inmixing of an Otherness Prerequisite to Any Subject Whatever[1]

Jacques Lacan

Somebody spent some time this afternoon trying to convince me that it would surely not be a pleasure for an English-speaking audience to listen to my bad accent and that for me to speak in English would constitute a risk for what one might call the transmission of my message. Truly, for me it is a great case of conscience, because to do otherwise would be absolutely contrary to my own concept of the message: of the message as I will explain it to you, of the linguistic message. Many people talk nowadays about messages everywhere, inside the organism a hormone is a message, a beam of light to obtain teleguidance to a plane or from a satellite is a message, and so on; but the message in language is absolutely different. The message, our message, in all cases comes from the Other by which I understand "from the place of the Other." It certainly is not the common other, the other with a lower-case *o*, and this is why I have given a capital *O* as the initial letter to the Other of whom I am now speaking. Since in this case, here in Baltimore, it would seam that the Other is naturally English-speaking, it would really be doing myself violence to speak French. But the question that this person raised, that it would perhaps be difficult and even a little ridiculous for me to speak English, is

an important argument and I also know that there are many French-speaking people present that do not understand English at all; for these my choice of English would be a security, but perhaps I would not wish them to be so secure and in this case I shall speak a little French as well.

First, let me put forth some advice about structure, which is the subject matter of our meeting. It may happen that there will be mistakes, confusion, more and more approximative uses of this notion. and I think that soon there will be some sort of fad about this word. For me it is different because I have used this term for a very long time—since the beginning of my teaching. The reason why something about my position is not better known is that I addressed myself only to a very special audience, namely one of psychoanalysts. Here there are some very peculiar difficulties, because psychoanalysts really know something: of what I was talking to them about and that this thing is a particularly difficult thing to cope with for anybody who practices psychoanalysis. The subject is not a simple thing for the psychoanalysts who have something to do with the subject proper. In this case I wish to avoid misunderstandings, *méconnaissances*, of my position. *Méconnaissance* is a French word which I am obliged to use because there is no equivalent in English. *Méconnaissance* precisely implies the subject in its meaning—and I was also advised that it is not so easy to talk about the "subject" before an English-speaking audience. *Méconnaissance* is not to *méconnaître* my subjectivity. What exactly is in question is the status of the problem of the structure.

When I began to teach something about Psychoanalysis I lost some of my audience, because I had perceived long before then the simple fact that if you open a book of Freud, and particularly those books which are properly about the unconscious, you can be absolutely sure—it is not a probability but a certitude—to fall on a page where it is not only a question of words—naturally in a book there are always words many

printed words—but words which are the object through which one seeks for a way to handle the unconscious. Not even the meaning of the words, but words in their flesh, in their material aspect. A great part of the speculations of Freud is about punning in a dream or *lapsus*, or what in French we call *calembour*, *homonymie*, or still the division of a word into many parts with each part taking on a new meaning after it is broken down. It is curious to note, even if in this case it is not absolutely proven, that words are the only material of the unconscious. It is not proven but it is probable (and in any case I have never said that the unconscious was an assemblage of words, but that the unconscious is precisely structured). I don't think there is such an English word but it is necessary to have this term, as we are talking about structure and the unconscious is structured as a language. What does that mean?

Properly speaking this is a redundancy because "structured" and "as a language" for me mean exactly the same thing. Structured means my speech, my lexicon, etc., which is exactly the same as a language. And that is not all. Which language? Rather than myself it was my pupils that took a great deal of trouble to give that question a different meaning, and to search for the formula of a reduced language. What are the minimum conditions, they ask themselves, necessary to constitute a language? Perhaps only four *signantes*, four signifying elements are enough. It is a curious exercise which is based on a complete error, as I hope to show you on the board in a moment. There were also some philosophers, not many really but some, of those present at my seminar in Paris who have found since then that it was not a question of an "under" language or of "another" language, not myth for instance or phonemes, but language. It is extraordinary the pains that all took to change the place of the question. Myths, for instance, do not take place in our consideration precisely because those are also structured as a language, and when I say "as a language" it is not as some

special sort of language, for example, mathematical language, semiotical language, or cinematographical language. Language is language and there is only one sort of language: concrete language—English or French for instance—that people talk. The first thing to start in this context is that there is no meta-language. For it is necessary that all so called meta-languages be presented to you with language. You cannot teach a course in mathematics using only letters on the board. It is always necessary to speak an ordinary language that is understood.

It is not only because the material of the unconscious is a linguistic material, or as we say in French *langagier* that the unconscious is structured as a language. The question that the unconscious raises for you is a problem that touches the most sensitive point of the nature of language that is the question of the subject. The subject cannot simply be identified with the speaker or the personal pronoun in a sentence. In French the *ennoncé* is exactly the sentence, but there are many *ennoncés* where there is no index of him who utters the *ennoncé*. When I say "it rains," the subject of the enunciation is not part of the sentence. In any case here there is some sort of difficulty. The subject cannot always be identified with what the linguists call "the shifter."

The question that the nature of the unconscious puts before us is in a few words, that something always *thinks*. Freud told us that the unconscious is above all thoughts, and that which thinks is barred from consciousness. This bar has many applications, many possibilities with regard to meaning. The main one is that it is really a barrier, a barrier which it is necessary to jump over or to pass through. This is important because if I don't emphasize this barrier all is well for you. As we say in French, *ça vous arrange*, because if something thinks in the floor below or underground things are simple; thought is always there and all one needs is a little consciousness on the thought that the living being is naturally thinking and all is well.

If such were the case, thought would be prepared by life, naturally, such as instinct for instance. If thought is a natural process, then the unconscious is without difficulty. But the unconscious has nothing to do with instinct or primitive knowledge or preparation of thought in some underground. It is a thinking with words, with thoughts that escape your vigilance, your state of watchfulness. The question of vigilance is important. It is as if a demon plays a game with your watchfulness. The question is to find a precise status for this other subject which is exactly the sort of subject that we can determine taking our point of departure in language.

When I prepared this little talk for you, it was early in the morning. I could see Baltimore through the window and it was a very interesting moment because it was not quite daylight and a neon sign indicated to me every minute the change of time, and naturally there was heavy traffic and I remarked to myself that exactly all that I could see, except for some trees in the distance, was the result of thoughts actively thinking thoughts, where the function played by the subjects was not completely obvious. In any case the so-called *Dasein* as a definition of the subject, was there in this rather intermittent or fading spectator. The best image to sum up the unconscious is Baltimore in the early morning.

Where is the subject? It is necessary to find the subject as a lost object. More precisely this lost object is the support of the subject and in many cases is a more abject thing than you may care to consider—in some cases it is something done, as all psychoanalysts and many people who have been psychoanalyzed know perfectly well. That is why many psychoanalysts prefer to return to a general psychology, as the President of the New York Psychoanalytical Society tells us we ought to do. But I cannot change things, I am a psychoanalyst and if someone prefers to address himself to a professor of psychology that is his affair. The question of the structure,

since we are talking of psychology, is not a term that only I use. For a long time thinkers, searchers, and even inventors who were concerned with the question of the mind, have over the years put forward the idea of unity as the most important and characteristic trait of structure. Conceived as something which is already in the reality of the organism it is obvious. The organism when it is mature is a unit and functions as a unit. The question becomes more difficult when this idea of unity is applied to the function of the mind, because the mind is not a totality in itself, but these ideas in the form of the intentional unity were the basis; as you know, of all of the so-called phenomenological movement.

The same was also true in physics and psychology with the so-called Gestalt school and the notion of *bonne forme* whose function was to join, for instance, a drop of water and more complicated ideas, and great psychologists, and even the psychoanalysts are full of the idea of "total personality." At any rate, it is always the unifying unity which is in the foreground. I have never understood this, for if I am a psychoanalyst I am also a man, and as a man my experience has shown me that the principal characteristic of my own human life and, I am sure, that of the people who are here—and if anybody is not of this opinion I hope that he will raise his hand—is that life is something which goes, as we say in French, *á la dérive*. Life goes down the river, from time to time touching a bank; staying for a while here and there, without understanding anything—and it is the principle of analysis that nobody understands anything of what happens. The idea of the unifying unity of the human condition has always had on me the effect of a scandalous lie.

We may try to introduce another principle to understand these things. If we rarely try to understand things from the point of view of the unconscious, it is because the unconscious tells us something articulated in words and perhaps we could try to search for their principle.

I suggest you consider the unity in another light. Not a unifying unity but the countable unity one, two, three. After fifteen years I have taught my pupils to count at most up to five which is difficult (four is easier) and they have understood that much. But for tonight permit me to stay at two. Of course what we are dealing with here is the question of the integer, and the question of integers is not a simple one as I think many people here know. To count, of course, is not difficult. It is only necessary to have, for instance, a certain number of sets and a one-to-one correspondence. It is true for example that there are exactly as many people sitting in this room as there are seats. But it is necessary to have a collection composed of integers to constitute an integer, or what is called a natural number. It is, of course, in part natural but only in the sense that we do not understand why it exists. Counting is not an empirical fact and it is impossible to deduce the act of counting from empirical data alone. Hume tried but Frege demonstrated perfectly the ineptitude of the attempt. The real difficulty lies in the fact that every integer is in itself a unit. If I take two as a unit, things are very enjoyable, men and women for instance—love plus unity! But after a while it is finished, after these two there is nobody, perhaps a child, but that is another level and to generate three is another affair. When you try to read the theories of mathematicians regarding numbers you find the formula "*n* plus 1 ($n + 1$)" as the basis of all the theories. It is this question of the "one more" that is the key to the genesis of numbers and instead of this unifying unity that constitutes two in the first case I propose that you consider the real numerical genesis of two.

It is necessary that this two constitute the first integer which is not yet born as a number before the two appears. You have made this possible because the *two* is here to grant existence to the first *one*: put *two* in the place of *one* and consequently in the place of the *two* you see *three* appear. What we have here is

something which I can call the *mark*. You already have something which is marked or something which is not marked. It is with the first mark that we have the status of the thing. It is exactly in this fashion that Frege explains the genesis of the number; the class which is characterized by no elements is the first class; you have one at the place of zero and afterward it is easy to understand how the place of one becomes the second place which makes place for two, three, and so on. The question of the two is for us the question of the subject. and here we reach a fact of psychoanalytical experience in as much as the two does not complete the one to make two, but must repeat the one to permit the one to exist. This first repetition is the only one necessary to explain the genesis of the number, and only one repetition is necessary to constitute the status of the subject. The unconscious subject is something that tends to repeat itself, but only one such repetition is necessary to constitute it. However, let us look more precisely at what is necessary for the second to repeat the first in order that we may have a repetition. This question cannot be answered too quickly. If you answer too quickly, you will answer that it is necessary that they are the same. In this case the principle of the two should be that of twins—and why not triplets or quintuplets? In my day we used to teach children that they must not add, for instance, microphones with dictionaries; but this is absolutely absurd, because we would not have addition if we were not able to add microphones with dictionaries or as Lewis Carroll says, cabbages with kings. The sameness is not in *things* but in the *mark* which makes it possible to add things with no consideration as to their differences. The mark has the effect of rubbing out the difference, and this is the key to what happens to the subject, the unconscious subject in the repetition; because you know that this subject repeats something peculiarly significant, the subject is here, for instance, in this obscure thing that we call in some cases trauma, or exquisite pleasure. What

happens? If the "thing" exists in this symbolic structure, if this unitary trait is decisive, the trait of the sameness is here. In order that the "thing" which is sought be here in you, it is necessary that the first trait be rubbed out because the trait itself is a modification. It is the taking away of all difference, and in this case, without the trait, the first "thing:" is simply lost. The key to this insistence in repetition is that in its essence repetition as repetition of the symbolical sameness is impossible. In any case, the subject is the effect of this repetition in as much as it necessitates the "fading," the obliteration, of the first foundation of the subject, which is why the subject, by status, is always presented as a divided essence. The trait, I insist, is identical, but it assures the difference only of identity—not by effect of sameness or difference but by the difference of identity. This is easy to understand: as we say in French, *je vous numérote*, I give you each a number; and this assures the fact that you are numerically different but nothing more than that.

What can we propose to intuition in order to show that the trait be found in something which is at the same time one or two? Consider the following diagram which I call an inverted eight, after a well-known figure:

You can see that the line in this instance may be considered either as one or as two lines. This diagram can be considered the basis of a sort of essential inscription at the origin, in the knot which constitutes the subject. This goes much further than you might think at first, because you can search for the sort of surface able to receive such inscriptions. You can perhaps see that the sphere, that old symbol for totality, is unsuitable. A torus, a Klein bottle, a cross-cut surface, are able to receive such

a cut. And this diversity is very important as it explains many things about the structure of mental disease. If one can symbolize the subject by this fundamental cut, in the same way one can show that a cut on a torus corresponds to the neurotic subject, and on a cross-cut surface to another sort of mental disease. I will not explain this to you tonight, but to end this difficult talk I must make the following precision.

I have only considered the beginning of the series of the integers, because it is an intermediary point between language and reality. Language is constituted by the same sort of unitary traits that I have used to explain the one and the one more. But this trait in language is not identical with the unitary trait, since in language we have a collection of differential traits. In other words, we can say that language is constituted by a set of signifiers—for example, *ba*, *ta*, *pa*, etc., etc.—a set which is finite. Each signifier is able to support the same process with regard to the subject, and it is very probable that the process of the integers is only a special case of this relation between signifiers. The definition of this collection of signifiers is that they constitute what I call the Other. The difference afforded by the existence of language is that each signifier (contrary to the unitary trait of the integer number) is, in most cases, not identical with itself—precisely because we have a collection of signifiers, and in this collection one signifier may or may not designate itself. This is well known and is the principle of Russell's paradox. If you take the set of all elements which are not members of themselves,

$$X \notin X$$

the set that you constitute with such elements leads you to a paradox which, as you know, leads to a contradiction. In simple terms, this only means that in a universe of discourse nothing contains everything, and here you find again the gap that

constitutes the subject. The subject is the introduction of a loss in reality, yet nothing can introduce that, since by status reality is as full as possible. The notion of a loss is the effect afforded by the instance of the trait which is what, with the intervention of the letter you determine, places—say a1, a2, a3—and the places are spaces for a lack. When the subject takes the place of the lack, a loss is introduced in the word, and this is the definition of the subject. But to inscribe it, it is necessary to define it in a circle, what I call the otherness, of the sphere of language. All that is language is lent from this otherness and this is why the subject is always a fading thing that runs under the chain of signifiers. For the definition of a signifier is that it represents a subject not for another subject but for another signifier. This is the only definition possible of the signifier as different from the sign. The sign is something that represents something for somebody, but the signifier is something that represents a subject for another signifier. The consequence is that the subject disappears exactly as in the case of the two unitary traits, while under the second signifier appears what is called meaning or signification; and then in sequence the other signifiers appear and other significations.

The question of desire is that the fading subject yearns to find itself again by means of some sort of encounter with this miraculous thing defined by the phantasm. In its endeavor it is sustained by that which I call the lost object that I evoked in the beginning—which is such a terrible thing for the imagination. That which is produced and maintained here, and which in my vocabulary I call the object, lower-case, *a*, is well known by all psychoanalysts as all psychoanalysis is founded on the existence of this peculiar object. But the relation between this barred subject with this object *(a)* is the structure which is always found in the phantasm which supports desire in as much as desire is only that which I have called the metonomy of all signification.

In this brief presentation I have tried to show you what the question of the structure is inside the psychoanalytical reality. I

have not, however, said anything about such dimensions as the imaginary and the symbolical. It is, of course, absolutely essential to understand how the symbolic order can enter inside the *vécu*, lived experienced, of mental life, but I cannot tonight put forth such an explanation. Consider, however, that which is at the same time the least known and the most certain fact about this mythical subject which is the sensible phase of the living being: this fathomless thing capable of experiencing something between birth and death, capable of covering the whole spectrum of pain and pleasure in a word, what in French we call the *sujet de la jouissance*.When I came here this evening I saw on the little neon sign the motto "Enjoy Coca-Cola." It reminded me that in English, I think, there is no term to designate precisely this enormous weight of meaning which is in the French word *jouissance*—or in the Latin *fruor*. In the dictionary I looked up *jouir* and found "to possess, to use" but it is not that at all. If the living being is something at all thinkable, it will be above all as subject of the *jouissance*; but this psychological law that we call the pleasure principle (and which is only the principle of displeasure) is very soon to create a barrier to all *jouissance*. If I am enjoying myself a little too much, I begin to feel pain and I moderate my pleasures. The organism seems made to avoid too much *jouissance*. Probably we would all be as quiet as oysters if it were not for this curious organization which forces us to disrupt the barrier of pleasure or perhaps only makes us dream of forcing and disrupting this barrier. All that is elaborated by the subjective construction on the scale of the signifier in its relation to the Other and which has its root in language is only there to permit the full spectrum of desire to allow us to approach, to test, this sort of forbidden *jouissance* which is the only valuable meaning that is offered to our life.

Discussion

Angus Fletcher

Freud was really a very simple man. But he found very diverse solutions to human problems. He sometimes used myths to explain human difficulties and problems; for example, the myth of Narcissus: he saw that there are men who look in the mirror and love themselves. It was as simple as that He didn't try to float on the surface of words. What you're doing is like a spider: you're making a very delicate web without any human reality in it. For example, you were speaking of joy [*joie; jouissance*]. In French one of the meanings of *jouir* is the orgasm—I think that is most important here—why not say so? All the talk I have heard here has been so abstract! . . . It's not a question of psychoanalysis. The value of psychoanalysis is that it is a theory of psychological dynamism. The most important is what hat come after Freud, with Wilhelm Reich especially. All this metaphysics is not necessary. The diagram was very interesting, but it doesn't seem to have any connection with the reality of our actions, with eating, sexual intercourse, and so on.

Harry Woolf

May I ask if this fundamental arithmetic and this topology are not in themselves a myth or merely at best an analogy for an explanation of the life of the mind?

Jacques Lacan

Analogy to what? "S" designates something which can be written exactly as this S. And I have said that the "S" which designates the subject is instrument, matter, to symbolize a loss. A loss that you experience as a subject (and myself also). In other words, this gap between one thing which has marked meanings and this other thing which is my actual discourse that I try to put in the place where you are, you as not another subject but as people that are able to understand me. Where is the analogon? Either this loss exists or it

doesn't exist. If it exists it is only possible to designate the loss by a system of symbols. In any case, the loss does not exist before this symboliza-tion indicates its place. It is not an analogy. It is really in some part of the realities, this sort of torus. This torus really exists and it is exactly the structure of the neurotic. It is not an analogon; it is not even an abstraction, because an abstraction is some sort of diminution of reality, and I think it is reality itself.

Norman Holland

I would like to come to Mr. Lacan's defense; it seems to me that he is doing something very interesting. Reading his paper before the colloquium was the first time I had encountered his work and it seems to me that he has returned to the *Project for a Scientific Psychology*, which was the earliest of Freud's psychological writings. It was very abstract and very like what you have written here, although you are doing it with algebra and he is doing it with neurons. The influence of this document is all through *The Interpre-tation of Dreams*, his letters to Fliess, and all the early writings, al-though often merely implicit.

Anthony Wilden

If I may add something, you spoke at the beginning of your talk of repudiation or nonrecognition [*méconnaissance*], and we have begun with such an extreme case of this that I don't know how we're going to work our way out of it. But you have started at the top (at the most difficult point of your work), and it is very difficult for us to recognize the beginnings of this thought, which is very rich and very deep. In my opinion, as your unhappy translator, you are absolutely faithful to Freud and it is absolutely necessary for us to read your works before talking a lot of nonsense—which we may very well do here tonight. And after they have read your work, I would urge these gentlemen to *read Freud*.

Richard Schechner

What is the relationship between your thought about nothingness and the work that Husserl and Sartre have done?

Lacan
"Nothingness," the word that you have used, I think that I can say almost nothing about it, nor about Husserl, nor about Sartre. Really, I don't believe that I have talked about nothingness. The sliding and the difficulty of seizing, the never-here (it is here when I search there; it is there when I am here) is not nothing. This year I shall announce, as a program of my seminar, this thing that I have entitled *La Logique du phantasme*. Most of my effort, I believe, will be to define the different sorts of lack, of loss, of void which are of absolutely different natures. An absence, for instance. The absence of the queen, it is necessary to make an addition with this sort of element, but to find the absence of the queen. ... I think that the vagueness of the mere term *nothing* is not manageable in this context. I am late in everything I must develop, before I myself disappear. But it is also difficult enough to make the thing practicable to advance. It is necessary to proceed stage by stage. Now I will try this different sort of lack.

[M. Kott and Dr. Lacan discuss the properties of Möbius strips at the blackboard.]

Jan Kott
There is a curious thing which is probably accidental. We find all these motifs in Surrealist painting. Is there any relationship here?

Lacan
At least I feel a great personal connection with Surrealist painting.

Poulet
This loss of object which introduces the subject, would you say that it has any connection with the void [*le néant*] in Sartre's thinking? Would there be an analogy with the situation of the sleeper awakened that we find at the beginning of Proust's work? You remember, the dreamer awakens and discovers a feeling of loss, of an absence, which is moreover, an absence of himself. Is there any analogy?

Lacan

I think that Proust many times approached certain experiences of the unconscious. One often finds such a passage of a page or so in Proust which one can *découper* very clearly. I think you are right; Proust pushes it very close, but instead of developing theories he always comes back to his business, which is literature. To take the example of Mlle. Vinteuil, as seen by the narrator with her friend and her father's picture, I don't think that any other literary artist has ever brought out a thing like this. It may be because of the very project of his work, this fabulous enterprise of "time recovered"—this is what guided him, even beyond the limits of what is accessible to consciousness.

Sigmund Koch

I find a pattern constantly eluding me in your presentation, which I can only attribute to the fact that you spoke in English. You placed a great deal of emphasis on the integer *2* and on the generation of the integer 2. Your analysis is, as I recall, that if one starts with a unitary mark, then there is the universe of the nonmarked, which brings you, presumably, to the integer *2*. What is the analogical correspondence between the marked and the unmarked? Is the marked the system of consciousness and the nonmarked the unconscious system? Is the marked the conscious subject and the nonmarked the unconscious subject?

Lacan

From Frege I only recalled that it is the class with characteristic numbers o, which is the foundation of the *1*. If I have chosen *2* for psychoanalytical reference, it is because the *2* is an important scheme of the Eros in Freud. The Eros is that power which in life is unifying, and it is the basis on which too many psychoanalysts found the conception of the genital maturity as a possibility of the so-called perfect marriage, for instance, which is a sort of mystical ideal end, which is promoted so imprudently. This *2* that I have chosen is only for an audience which is, at first, not initiated to this question of Frege. The *1* in relation with the *2* can, in this first approach, play the same role as the *0* in relation to the *1*.

For your second question, naturally, I was obliged to omit many technical things known by those who possess Freud perfectly. In the question of repression it is absolutely necessary to know that Freud put as the foundation of the possibility of repression something that in German is called the *Urverdrängung*. Naturally, I could not afford here the whole set of my formalization, but it is essential to know that a formalism of the metaphor is primary for me, to make understood what is, in Freudian terms, *condensation*. [Dr. Lacan concluded his comment with a reprise of "L'Instance de la lettre" at the blackboard.]

Goldmann
Working in my method on literature and culture, what strikes me is that in dealing with important, historical, collective phenomena and with important works, I never need the *unconscious* for my analysis. I do need the *nonconscious*; I made the distinction yesterday. Of course there are unconscious elements; of course I can't understand the means by which the individual is explaining himself—and that, I have said, is the domain of psychoanalysis, in which I don't want to mix. But there are two kinds of phenomena which, according to all the evidence, seem to be social and in which I must intervene with the nonconscious, but not the unconscious. I think you said that the unconscious is the ordinary language, English, French, that we all speak.

Lacan
I said *like* language, French or English, etc.

Goldmann
But it's independent from this language? Then I'll stop; I no longer have a question. It's linked to the language that one speaks in conscious life?

Lacan
Yes.

Goldmann

All right. The second thing that struck me, if I understood you. There were a certain number of analogies with processes that I find in consciousness, on the level where I get along without the unconscious. There is something that since Pascal, Hegel, Marx, and Sartre we know without recourse to the unconscious: man is defined by linking these invariants to difference. One doesn't act immediately dépasse l'homme" Pascal said. History and dynamism, even without reference to the unconscious, cannot be defined except by this lack. The second phenomenon I find on the level of consciousness: it seems obvious that consciousness, inasmuch as it is linked to action, cannot be formulated except by constituting invariants, that is objects, and by linking these invariants to difference. One doesn't act immediately on a multiplicity of givens. Action is closely linked to the constitution of invariants, which permit a certain order to be established in the difference. Language exists before this particular man exists—is this language (French, English, etc.) linked simply to the problem of the phantasm? There is no subject without symbol, language, and an object. My question is this: Is the formation of this symbolism and its modifications linked solely to the domain of the phantasm, the unconscious, and desire, or is it also linked to something called work, the transformation of the outside world, and social life? And if you admit that it is linked to these also the problem comes up: Where is the logic, where is the comprehensibility? I don't think that man is simply aspiration to totality. We are still facing a mixture, as I said the other day, but it is very important to separate the mixture in order to understand it.

Lacan

And do you think that work is one of the "mooring-points" that we can fasten to in this drift?

Goldmann

I think that, after all, mankind has done some very positive things.

Lacan
I don't have the impression that a history book is a very structured thing. This famous history, in which one sees things so well when they are past, doesn't seem to be a muse in which I can put all my trust. There was a time when Clio was very important—when Bossuet was writing. Perhaps again with Marx. But what I always expect from history is *surprises*, and surprises which I still haven't succeeded in explaining, although I have made great efforts to understand. I explain myself by different co-ordinates from yours. In particular, I wouldn't put the question of work in the front rank here.

Charles Morazé
I am happy to see in this discussion the use of the genesis of numbers. To reply to Mr. Goldmann, when I study history, I depend on this same genesis of numbers as the most solid reality. Apropos of this, I would like to ask this question to see if our postulates are really the same or different. It seems to me that you said at the beginning of your talk that for you the structure of consciousness is language, and then at the end you said the unconscious is structured like language. If your second formulation is the correct one, that is also mine.

Lacan
It is the unconscious that is structured like language—I never varied from that.

Richard Macksey
We have perhaps exhausted our quota of *méconnaissances* for this session, but I'm still a bit confused about the consequences which your invocation of Frege and Russell imply for your ontology (or at least your ontics). Thus, I'm concerned about the extreme realist position which your mathematical example would seem to imply. I'm not troubled by the argument that the incompletability theorem undermines realism, since Gödel himself has maintained his realist position, simply seeing the theorem as a basic limitation on the expressive power of symbolism. Rather, I think that the logistic thesis itself has been subjected to serious criticism. If the

authors of the *Principia* attempt to define the natural numbers as certain particular sets of sets, apart from other metalinguistic difficulties in the theory of types one could counter that their derivation is arbitrary, since in a set theory, not based on a theory of types, "one" could be defined as, say, the set whose sole number is the empty set, and so on, so that the natural numbers could retain their conventional properties. Ergo, one might ask *which* set is the number one? A few months ago Paul Benacerraf carried this line of argument further, asserting that the irreducible characteristic of the natural numbers is simply that they form a recursive progression. Thus, any system that forms such a progression will do as well as the next; it's not the mark which particular numbers possess, but the interrelated, abstract *structure* (rather than the constituent objects) which gives the properties of the system. This attacks any realist position that equates numbers with entities or objects (and proposes a kind of conceptualist or nominalist structuralism).

Lacan

Without enlarging on this comment, I should say that concepts and even sets are not objects. I have never denied the structural aspect of the number system.

Note

1. Since Dr. Lacan, as he remarks in his introduction, chose to deliver his communication alternately in English and French (and at points in a composite of the two languages), this text represents an edited transcription and paraphrase of his address.

....

Source

Richard Macksey and Eugenio Donato, eds., *The Structuralist Controversy: The Languages of Criticism and the Sciences of Man* (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1972).